তোমরা যা গোপন করেছিলে
তা প্রকাশ করে দেওয়া ছিল আল্লাহর অভিপ্রায়।
–সুরা বাকারা ৭২

ধর্মব্যবসার ফাঁদে

মূল ধারণা: মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
অনুলিখন: হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম ও রিয়াদুল হাসান

ধর্মব্যবসার ফাঁদে

মূল ধারণা: মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
অনুলিখন: হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম ও রিয়াদুল হাসান

ধর্মব্যবসার ফাঁদে
মূল ধারণাঃ মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
অনুলিখনঃ হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম ও রিয়াদুল হাসান

প্রকাশনায়
তওহীদ প্রকাশন
১৩৯/১ তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
০১৭১১-০০৫০২৫, ০১৯৩৩-৭৬৭৭২৫
০১৭৮২-১৮৮২৩৭, ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩

ওয়েবসাইটঃ www.hezbuttawheed.org
ইমেইলঃ hezbuttawheed1995@gmail.com

প্রকাশকালঃ অক্টোবর ২০১৭ (সংখ্যা- ২০০০ কপি)
দ্বিতীয় সংস্করণঃ এপ্রিল ২০১৮ (সংখ্যা- ১০০০০ কপি)
তৃতীয় সংস্করণঃ জুলাই ২০১৮ (সংখ্যা- ২০০০০ কপি)

ফেসবুক পেজঃ
Hossain Mohammad Salim | facebook.com/emamht
আসুন সিস্টেমটাকে পাল্টাই | facebook.com/systempaltai
ইউটিউবঃ
www.youtube.com/hezbuttawheed

সরাসরি ভিজিট এবং বইটি ফ্রি ডাউনলোড করতে
স্মার্ট ডিভাইস থেকে স্ক্যান করুন

ISBN: 978-984-34-3095-3

মূল্যঃ ২৬০.০০ টাকা

আমাদের আলোড়ন সৃষ্টিকারী আরও কিছু বই

১. ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা
২. ইসলামের প্রকৃত সালাহ
৩. দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিস্টান ‘সভ্যতা’!
৪. The Lost Islam
৫. Dajjal? The Judeo-Christian ‘Civilization’! (অনুবাদ)
৬. হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৭. জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস
৮. আল্লাহর মো’জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা
৯. বর্তমানের বিকৃত সুফিবাদ
১০. যুগসন্ধিক্ষণে আমরা
১১. বাঘ-বন-বন্দুক (শিকারের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ)
১২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি যামানার এমামের পত্রাবলী
১৩. বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দ.) এর ভাষণ
১৪. ইসলাম শুধু নাম থাকবে
১৫. মহাসত্যের আহ্বান (প্রচারপত্র সঙ্কলন)
১৬. আসুন-সিস্টেমটাকেই পাল্টাই
১৭. এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব
১৮. চলমান সঙ্কট নিরসনে হেযবুত তওহীদের প্রস্তাবনা
১৯. Divide and Rule: শোষণের হাতিয়ার
২০. জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাই দাসত্ব
২১. দান: ইসলামের অর্থনীতির চালিকাশক্তি
২২. আসমাউ ওয়া আত্তাবেয়্যু
২৩. ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা
২৪. জঙ্গিবাদ সংকট: সমাধানের উপায়
২৫. ধর্মবিশ্বাস: একটি বৃহৎ সমস্যার সহজ সমাধান
২৬. শ্রেণিহীন সমাজ সাম্যবাদ প্রকৃত ইসলাম
২৭. চলমান সংকট নিরসনে আদর্শিক লড়াই
২৮. তাকাওয়া ও হেদায়াহ
২৯. মোমেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদীর আকিদা
৩০. সওমের উদ্দেশ্য
৩১. সম্মানিত আলেমদের প্রতি
৩২. সাংবাদিকতার আদর্শলিপি
৩৩. হলি আর্টিজানের পর...
৩৪. পাশ্চাত্যের মানসিক দাসত্ব দূরীকরণে গণমাধ্যমের করণীয়
৩৫. রাজধানী সূত্রাপুরে মাননীয় এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম প্রদত্ত ভাষণ
৩৬. ইসলাম কেন আবেদন হারাচ্ছে?
৩৭. হেযবুত তওহীদের গঠনতন্ত্র
৩৮. তওহীদ জান্নাতের চাবি
৩৯. প্রিয় দেশবাসী
৪০. ধর্মের অপব্যবহার প্রগতির অন্তরায়

ভূমিকা

ধর্মব্যবসা মানুষকে সুবিধা গ্রহণ করতে শেখায়, কিন্তু আল্লাহ চান মানুষ আত্মত্যাগ করুক, অপরকে দান করে আত্মপরিশুদ্ধি অর্জন করুক। জান্নাতের জন্য ত্যাগস্বীকার করতে হয়। আল্লাহ কোর'আনে মানবজাতির সামগ্রিক জীবন পরিচালনার জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। এই জীবনব্যবস্থার অন্যতম নীতি হলো দান করা, ব্যয় করা- যার মাধ্যমে সমাজ থেকে অর্থনৈতিক অবিচার, বৈষম্য বিদূরিত হয়ে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সম্পদ কোথাও পুঞ্জিভূত হবে না। ফলে সমাজের প্রত্যেকের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত হবে। এজন্য সত্যদীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জীবন ও সম্পদ উভয়ই ব্যয় করা ফরদ, বাধ্যতামূলক। আর যেহেতু উম্মতে মোহাম্মদীর জীবনের লক্ষ্যই হচ্ছে মানবজীবনে সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করে যাবতীয় অন্যায় অবিচার দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, তাই মো'মেনের সংজ্ঞার মধ্যেই আল্লাহ সম্পদ ও জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে সংগ্রাম করাকে অঙ্গীভূত করে দিয়েছেন।(১) **এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ উৎসর্গ করা কেবল ইসলামের একটি আমল নয়, এটি মো'মেন হওয়ার অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। এই জন্যই কোর'আনে আল্লাহ বহুবার তাগিদ দিয়েছেন খরচ কর, ব্যয় কর, কিন্তু বোধহয় একবারও বলেন নি যে, সম্পদ পুঞ্জিভূত কর।** যাকাত দেয়া, খারাজ, খুমস ও ওশর দেয়া এবং তার উপর সাদকা ইত্যাদি খরচের কথা এতবার তিনি বলেছেন যে, বোধহয় শুধুমাত্র তওহীদ অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকে হুকুমদাতা, ইলাহ (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব) বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করা এবং জেহাদ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে এতবার বলেন নি। পবিত্র কোর'আনে অন্তত ২২টি খাতে সম্পদ দান করার নির্দেশ পাওয়া যায়।

জান্নাত শুধুমাত্র কান্নাকাটি করে, দোয়া করে পাওয়ার বিষয় নয়। এটি আল্লাহর সঙ্গে মো'মেনের একটি বিনিময়চুক্তি যাকে আল্লাহ উত্তম বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয় বলে উল্লেখ করেছেন। মো'মেন নিজের জীবন ও সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ

---

১. আল কোর'আন: সুরা হুজরাত ১৫

সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, মানবতার কল্যাণে ব্যয় করবে, বিনিময়ে আল্লাহ তাকে জান্নাত দেবেন। **তবে কি মো'মেন আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করবে না? হ্যাঁ, অবশ্যই কান্নাকাটি করে আকুলভাবে চাইবে যেন সে তার জীবন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে পারে।** সে যদি স্বার্থপরের মতো জীবনযাপন করে, আল্লাহর রাস্তায় জীবন-সম্পদ ব্যয় না করে তাহলে তাকে আল্লাহ জান্নাত দিবেন না। আল্লাহ অন্তত দুটো আয়াতে এই সাফ কথাটি জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "হে মো'মেনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত এবং এমন উৎকৃষ্ট বাসগৃহে যা স্থায়ী জান্নাতে অবস্থিত। এটা মহাসাফল্য।(১)

অন্যত্র তিনি আরো সুস্পষ্টভাবে এই কেনাবেচার কথাটি উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মো'মেনদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা সংগ্রাম করে আল্লাহর রাস্তায়, (যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য) হত্যা করে এবং নিহত হয়। সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের উপর, যা তোমরা করেছ তাঁর সাথে। আর এ হলো মহান সাফল্য।(২) এ বিষয়ে আল্লাহর চূড়ান্ত ঘোষণা হচ্ছে, "কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না করো।"(৩)

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে ভোগ করার মধ্যে জান্নাত নেই, স্বার্থপরের জন্য জান্নাত নেই, জান্নাত হচ্ছে ত্যাগের মধ্যে। কাজেই এই দীনের অন্যতম একটি নীতি হচ্ছে- ভোগ নয়, ত্যাগ। কারণ মানুষ যখন অন্যকে দিতে শেখে তখন একদিকে সে নিজে পরিশুদ্ধ হয়, অপরদিকে তার জাতি সমৃদ্ধ হয়। আর যদি সবাই ভোগের পেছনে ছোটে তাহলে সকলেই হয় আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর। তখন বিপুল সম্পদ থাকলেও তাতে টান পড়বে। সম্পদ এক জায়গায় পুঞ্জিভূত হয়ে যাবে। আজকে এটাই হয়েছে। স্বভাবতই ইসলামের সকল আমল করতে হবে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে। এর মধ্যে কোনোরূপ পার্থিব বিনিময় বা লেনদেনের সুযোগ নাই। **যারা ধর্মের কাজের বিনিময় নেবে তার জন্য কোনো জান্নাত নাই।** আজকের পৃথিবীটা স্বার্থকেন্দ্রিক। ধর্মের অঙ্গনটি এককালে নিঃস্বার্থ ছিল। মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধর্ম প্রচার করত, দীনের কাজ করত। এখন যারা ধর্মের ধারকবাহক তারা

---

১. আল কোর'আন: সুরা সফ ১২

২. আল কোর'আন: সুরা তাওবা ১১১

৩. আল কোর'আন: সুরা ইমরান ৯২

টাকা ছাড়া একটি কাজও করেন না। নামাজ পড়াবেন - তাতে টাকা, অন্যের জন্য দোয়া করবেন- তাতেও টাকা, সমাজের কেউ মারা গেছেন, জানাজা পড়াবেন, দাফন করবেন - তাতেও টাকা, নবীর নামে দুরুদ পড়াবেন - তাতেও টাকা, ওয়াজ নসিহত করে দীনের শিক্ষা প্রচার করবেন - এখানেও টাকা। এভাবে বলতে গেলে তালিকা অনেক দীর্ঘ হবে। এক কথায় ধর্মব্যবসার চিত্র এখন বিকৃতির চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেছে। যারা তাদেরকে দিচ্ছেন তারা সওয়াব মনে করে দিচ্ছেন, যারা নিচ্ছেন তারা অধিকার মনে করে নিচ্ছেন। বহু জায়গায় এই লেনদেন নিয়ে মারামারি, খুনোখুনী পর্যন্ত হওয়ার খবর আছে। এ স্বার্থকে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মাহ আজ হাজারো দলে উপদলে, ফেরকা মাজহাবে, তরিকায় বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে আছে।

আজকের বৈশ্বিক ভয়াবহ সঙ্কটে মুসলিম দাবিদার জনগোষ্ঠীটি নিপতিত। এমন কি তাদেরকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলো টার্গেট করেছে। এমতাবস্থায় জাতির সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। এই ঐক্যগঠনের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হচ্ছে স্বার্থকেন্দ্রিক ধর্মব্যবসা। এ মহাসংকট থেকে উদ্ধার পেতে হলে ধর্মব্যবসার বিষবৃক্ষকেই উপড়ে ফেলতে হবে। তা না হলে ধর্মের অনাবিল রূপ, প্রকৃত রূপ মানুষ কোনোদিন দেখতে পাবে না, ঐক্যবদ্ধও হতে পারবে না। তাই ধর্মব্যবসার বিষয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা প্রত্যেক মানবকল্যাণকামী, সত্যনিষ্ঠ মো'মেন, মুসলিমের কর্তব্য।

সে লক্ষ্যেই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

(হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম)

এমাম, হেযবুত তওহীদ

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

‘ধর্মব্যবসার ফাঁদে’ বইটির প্রথম প্রকাশের সময় ভেবেছিলাম যে বইটিতে অনেক বেশি তাত্ত্বিক বিষয় এবং তথ্য-উপাত্ত আর দলিল যুক্ত করা হয়ে গেছে। এর ফলে সম্ভবত এটি গবেষকদের আগ্রহের বিষয় হলেও সাধারণ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হবে। তদুপরি এর আলোচ্য বিষয়টি বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে খুবই স্পর্শকাতর। আমাদের সমাজের ধর্মীয় বাস্তবতা হলো এখানে ধর্মের যে কোনো আনুষ্ঠানিকতার বিনিময় গ্রহণ করাকে স্বাভাবিক বলেই মনে করা হয়। ধর্মবিশ্বাসী সাধারণ মানুষ ধর্মজীবী জনগোষ্ঠীকে অর্থ প্রদান করাকে সওয়াবের কাজ মনে করে শত শত বছর ধরে এই ব্যবস্থাকে পৃষ্ঠপোষণ করে আসছে। এমন একটি সমাজে ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে বই লিখে পাঠক-সমাদর পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তবুও মহান আল্লাহ পাকের অসীম দয়ায় পর পর দুটো সংস্করণে প্রকাশিত বইগুলো দ্রুত শেষ হয়ে যায়। এমনও খবর পেয়েছি যে, একই ব্যক্তি বইটি পড়ে আরো অনেকগুলো কপি কিনে নিয়েছেন তার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের উপহার দেওয়ার জন্য। তাই পাঠকদের অব্যাহত চাহিদার কথা বিবেচনা করে বইটি তৃতীয়বারের মতো প্রকাশ করতে উদ্যোগী হলাম।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকাশের সময় আমি পাঠকদের কাছ থেকে পরামর্শ আহ্বান করেছিলাম, কোনো তথ্যগত বা তত্ত্বগত ভুল থাকলে কিংবা মুদ্রণপ্রমাদ থাকলে তা ফোনে, অনলাইনে বা চিঠি লিখে জানানোর জন্য। বহু পাঠক বইটি পড়ে তাদের মূল্যবান পরামর্শ আমাদেরকে জানিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে বন্দী করেছেন। তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে দ্রুততম সময়ে এই সংস্করণে বেশ কিছু বিষয় নতুন করে সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। কিছু বিষয়কে গুরুত্বের বিবেচনায় অধিকতর সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে বইয়ের কলেবর কিছুটা বাড়লো তবে সেজন্য কোনো মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নি। ধর্মের প্রকৃত রূপ কী এবং সেই রূপটি ধর্মব্যবসার দ্বারা কী করে ক্ষতবিক্ষত হয় সেটাই এ বইয়ের মর্মবাণী। আশাতীত পাঠকপ্রিয়তা প্রমাণ করে এই বইটি ছিল সময়ের দাবি, সেই দাবি পুরনে সকল সচেতন মানুষ এগিয়ে আসবেন এবং প্রত্যেকটি মানুষের কাছে এই মহাসত্যের বার্তা পৌঁছে দিবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

(হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম)

এমাম, হেযবুত তওহীদ

আলেম দুই ধরনের - সত্যনিষ্ঠ, হক্কানি আলেম এবং স্বার্থপর, ধর্মব্যবসায়ী, ফেতনা সৃষ্টিকারী আলেম। এ বইটির আলোচ্য হচ্ছে সেই সমস্ত আলেম নামধারী ব্যক্তি যারা ধর্মীয় জ্ঞানকে স্বার্থ উদ্ধারে ব্যবহার করে এবং সমাজে ফেতনা, সন্ত্রাস ও হানাহানি সৃষ্টি করে। তারা কারা?

সূচিপত্র

ধর্মব্যবসার সংজ্ঞা ও প্রকরণ..১০

ধর্মব্যবসার উৎপত্তি ১৩

ধর্মব্যবসা নিষিদ্ধ হওয়ার দলিল.. ২৪

ধর্মব্যবসার কুফল ৩৪

ধর্মব্যবসায়ীরা যখন দুরাচারী শাসকের তাবেদার..............................৫১

ধর্মব্যবসায়ী সৃষ্টির শিক্ষাব্যবস্থা.. ৫৭

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আরবি শিক্ষার গুরুত্ব...................................৬৯

ধর্মব্যবসার পক্ষে প্রচলিত যুক্তিসমূহ ও তার খণ্ডন ৭৭

সর্বধর্মীয় পর্যালোচনা: কোনো ধর্মেই ধর্মব্যবসার বৈধতা নেই..................১০৬

ধর্মব্যবসার নেপথ্যে দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি ১১১

উৎসব ও অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক ধর্মব্যবসা..১২০

ধর্মজীবিকার বিরুদ্ধে দিকে দিকে জাগছে স্পন্দন ১২৫

ধর্মব্যবসায়ী ও ইসলামের কথিত বিশেষজ্ঞদের কয়েকটি বড় ব্যর্থতা................১৩০

ধর্মব্যবসার পুরোহিত ভোগবাদী আরব রাজতন্ত্র..................................১৪৬

ধর্মব্যবসায়ীদের 'সুন্নতি লেবাস' ও উপাধিসমূহ..................................১৫৬

ধর্মব্যবসায়ী আলেম ও প্রকৃত আলেমের পার্থক্য..................................১৬৬

ধর্মব্যবসায়ীদের ফেতনা: হুজুগনির্ভর ধর্মোন্মাদনা..............................১৭৭

ধর্মব্যবসার একটি ধারা: রাজনৈতিক ইসলাম ১৮৫

ধর্মব্যবসা থেকে মুক্তির পথসন্ধান... ২০৫

দলিল..২০৯

ধর্মব্যবসার সংজ্ঞা ও প্রকরণ

সূর্যে যখন গ্রহণ লাগে তখন চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। অফুরন্ত শক্তির উৎস যে সূর্য সেও দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়। ঠিক সেভাবে সূর্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল, সমস্ত সত্য ও কল্যাণের উৎস আল্লাহর নাজেল করা যে দীন, ধর্ম বা জীবনবিধান সেটা নিয়ে যখন স্বার্থ হাসিল শুরু হয় তখন তা অশান্তির বিষবৃক্ষে পরিণত হয়। মানবসমাজে তখন সূর্য গ্রহণের মতোই অন্ধকার নেমে আসে। **আল্লাহ মানুষকে শান্তি, ন্যায় ও প্রগতির মধ্যে বাস করার জন্য যে দীন বা ধর্ম পাঠিয়েছেন সেটাকে যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বৈষয়িক স্বার্থ হাসিলের কাজে ব্যবহার করে তখন তাকে ধর্মব্যবসা বলা হয়ে থাকে।**

সাধারণ মানুষ ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান রাখেন না। অন্যায়পূর্ণ সমাজে অশান্তির দাবানলে দগ্ধ হয়ে তারা যখন ইহজাগতিক ও পারলৌকিক মুক্তির আশায় ধর্মের দিকে ফিরে আসে তখন তারা ধর্মের ধ্বজাধারী সেই শ্রেণিটির শরণাপন্ন হন যারা ধর্মকে স্বার্থের হাতিয়ারে পরিণত করেছে, ধর্মকে পণ্য বানিয়ে ব্যবসা করছে, ধর্ম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে, ধর্মকে ক্ষমতায় আরোহণের সিঁড়ি বানিয়ে প্রতিনিয়ত ধর্মকে মাড়িয়ে যাচ্ছে। আর সেই শ্রেণিটি নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ধর্মের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করে ধর্মপ্রাণ মানুষদেরকে প্রতিনিয়ত বিপথগামী করছেন, প্রতারিত করছেন। তারা যেটাকে ইসলাম বলে উপস্থাপন করেন সেটাকেই মানুষ আল্লাহ-রসুলের কথা হিসাবে শিরোধার্য বলে মনে করে। কেবল স্বার্থের জন্য তারা বহু গুরুত্বহীন বিষয়কে ইসলামের অপরিহার্য বিষয় বানিয়ে দেন, আবার মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে একেবারে বাদই দিয়ে দেন। তাদের প্রতি অন্ধবিশ্বাস থাকায় জনগণ প্রতারিত হয়, তারা বুঝতে পারে না ধর্মব্যবসায়ীরা ইসলামের যে রূপ তাদের সামনে তুলে ধরছে সেটা একান্তই তাদের মনগড়া অপব্যাখ্যা। ভোক্তার চাহিদা মোতাবেক যেমন পণ্যের গুণাগুণ, আকার, আকৃতি বিভিন্ন হয়, তেমনি ইসলামেরও বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়।

মানুষের ধর্মবিশ্বাস, ধর্মীয় চেতনা একটি মহাশক্তি। যে কোনো শক্তিরই সুফল ও কুফল নির্ভর করে তার ব্যবহারের উপর। যারা ধর্মকে নিজেদের কুক্ষিগত করে নিয়েছে তারা সর্বপ্রথম যে ক্ষতিকর কাজটি করেছে তা হলো, তারা মানুষের চিন্তার জগতে তালা মেরে দিয়েছে এই বলে যে ধর্মের কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না। ধর্মের নির্দেশের ব্যাপারে কোনো যুক্তি চলবে না। মানুষ শ্রেষ্ঠ হয়েছে মস্তিষ্কের গুণে, আর ধর্মের

ধ্বজাধারীরা সেই মস্তিষ্কের ঘরে তালা দিয়ে মানুষকে চিন্তাহীন, যুক্তিবোধহীন, কূপমণ্ডূক, পশু বানিয়ে ফেলতে চায়। এভাবেই মুসলিম জাতি আজ পৃথিবীর সবচেয়ে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এটা বোঝার সাধারণ জ্ঞান তাদের ধার্মিকদের লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন যদি ধর্মকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় সবার আগে মানুষের চিন্তা করার শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে, অচল মস্তিষ্ককে অর্গলমুক্ত করতে হবে। যতদিন ইসলামের কর্তৃত্ব, ধর্মানুভূতির নিয়ন্ত্রণ ধর্মব্যবসায়ীদের হাতে থাকবে ততদিন মুসলিমদের সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশা দুরাশা। ততদিন ইসলাম কোনো জীবিত মানুষের কল্যাণে আসবে না, মৃত মানুষের কল্যাণেও আসবে না। আল্লাহর রসুল (সা.) এর দু'টো ভবিষ্যদ্বাণী এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

১. তিনি বলেছেন, এমন সময় আসবে যখন ১) ইসলাম শুধু নাম থাকবে, ২) কোর'আন শুধু অক্ষর থাকবে, ৩) মসজিদসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ ও লোকে লোকারণ্য হবে কিন্তু সেখানে সঠিক পথনির্দেশ (হেদায়াহ) থাকবে না, ৪) আসমানের নিচে নিকৃষ্টতম জীব হবে আমার উম্মাহর আলেম সমাজ, ৫) তাদের সৃষ্ট ফেতনা তাদের দিকেই ধাবিত হবে।(১)

২. আবু যর (রা.) বলেন, একদিন আমি রসুলাল্লাহর (সা.) সাথে ছিলাম এবং তাঁকে বলতে শুনেছি: "আমি আমার উম্মতের জন্য দাজ্জালের থেকেও একটা জিনিসকে বেশি ভয় করি।" আমি ভয় পেয়ে তাঁকে জিজ্ঞাস করলাম, "ইয়া রসুলাল্লাহ (সা.) সেই জিনিস কী?" তিনি বললেন, "আয়াম্যায়ে দোয়াল্লিন বা পথভ্রষ্ট ইমাম"।(২)

এ দু'টো হাদিস থেকে আখেরি যুগের আলেমদের সম্পর্কে রসুলাল্লাহর বক্তব্য খেয়াল করুন। প্রথমত তিনি বলেছেন, আলেমরা হবে আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব। দ্বিতীয়ত, দাজ্জালের থেকেও ভয়ঙ্কর হবে আলেমগণ যে দাজ্জালকে রসুলাল্লাহ মানবজাতির জীবনের সবচেয়ে বড় বিপদ, সবচেয়ে বড় ঘটনা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

ধর্মব্যবসা বহুরূপী। **ধর্মব্যবসায়ীরা বিভিন্ন কেতাবের ভাষা শিখে ও বেশভূষা ধারণ করে নিজেদেরকে একটি ধর্মীয় ভাবমূর্তি প্রদান করেন যেন মানুষ তাদেরকে ধর্মের কর্তৃপক্ষ বলে বিশ্বাস করে। এভাবে মানুষের ঈমানকে তারা আগে ছিনতাই করে, তারপর নিজেদের স্বার্থ আদায়ের জন্য নানাপ্রকার বক্রপথ তারা অবলম্বন করে।** আমরা যদি উদাহরণ টানি তাহলে বহুরকম ধর্মব্যবসারই উদাহরণ আমাদের সমাজে বিরাজ করছে। পৃথিবীতে বিরাজিত তাবৎ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী রয়েছে এবং তাদের অবস্থান প্রবল। কিন্তু আমাদের আলোচনার মূল ক্ষেত্র যেহেতু ইসলাম ধর্ম, তাই আসুন দেখি মুসলমান দাবিদার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মব্যবসা কী কী রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। যেমন:

১. নামাজ পড়িয়ে টাকা নেওয়া।

---

১. হাদিসঃ আলী (রা.) থেকে বায়হাকি, মেশকাত।

২. হাদিসঃ মুসনাদে আহমাদঃ ২১৩৩৪, তিরমিযীঃ ২২২৯

২. জানাজা পড়িয়ে বা তার পরবর্তীতে কবর জেয়ারত করে, কুলখানি, চেহলামে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ও বিশেষ মোনাজাত করে টাকা নেওয়া।

৩. চুক্তি করে বা চুক্তি ছাড়াই কোর'আনের মাহফিল করে টাকা নেওয়া।

৪. রমজান মাসে খতম তারাবি বা অন্য যে কোনো অসিলায় কোর'আন খতম দিয়ে টাকা নেওয়া।

৫. মসজিদ মাদ্রাসার নির্মাণ বা উন্নয়নের নাম করে টাকা তুলে সেটা ঐ খাতে ব্যয় না করে নানা অসিলায় নিজেদের জন্য বৈধ করে নেওয়া।

৬. টাকার বিনিময়ে মিলাদ পড়ানো।

৭. প্রতারণামূলক রাজনীতি করে সেখানে ধর্মকে ঢাল হিসাবে এবং ক্ষমতায় আরোহণের সিঁড়িরূপে ব্যবহার করা।

৮. হজ্বের নামে প্রতারণামূলক বাণিজ্য করা।

৯. প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোনো বুনিয়াদি পরিবর্তন না এনে, ইসলামের কোনো নীতি প্রবর্তন না করে, রাষ্ট্রে ইসলামের কোনো আদর্শ প্রতিষ্ঠা না করে সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম আখ্যা দেওয়া।

১০. সুদের নাম পাল্টে মুনাফা, ইন্টারেস্ট বা অন্য যে কোনো শব্দ ব্যবহার করে ধর্মীয় আবরণে সুদী কারবার করা।

১১. আখেরাতে মুক্তির অসিলা সেজে পীর-মুরিদী করে আয়-রোজগার করা।

১২. জেহাদ কেতালের ভুল ব্যাখ্যা করে জঙ্গিবাদের জন্ম দিয়ে পরাশক্তিধর সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্রব্যবসায়ী দেশগুলোর জন্য রণক্ষেত্র ও অস্ত্রব্যবসার বাজার নির্মাণ করে দেওয়া। আরব দেশগুলোসহ জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীগুলো এই কাজটি সুচারুরূপে করে যাচ্ছে।

১৩. ভোটের সময় এলে আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ধান্ধাবাজ নেতাদের পাক্কা মুসল্লি বনে যাওয়া, হজ্ব-ওমরা পালন ও পীরের দরবারে, মসজিদে মাদ্রাসায় বেশি বেশি যাতায়াত করা। এই সুযোগে তাদের থেকে অর্থ আদায় করা, তাদের সেই অর্থ বৈধ কি অবৈধ সে প্রশ্ন তোলারও প্রয়োজন মনে না করা।

এক কথায় ধর্মকে অর্থোপার্জনে ও স্বার্থ হাসিলে ব্যবহার করাই হলো ধর্মব্যবসা আর মানবতার কল্যাণে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিঃস্বার্থভাবে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করাই হলো ধর্মের সদ্ব্যবহার।

সবচেয়ে বড় অধর্ম হচ্ছে সেটাই যা ধর্মের নামে করা হয়। স্বভাবতই আমাদের আলোচনায় আমরা সেই ধর্মব্যবসাগুলোকে প্রাধান্য দেব যেগুলো সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীকে দিকভ্রান্ত করছে এবং গোটা মানবজাতিকে মহা সঙ্কটের মধ্যে নিক্ষেপ করছে।

ধর্মব্যবসার উৎপত্তি

ধর্মব্যবসায়ী পুরোহিত শ্রেণির উদ্ভব ইতিহাসে নতুন নয়। অতীতেও এদের অস্তিত্ব ছিল। এই শ্রেণি সৃষ্টির অনুমতি আল্লাহ কোনো দীনকেই দেন নি, অন্ততঃ যে কয়টি দীন সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি। তার আগেরগুলোর কথা বলতে পারি না। কিন্তু প্রত্যেক দীনেই (ধর্মে) এরা গজিয়েছেন। নিজেদের নিজেরা সৃষ্টি করেছেন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য, সম্মান, প্রভাব ইত্যাদি ভোগ করার জন্য। আর প্রত্যেক দীনকেই, জীবনব্যবস্থাকেই তারা নতুন ব্যাখ্যা করে নতুন মতবাদ সৃষ্টি করে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলেছেন, গুরুত্বের ওলোট-পালট করে ফেলেছেন, যার ফলে ঐ দীন অর্থহীন হয়ে গেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিষ্টান, মুসলিম, ইহুদি ইত্যাদি প্রত্যেক দীনের ঐ একই ইতিহাস, একই অবস্থা। বর্তমানে ধর্মগুলোর অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে আলেম পুরোহিত (Religious Clerics) গোষ্ঠীটির অংশগ্রহণ ছাড়া ধর্মের কোনো কিছুই কল্পনা করা যায় না। ধর্ম মানেই তারা, তারাই ধর্মের কর্তৃপক্ষ, তারাই মূর্তিমান ধর্ম।

পূর্বের সবগুলো ধর্মই আসলে 'ইসলাম' যার ধারাবাহিকতায় আল্লাহ শেষ নবীর (সা.) উপর নাযেল করেছেন শেষ কেতাব আল কোর'আন। এই শেষ ইসলামে ধর্মব্যবসায়ী পৃথক কোনো গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল না। অর্থাৎ বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠী ধর্ম সম্পর্কে এমন অজ্ঞ থাকবে যে আল্লাহর কাছে মোনাজাতটাও ঠিকমত করতে পারবে না, আর বৃহত্তর জনসাধারণ থেকে আলাদা একটি বেশভূষা চিহ্নিত শ্রেণি যারা অর্থের বিনিময়ে আমাদের মসজিদগুলোতে নামাজ পড়াবেন, মিলাদ পড়াবেন, জানাজা পড়াবেন, কবর জেয়ারত করে দেবেন, ফতোয়া দিবেন, বিয়ে পড়িয়ে দিবেন ইত্যাদি ধর্মীয় কাজগুলো করে দিবেন, আর ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ বৃহত্তর জনসাধারণ ইসলাম সম্পর্কে এ শ্রেণিটির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে এমন কোনো ব্যবস্থা ইসলামের প্রাথমিক যুগে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ছিলই না। তাহলে তাদের জন্ম হলো কীভাবে? এই প্রশ্নের জবাব জানতে আমাদেরকে একটু পেছনে ফিরে যেতে হবে।

মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম পুরুষ মোহাম্মদ (সা:) কে আল্লাহ সর্বশেষ নবী হিসাবে মনোনীত করলেন। তাঁকে আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন তা তিনি পবিত্র

কোর'আনে অন্ততঃ তিনবার সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি স্বীয় রসুল প্রেরণ করেছেন হেদায়াহ ও সত্যদীন (ন্যায়পূর্ণ জীবনব্যবস্থা) সহকারে এই জন্য যে, রসুল যেন একে অন্যান্য সকল জীবনব্যবস্থার উপরে বিজয়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন।(১) মানবজাতির এককেটি অংশ এককে শাসকের অধীনে এককে রকম বিধি-বিধান, নিয়মকানুন মেনে জীবন পরিচালনা করছে। সেই সব মানুষকে একটি ন্যায়পূর্ণ জীবনব্যবস্থার ছায়াতলে নিয়ে আসার চেয়ে কঠিন কাজ, গুরুদায়িত্ব আর কী হতে পারে? **সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তাদের জীবন চলার পথে আল্লাহ যেটাকে ন্যায় বলেছেন সেটাকেই ন্যায় বলে মান্য করবে, আল্লাহ যে কাজ নিষিদ্ধ (হারাম) করেছেন সেটা করবে না - এমন একটি জাগতিক ব্যবস্থাপনা, দর্শন ও আত্মিক অবস্থারই নামই হচ্ছে তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব।** "সামগ্রিক জীবনে আল্লাহর দেওয়া দিক-নির্দেশনাই সঠিক এবং আমরা সেটাই মান্য করব" - এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোই হচ্ছে হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করা একটি জীবনব্যবস্থাও আল্লাহ রসুলকে দান করলেন। সমগ্র মানবজাতির জীবনধারা পাল্টে দেওয়ার এই বিশাল দায়িত্ব একা পালন করার প্রশ্নই আসে না। তাই শুরুতেই তিনি মানুষের মধ্যে তওহীদের আহ্বান প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। মক্কার সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তিনি মানবজাতিকে আহ্বান করলেন, "হে মানবজাতি! তোমরা বল আল্লাহ ছাড়া কোন হুকুমদাতা নেই। তাহলেই তোমরা সফল হবে"। এই সাফল্য কেবল ইহকালের নয়, পরকালেরও।

লক্ষণীয় যে তিনি এখানে সম্বোধন করলেন, "হে মানবজাতি বলে।" সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, এই শেষ দীনের লক্ষ্য হচ্ছে পুরো মানবজাতিকে একটি জীবনব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা, একজন নেতার নেতৃত্বে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি মহাজাতিতে পরিণত করা। এই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে রসুলাল্লাহ ১৩ বছর মক্কায় কেবল তওহীদের ডাক দিয়ে গেলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন আম্মা খাদিজা (রা.), আলী (রা.), আবু বকর (রা.), যায়েদ (রা.), আম্মার (রা.), ওমর (রা.), বেলাল (রা.) প্রমুখ সাহাবিগণ। রসুলাল্লাহ এবং তাঁর সাহাবিগণ তওহীদের ডাক দিতে গিয়ে ১৩ বছর মক্কায় অবর্ণনীয় নির্যাতন নিপীড়ন ভোগ করলেন। তারপর আল্লাহ যখন তাঁকে মদীনায় একটি জনগোষ্ঠীর কর্তৃত্ব দান করলেন তিনি সেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্বভিত্তিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করলেন। তখন এই জাতির মধ্যে এর আদর্শ ও লক্ষ্য নিয়ে কোনো মতভেদ ছিল না। পুরো উম্মতে মোহাম্মদী ছিল একটি জাতি এবং তাদের নেতা ছিলেন একজন স্বয়ং রসুলাল্লাহ। রসুলাল্লাহ তাঁর জীবদ্দশায় ঐ জাতিকে সঙ্গে নিয়ে জেহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, সংগ্রাম) চালিয়ে গেলেন এবং সমগ্র আরব উপদ্বীপ আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থার অধীনে এলো। বাকি পৃথিবীর যাবতীয় অন্যায় অবিচার দূর করে

---

১. আল কোর'আন: সুরা সফ ৯, সুরা তওবা ৩৩, সুরা ফাতাহ ২৮

শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব স্বীয় উম্মাহকে অর্পণ করে রসুলাল্লাহ প্রভুর কাছে চলে গেলেন। রেখে গেলেন পাঁচ দফার অমূল্য এক কর্মসূচি। এই কর্মসূচি তিনি তাঁর উম্মাহর উপর অর্পণ করার সময় বলছেন– "আল্লাহ আমাকে পাঁচটি কাজের আদেশ দিয়েছেন। আমি তোমাদের উপর সেই পাঁচটি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করছি। সেগুলো হলো:

(১) ঐক্যবদ্ধ হও।

(২) (নেতার আদেশ) শোন।

(৩) (নেতার ওই আদেশ) পালন করো।

(৪) হেজরত করো।

(৫) (এই দীনুল হককে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করো।

যে ব্যক্তি (কর্মসূচির) এই ঐক্যবন্ধনী থেকে এক বিঘত পরিমাণও বহির্গত হলো, সে নিশ্চয় তার গলা থেকে ইসলামের রজ্জু (বন্ধন) খুলে ফেললো- যদি না সে আবার ফিরে আসে (তওবা করে) এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতার যুগের (কোনও কিছুর) দিকে আহ্বান করল, সে নিজেকে মুসলিম বলে বিশ্বাস করলেও, নামাজ পড়লেও এবং রোজা রাখলেও নিশ্চয়ই সে জাহান্নামের জ্বালানি পাথর হবে।(১)

উম্মতে মোহাম্মদী এ কর্মসূচি ও তাদের উপরে তাদের নেতার অর্পিত দায়িত্ব হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন তার অকাট্য প্রমাণ এই যে, ঐ উম্মাহ বিশ্বনবীর (সা.) ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পার্থিব সব কিছু কোরবান করে তাদের নেতার উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পূর্ণ করতে জন্মভূমি আরব থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন এক নেতার নেতৃত্বে বজ্রকঠিন ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল, নেতার হুকুমে জীবন উৎসর্গকারী, অন্যায়ের ধারকদের জন্য ত্রাস সৃষ্টিকারী একটি দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতি। **তাদের মধ্যে কোনো মতভেদ ছিল না। রাজনৈতিক স্বার্থ নিয়ে কিছু সাময়িক মতবিরোধের ইতিহাস থাকলেও সেটা গোটা জাতির প্রাণশক্তিকে হরণ করতে পারে নি।** ফলে অল্পসময়ে তারা অর্ধদুনিয়ায় একটি নতুন শান্তিময় সভ্যতার উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হন যা পরবর্তীতে সুফলদায়ী মহীরুহের আকার ধারণ করে। মোটামুটি ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত এই জাতি তার লক্ষ্যে অটল থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল। পরিণতিতে অর্ধ পৃথিবী ইসলামের ছায়াতলে এসে গিয়েছিল, তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে পৃথিবীতে একটি মহান সভ্যতার ভিত নির্মিত হয়েছিল।

সেই জাতির কোর'আনের কোনো অখণ্ড কপিও ছিল না, হাদিসের কোনো বই ছিল না, ফেকাহ, তফসির, ফতোয়ার কেতাব তো দূরের কথা। তবু অর্ধেক দুনিয়া আল্লাহ এ জাতির পায়ের নিচে দিয়ে দিলেন। জাতির সবাই ছিলেন সত্যনিষ্ঠ মো'মেন। যিনি

---

১. হাদিস: আল হারিস আল আশয়ারী (রা.) থেকে আহমদ, তিরমিযি, বাব উল এমারাত, মেশকাত।

ছিলেন যত বড় মো'মেন তিনি ছিলেন তত বড় ন্যায়যোদ্ধা। এর কারণ মো'মেনের সংজ্ঞা কী তা এই জাতির সামনে সুস্পষ্ট ছিল। সেটা হচ্ছে, আল্লাহ বলেছেন, কেবলমাত্র তারাই মো'মেন যারা আল্লাহ ও রসুলের প্রতি বিশ্বাস (তওহীদ) স্থাপন করে, অতঃপর এতে কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ না করে দৃঢ়পদ থাকে এবং আল্লাহ রাস্তায় নিজ জীবন সম্পদ দিয়ে জেহাদ (সর্বাত্মক সংগ্রাম) করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।"(১)

প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী এই সংজ্ঞার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ মো'মেন ছিলেন যদিও তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু তারা ছিলেন ইস্পাতকঠিন ঐক্যবদ্ধ, পিঁপড়ার মতো সুশৃঙ্খল জাতি, নেতার আদেশে নিজেদের জীবন উৎসর্গকারী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ত্রাসসৃষ্টিকারী যোদ্ধা। কোনো বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হলে তারা নেতার সিদ্ধান্তের উপর ন্যস্ত করে দিতেন এবং নিশ্চুপ হয়ে যেতেন। ভুলেও জাতির ঐক্য নষ্ট করে 'কুফর' করতেন না। **দীনের ছোটখাট বিষয়গুলো নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকারী, আল্লামা, মাওলানা, মুফতি, মোফাসসের টাইটেলধারী, মসজিদে, খানকায়, হুজরায় নিরাপদে বসে জনগণের মধ্যে ফতোয়া প্রদান করে জীবিকা নির্বাহকারী একটি আলাদা ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি কল্পনাও করা যেত না।**

তারপর শুরু হলো সেই দুঃখজনক অধ্যায়। আল্লাহর রসুল ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন যে, তাঁর উম্মাহর আয়ু হবে ৬০/৭০ বছর।(২) এখানে উম্মাহর আয়ু বলতে রসুলাল্লাহ (সা.) ব্যক্তিগত আয়ু বোঝান নি, জাতির আয়ু বুঝিয়েছেন। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে আমরা দেখি, ঠিকই তাই হলো। ৬০/৭০ বছর পরে এই উম্মাহ তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলল। জাতির নেতৃত্ব ভুলে গেল এ জাতির উদ্দেশ্য সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর দেওয়া দীনুল হক প্রতিষ্ঠা করে মানবজীবন থেকে সর্বপ্রকার অন্যায় অশান্তি নির্মূল করে দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে তারা অন্যান্য রাজা বাদশাহদের মতো শান শওকতের সঙ্গে রাজত্ব করতে লাগল। আল্লাহর রসুলের সৃষ্টি করা উম্মতে মোহাম্মদীর মোজাহেদরা অর্ধাহারে অনাহারে থেকে জীবন, সম্পদ, ঘাম ও রক্তের বিনিময়ে যে বিরাট ভূখণ্ড এই নেতাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেই নেতারা এই বিরাট পার্থিব সম্পদের অধিকারী হয়ে সীমাহীন ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে পারসিয়ান ও রোমান বাদশাহ কেসরা ও কায়সারদেরকেও ছাড়িয়ে গেল। ধীরে ধীরে জাতি রসুলাল্লাহ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে শুরু করল, এমন কি তারা আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জেহাদ পরিত্যাগ করল। জাতির শাসকরা খলিফা পদবি ধারণ করলেও কার্যত আর আল্লাহ রসুলের খলিফা (প্রতিনিধি) রইলেন না। তারা হয়ে গেলেন উমাইয়া, আব্বাসীয়, ফাতেমীয় রাজা বাদশাহ। তাদের সামরিক অভিযানের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল রাজ্যবিস্তার। সাধারণ মুসলিমরা শাসকদের এই আদর্শচ্যুতির বিরুদ্ধে

---

১. আল কোর'আন: সুরা হুজরাত ১৫

২. হাদিস: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মুসলিম।

কথা বলতে আরম্ভ করল, শাসকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে লাগল। জাতির মধ্যে ভাঙন ধরল।

জেহাদ যখন ত্যাগ করা হলো, তখন জাতির মুখ্য কাজটিই হারিয়ে গেল, জেহাদ সংক্রান্ত বিপুল কর্মব্যস্ততা হারিয়ে ফেলে সময় অতিবাহিত করার জন্য নতুন নতুন কাজ খুঁজে নিল। এর মধ্যে প্রধান একটি কাজ হলো দীনের বিধি বিধানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি। **জাতির লক্ষ্য ঘুরে গেল ব্যক্তিগত আমলের দিকে, তারা ভাবতে লাগল কীভাবে আরো বেশি পরহেজগার হওয়া যায়। ফরদ নামাজের পরেও আরো বহু রকমের নফল নামাজ বের করা হলো। দীনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি বিষয় নিয়ে মাসলা মাসায়েল বের করা আরম্ভ হলো।** মাসলা বের করা হল আদর্শচ্যুত শাসকদের পক্ষে। সেই মাসলার বিপক্ষেও আরেকদল অন্য মাসলা হাজির করতে আরম্ভ করল। এভাবে শুরু হলো দীন নিয়ে মতভেদ। অবস্থা এমন পর্যায়ে গেল যে, দীনের একটি বিষয়ও রইল না, যেটা নিয়ে কোনো বিতর্ক বা দ্বিমত নেই। এভাবে শুধুমাত্র তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কারও সার্বভৌমত্ব বা হুকুম মানবো না এবং এই সার্বভৌমত্বকে সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার প্রাণান্তকর সংগ্রাম করব- এই সহজ সরল কথা অর্থাৎ সেরাতুল মুস্তাকিমের উপরে রসুলাল্লাহ উম্মতে মোহাম্মদীকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, পণ্ডিতদের অতিবিশ্লেষণের ফলে সেই সহজ সরল দীনটি হয়ে গেল জটিল ও দুর্বোধ্য।

একটা জাতির মধ্যে জ্ঞানী, চালাক, বোকা, সর্ব রকম মানুষই থাকবে, সব নিয়েই একটি জাতি। সুতরাং লক্ষ্য যদি জটিল হয় তবে সবার তা বোধগম্য হবে না। জাতির যে অংশটুকু শিক্ষিত ও মেধাবী, শুধু তাদেরই বোধগম্য হবে- সমগ্র জাতি একতাবদ্ধ হয়ে ঐ লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রাম করতে পারবে না। তাই আল্লাহ ও তাঁর রসুল (সা.) যে জাতি সৃষ্টি করলেন তার ভিত্তি করলেন অতি সহজ ও সরল-তওহীদ, একমাত্র হুকুমদাতা, ইলাহ হিসাবে তাঁকেই স্বীকার করে নেওয়া। এবং জাতির লক্ষ্যও স্থির করে দিলেন অতি সহজ ও সরল জীবনব্যবস্থাকে সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীতে শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করা। দুটোই বুঝতে সহজ। সহজ বলেই বিশ্বনবীর (সা.) সৃষ্ট অত্যন্ত অশিক্ষিত জাতিটি, যাদের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা হাতে গোনা যেত, যাদের অনেকেই জানতেনও না যে এক হাজারের উপরে সংখ্যা হয়, তারাও ‘ভিত্তি ও লক্ষ্য’ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছিলেন এবং তা থেকে চ্যুত হন নি এবং তারা সফলভাবে আল্লাহ রসুলের (সা.) উদ্দেশ্য অর্জনের পথে বহু দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু অতি বিশ্লেষণের বিষময় ফলে ঐ দীনুল কাইয়্যেমা, সেরাতুল মোস্তাকীম, সহজ সরল ইসলাম হয়ে গেল অত্যন্ত জটিল, দুর্বোধ্য এক জীবন-বিধান, যেটা সম্পূর্ণ শিক্ষা করাই মানুষের এক জীবনের মধ্যে সম্ভব নয়- সেটাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তো বহু দূরের কথা। এ কারণেই রসুলাল্লাহ কোর’আনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে নিষেধ করে

গেছেন। তিনি বলেছিলেন, “যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞান দিয়ে আল্লাহর কেতাবের তাফসির করে, তার তাফসির যদি সঠিকও হয় তবু সে অপরাধী।”(১)

আর পবিত্র কোর’আনের তাফসির, ব্যাখ্যা অর্থাৎ এর প্রয়োগ কীভাবে করা হবে তার জ্ঞান আল্লাহ স্বয়ং তাঁর রসুলকে দান করেছেন। তিনি বলেছেন, “তারা তোমার নিকট এমন কোনো সমস্যা উপস্থিত করে না যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা (আহসানা তাফসিরা) আমি তোমাকে দান করি নাই।”(২)

যাহোক, যে কথাটি পূর্বে বলেছিলাম, জাতির নেতৃত্ব যখন জেহাদ ত্যাগ করল তখন আব্বাসীয়, উমাইয়া, ফাতেমীয় ইত্যাদি নামের শাসকরা নিজেদের এই অন্যায় কাজের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে সেই জ্ঞানী লোকদেরকে নিয়োগ করল, যারা ইতোপূর্বেই জেহাদ ছেড়ে দিয়ে দীনের মাসলা মাসায়েল নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও গবেষণা শুরু করে দিয়েছিল। এই জ্ঞানীদের নতুন কাজ হলো শাসকের সকল অন্যায় কাজের পক্ষে সাফাই গাওয়া এবং সেগুলোর একটি ধর্মীয় ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে তাকে জায়েজ করা এবং প্রয়োজনে রসুলাল্লাহর নামে হাদিস তৈরি করা। বিনিময়ে শাসকদের পক্ষ থেকে তারা লাভ করতে লাগল মদদ, উপঢৌকন, তোফা, ভোগবিলাসের যাবতীয় উপকরণ সর্বোপরি একটি নিরাপদ নিশ্চিত জীবন। **শাসকের নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে থেকে তারা এভাবে লক্ষ লক্ষ জাল হাদিস সৃষ্টি করতে লাগল। পরবর্তী যুগে সেই জাল হাদিসগুলোর উপর এজমা, কেয়াস করে তৈরি হলো হাজার হাজার মত, পথ, দল। দলের মধ্যে বিভক্তি করে সৃষ্টি হলো উপদল ইত্যাদি। এই জ্ঞানীরাই হলো ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ধর্মজীবী আলেম যাদেরকে প্রচলিত ভাষায় দরবারী আলেম, ওলামায়ে ছু, দুনিয়াদার আলেম ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে।** এরা অর্থের বিনিময়ে ধর্মীয় কার্যাদি করে দেওয়াকে হাজারো জটিল কুটিল যুক্তি ও উপমা হাজির করে ‘জায়েজ’ বানিয়ে দিলেন। আল্লাহ মানুষকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন এবং মানুষকে তার নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করে কাজ করার সুযোগ প্রদান করেন। সেখানে তিনি হস্তক্ষেপ করেন না। সম্ভবত এ কারণেই সত্যের সাথে, আল্লাহ রসুলের সাথে এই ভয়াবহ বিশ্বাসঘাতকতা করা সত্ত্বেও সেই আলেমদের উপর বিধাতার বজ্র নেমে আসে নি। তাদের কাজের পরিণামে গোটা জাতির ললাটে দাসত্বের অভিশাপ নেমে এসেছে, এই ভয়াবহ পরিণাম থেকে জাতির কেউ বাঁচতে পারে নি।

ইসলামের বিধান হলো, জাতির নেতা বা এমাম সালাতেরও এমামতি করবেন। তবে বিধর্মী রাজা বাদশাহদের অনুকরণে ভোগবিলাসে লিপ্ত শাসকরা এটুকু উপলব্ধি করলেন যে ‘খলিফা’ বা আমির’ উপাধি তাদের আর সাজে না, তাই তারা

---

১. হাদিস: জুনদুব (রা.) থেকে আবু দাউদ

২. আল কোর’আন: সুরা ফোরকান ৩৩

সুলতান, মালিক (রাজা বাদশাহ) ইত্যাদি নাম ধারণ করে রাজতন্ত্রের ষোলকলা পূর্ণ করলেন। **এ সময় তারা গাফেলতি করে সালাতে ইমামতি করার জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়াও ত্যাগ করতে লাগলেন এবং মসজিদে তাদের পক্ষ থেকে সালাহ কায়েম করানোর জন্য বেতনভুক্ত ইমামও নিয়োগ দিলেন। এভাবেই ধীরে ধীরে জাতির মধ্যে জন্ম নিল পৃথক একটি গোষ্ঠী যাদের কাছে বাঁধা পড়ল দীনের সকল কর্মকাণ্ড।** তাদের হাতে পড়ে দীন বিকৃত হতে শুরু করল।

এই যে স্বার্থপরবশ হয়ে ইসলামকে বিকৃত করা হলো, এর অনিবার্য পরিণতি জাতি এড়াতে পারল না। প্রথমে হালাকু খান, তৈমুর লঙ এসে তাদেরকে কচুকাটা করল। ক্রুসেডে মার খেল, স্পেন থেকে নির্মূল হয়ে গেল। পরে ব্রিটিশসহ ইউরোপিয়ান ছোট ছোট জাতিগুলো এসে তাদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করল। কয়েক শতাব্দীর গোলামীর জীবন কাটানোর পরও তাদের হুঁশ হলো না। এখনও জাতির ঈমান আমল সেই ধর্মব্যবসায়ীদের হাতেই বন্দী।

সেই তেরশ' বছর পূর্ব থেকে দীন বিকৃত হতে হতে কালের পরিক্রমায় আজ সম্পূর্ণ বিকৃত ও বিপরীতমুখী হয়ে গেছে। এখন যে ইসলামটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা আল্লাহ-রসুলের সেই সহজ সরল ইসলাম নয়, এটা ব্রিটিশ খ্রিষ্টানদের শেখানো, ধর্মব্যবসায়ীদের কায়েম করে রাখা একটি বিকৃত ইসলাম যাকে তারা রুটি রুজির বাহন হিসাবে ব্যবহার করছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, **কে আবার পবিত্র ইসলামকে এই ধর্মব্যবসায়ীদের হাত থেকে উদ্ধার করে মানবজাতির কল্যাণে প্রয়োগ করবে, কে শয়তানের হাত থেকে ধর্মকে মুক্ত করে মানবজাতিকে শান্তি দেবে?**

শুধু এই দীনে নয়, পূর্ববর্তী দীনগুলোতেও ঠিক এভাবেই এই ধর্মের ধ্বজাধারী শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল, তাদের কাজও ছিল দীনের আইন-কানুন, আদেশ, নিষেধগুলোর চুলচেরা বিচার, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং যার পরিণতিতে ঘটে দীনের বিকৃতি। আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে এ ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন এভাবে, "তাদের (নবী ও প্রকৃত মো'মেন) পরে আসলো অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ, তারা সালাহ বিকৃত ও নষ্ট করল ও লালসা পরবশ হলো। সুতরাং তারা অচিরেই তাদের কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।"(১)

অপদার্থ পরবর্তীগণ বলতে নবীদের ও প্রকৃত মো'মেনদের পরে যারা ধর্মীয় বিষয়ে তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ। এই ওয়ারিশরাই হয়ে গেছে অপদার্থ ওয়ারিশ যারা পার্থিব জীবনোপকরণের লোভে পড়ে দীনকে বিকৃত করে ধ্বংস করে ফেলেছে। যেসব নবী শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন তাদের উত্তরাধিকার হয়েছে আরেক শাসক। সাধারণ মানুষ এই ধর্মযাজক ও শাসক উভয়শ্রেণির অনুসরণেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। স্বভাবতই তারা যখন জাতিকে ভুল

---

১. আল কোর'আন: সুরা মারইয়াম ৫৯

পথে পরিচালিত করল, তখন পুরো জাতিটাই বিপথগামী হলো। এটাকেই আল্লাহ বলেছেন 'অপদার্থ উত্তরসূরিগণ'।

অন্যান্য দীনের পুরোহিত শ্রেণির চেয়ে জুডীয় ধর্মে অর্থাৎ ইহুদি ধর্মের পুরোহিত শ্রেণির সঙ্গে বর্তমান 'ইসলাম' ধর্মের পুরোহিত শ্রেণির মিল বেশি। চুলচেরা বিশ্লেষণে ও ফতোয়ায় (বিধানে) হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধরাও কম যান না, একই রকমের, কিন্তু জুডীয় অর্থাৎ ইহুদিদের পুরোহিতদের সাথে শুধু কাজে নয় একেবারে উপাধিতে পর্যন্ত মিলে গেছে। 'ইসলামের' এই শ্রেণির নাম মাওলানা আর ইহুদিদের রাব্বাই/রাব্বি-একদম একার্থবোধক। মাওলা অর্থ প্রভু আর মাওলানা অর্থ আমাদের প্রভু। রব শব্দের অর্থও প্রভু, আর রাব্বাই শব্দের অর্থ আমাদের প্রভু। রাব্বাইরা যেমন তাদের 'ধর্মীয়' জ্ঞানের জন্য প্রচণ্ড অহঙ্কারী এই মাওলানারাও তাই। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ আমাদেরকে এ আয়াতটি দ্বারা দোয়া করতে শিখিয়েছেন: "আন্তা মাওলানা ফানসুর না আলাল কাওমিল কাফেরীন। অর্থাৎ আপনিই আমাদের প্রভু (মাওলানা)! আপনি আমাদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করুন।"(১)

পবিত্র কোর'আনে যত স্থানে মাওলানা শব্দটি এসেছে সেটি আল্লাহ-কে বোঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজে আমরা 'মাওলানা' বলতে আল্লাহকে বুঝি না, বুঝি একটি বিশেষ ধর্মব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে। যিনি মানবজাতিকে ইসলাম শিক্ষা দিলেন সেই রসুলাল্লাহও কোনোদিন এমন খেতাব ব্যবহার করেন নি, তাঁর সাহাবিরাও কোনোদিন এইসব খেতাব ধারণ করেন নি। এগুলো পরবর্তী যুগে দীন ইসলামের মধ্যে বে'দাত বা সংযোজন হিসাবে যুক্ত হয়েছে। যে নামটি আল্লাহ স্বয়ং নিজের জন্য ব্যবহার করেছেন এবং তাঁকে ঐ নামে ডাকার জন্য মানুষকে হুকুম দিয়েছেন, সেই নামটি এই ধর্মজীবী সম্প্রদায় নিজেদের খেতাব হিসাবে ব্যবহার করছেন, যা চরম ধৃষ্টতা। আর ব্রিটিশ খ্রিষ্টানরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে সেখানে তাদের তৈরি একটি বিকৃত ইসলাম শিক্ষা দিয়ে একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করেছে যেখান থেকে হাজার হাজার মানুষ 'মাওলানা' সনদ নিয়ে পাশ করছে। মুসলিমদের ধর্মীয় জীবনের প্রভু এখন তারাই।

জুডীয় ধর্মের রাব্বাই/রাব্বি, সাদ্দুসাইদের সাথে বর্তমানের ইসলাম ধর্মের ধারক-বাহকদের আরও মিল আছে। সেটা অন্ধত্ব। একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। কোনো ব্যাপারের বিশ্লেষণ, অতিবিশ্লেষণ, তারপর আরও বিশ্লেষণ করতে থাকলে ক্রমশ দৃষ্টি সংকুচিত হয়ে আসতে থাকে। তখন ছোটখাট জিনিস নজরে আসতে থাকে। কিন্তু সমগ্র জিনিসটি ক্রমশ দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে থাকে এবং এক সময় সমগ্র জিনিসটি দৃষ্টির বাইরে চলে যায় এবং ছোট অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলো বিরাট হয়ে ধরা দেয়।

---

১. আল কোর'আন: সুরা বাকারা ২৮৬

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- খালি চোখে একটি হাতিকে দেখা এবং একটি বিবর্ধক কাচ দিয়ে হাতিকে দেখা। খালি চোখে দেখলে সমস্ত হাতিটাই দৃষ্টির মধ্যে আসবে এবং যিনি দেখছেন তার যদি সাধারণ জ্ঞান থাকে তবে তিনি বুঝবেন যে হাতিটি একটি বিরাট প্রাণী, ওটার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওটাকে দিয়ে ওমুক ওমুক কাজ করানো যায়, ওটা খায়, ঘুমোয় ইত্যাদি- অর্থাৎ একটি সম্যক ধারণা। আর যদি খালি চোখে হাতিকে না দেখে খুব নিকটে যেয়ে বিবর্ধক কাঁচ দিয়ে ওটাকে পর্যবেক্ষণ করা যায় তবে হাতির গায়ের প্রতিটি লোম, পশম, মোটা মোটা দড়ি, কাছির মতো দেখা যাবে, চামড়ার প্রতিটি ভাঁজ পাহাড়ের গায়ের ফাটলের মতো দেখা যাবে। কিন্তু হাতিটি আর দেখা যাবে না। হাতি কী এবং হাতি দিয়ে কী হয় তাও বোঝা যাবে না। খালি চোখে হাতিকে দেখে হাতি সম্বন্ধে সঠিক ও সম্যক ধারণাই হচ্ছে সঠিক আকিদা (Comprehensive Concept), আর বিবর্ধক কাঁচ দিয়ে ওর গায়ের পশমগুলোকে জাহাজ বাঁধা কাছির মতো দেখে সেটাকে হাতি মনে করা বিকৃত, ভুল আকিদা বা কনসেপ্ট।

ইহুদিদের মহাপণ্ডিত রাব্বাই, সাদ্দুসাইরা বিবর্ধক কাঁচ দিয়ে মুসার (আ.) ধর্মকে দেখে অন্ধ হয়ে যেয়ে তার দীনের উদ্দেশ্য ও সমগ্র রূপটি হারিয়ে ফেলেছিল, সেটা তাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছিল। তাই আল্লাহ পাঠালেন ঈসাকে (আ.) তাদের অন্ধত্ব ঘোচাতে। ঈসা (আ.) এসে চেষ্টা করলেন তাদের চোখ থেকে বিবর্ধক কাঁচ সরিয়ে ফেলতে যাতে তারা মুসার (আ.) সমগ্র দীনটাকে আবার দেখতে পায়। কিন্তু তাদের জ্ঞানের অহংকার, তাদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের অহংকার তা করতে দিল না। তারা দেখল সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা, সম্মান বিপন্ন। তারা সত্য নবী ঈসাকে (আ.) অস্বীকার করে তাকে বিদেশি প্রভু রোমানদের সহায়তায় হত্যার চেষ্টা করল।

সুতরাং এটা আল্লাহর বাণী ও ইতিহাস সাক্ষী যে ধর্মব্যবসায়ী আলেম শ্রেণিই পার্থিব সম্পদের লোভে নিজেদের সকল অন্যায়কে ধর্মের মোড়কে ঢাকতে গিয়ে দীনের বিকৃতি সাধন করেছেন এবং দীনের অতি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দীনকে সাধারণের বোধগম্যতার বাইরে নিয়ে গিয়েছেন। তাদের এই কাজের ফলে ঐ জাতিগুলোর কী দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হয়েছিল তা রসুলাল্লাহ (সা.) খুব ভালভাবেই জানতেন, তাই তিনি নিজের সৃষ্ট জাতিটাকে, তাঁর উম্মাহকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যাতে এই উম্মাহও যেন ঐ একই ভুল করে ধ্বংস না হয়। একজন সাহাবা তাঁকে একটু খুঁটিয়ে প্রশ্ন করাতে তিনি উম্মাভরে বলেছিলেন- তোমাদের পূর্ববর্তী অনেক জাতি তাদের নবীদের এমনি করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করত, তারপর সেই উত্তরগুলো নিয়ে নানা গবেষণা করে মতভেদ সৃষ্টি হতো এবং ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি তোমাদের যতটুকু করতে বলেছি ততটুকু করতে চেষ্টা করো, ওর বেশি আমাকে প্রশ্ন করো না।(১) বিশ্বনবীর (সা.) এই হাদিসটিকে ভাল করে বোঝার প্রয়োজন আছে। এই হাদিসটির মধ্যে তিনটি জিনিস আছে।

---

১. হাদিসঃ ইবনে মাসুদ (রা.) থেকে বোখারী।

প্রথম হলো- তাকে খুঁটিয়ে কোনো প্রশ্ন করা অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণে যাওয়া নিষেধ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় হলো- ঐ কাজের পরিণতি হলো জাতির বিভক্তি ও ধ্বংস।

তৃতীয় হলো- রসুলাল্লাহ (সা.) যেটুকু করতে সরাসরি আদেশ করেছেন তার বেশি এগুতে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

অর্থাৎ অতি ধার্মিক হওয়া, দীনের অতি বিশ্লেষণ করে সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পালন করা নিষেধ হয়ে গেল। আল্লাহর রসুল (সা.) যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন সে কাজ শরিয়াহ মোতাবেকই যে নিষিদ্ধ, হারাম আশা করি তাতে কারো দ্বিমত থাকতে পারে না।

কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুল (সা.) যে কাজ নিষিদ্ধ করেছেন সেই নিষিদ্ধ কাজই করা হলো এবং করা হলো পুরোদমে, মহা উৎসাহে এবং অতি পুণ্যের, সওয়াবের কাজ বলে মনে করে। এমন কি হাদিস আবিষ্কার করা হলো যে, "আমার উম্মতের ইখতিলাফ (মতবিরোধ) রহমতস্বরূপ"।(১) এ হাদিসটি জাল হলেও এর ভিত্তিতে উম্মতের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করা হলো তুমুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে। এখনও দীন নিয়ে তর্ক বাহাসকারীরা এই জাল হাদিসটি তাদের অপকর্মের দলিল হিসাবে যথারীতি পেশ করেন।

ঐ কাজ করে জাতির মন-মগজ আসল উদ্দেশ্য, বিশ্বনবীর (সা.) দায়িত্ব, সমস্ত পৃথিবীতে এই দীন, জীবন-বিধান চালু করার সংগ্রাম থেকে মোড় ঘুরিয়ে ঐ দীনের খুঁটিনাটি পালন করার মধ্যে ব্যাপৃত হয়ে পড়ল এবং ফলে নানা মাযহাবে (দলে) ও ফেরকায় বিভক্ত হয়ে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ল। যারা দীনের খুঁটিনাটির অবিশ্বাস্য চুলচেরা বিশ্লেষণ করে জাতিকে বহু ভাগে বিভক্ত করে ঐ বিভক্তিগুলোর মধ্যে বাদানুবাদ, তর্কাতর্কি সৃষ্টি করে, ঐক্য নষ্ট করে জাতিকে দুর্বল নির্জীব করে দিয়েছিলেন, তারা সেরাতুল মোস্তাকীম- সহজ সরল দীনকে, জটিলতার, দুর্বোধ্যতার চরমে নিয়ে সাধারণ মানুষের বোঝার বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন। রসুলের সময় যা ছিল মহাগুরুত্বপূর্ণ সেটাই গুরুত্বহীন বিষয়ে পরিণত হলো আবার রসুলের সময় যার কোনো গুরুত্বই ছিল না, সেটাই মহাগুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল।

দীনের অতিব্যাখ্যা বোঝাতে চুলচেরা শব্দটি স্বয়ং আল্লাহর নবী ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, "তারা অভিশপ্ত, যারা চুল ব্যবচ্ছেদে (অর্থাৎ ক্ষুদ্র বিষয়ে) লিপ্ত এবং রসুলাল্লাহ (সা.) তিনবার এই কথা উচ্চারণ করলেন।"(২) ইমাম আন-নববী বলেন, "এখানে 'চুল চিরতে (ব্যবচ্ছেদ) লিপ্ত ব্যক্তিদের বলতে তাদের দিকে ইঙ্গিত করা

---

১. আল্লামা সুবকী বলেছেন: "মুহাদ্দিসগণের কাছে এটি হাদীস বলে পরিচিত নয়। আমি এ হাদীসের কোন সনদ-ই পাই নি, সহীহ, যয়ীফ বা বানোয়াট কোন রকম সনদই এ হাদীসের নেই।" সূত্র: মোল্লা কারী, আল-আসরার, ৫১ পৃ, সুয়ূতী, আল-জামি আস সগীর ১/১৩, আলবানী, যায়ীফাহ ১/১৪১, নং ৫৭, যায়ীফুল জামিয় ৩৪ পৃ।

২. হাদিস: মুসলিম, আহমাদ ও আবু দাউদ

হয়েছে যারা কথায় ও কাজে আল্লাহ প্রদত্ত সীমার চেয়ে অগ্রবর্তী হয়ে যায় (বাড়াবাড়ি, অতিবিশ্লেষণ করে)।"(১)

আরেক শ্রেণির আলেম এই ভারসাম্যপূর্ণ দীনের মধ্যে পূর্ববর্তী ধর্মগুলো থেকে উদ্ভূত ভারসাম্যহীন সুফীবাদ, পীরতন্ত্র আমদানি করে উম্মাহর বিস্ফোরণমুখী (Explosive), বহির্মুখী (Extrovert) চরিত্রকে উল্টিয়ে একেবারে অনড় (Passive) ও অন্তর্মুখী (Introvert) চরিত্রে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, দুর্বার গতিশীল উম্মতে মোহাম্মদী ঘরমুখী, অন্তর্মুখী হয়ে তাদের মূল কাজ ছেড়ে দীনের ব্যক্তিগত আমল-আখলাক, যিকির-আজকার ইত্যাদিতে মশগুল হয়ে ভাবতে লাগল যে তাদের সওয়াবের পাল্লা খুব ভারি হচ্ছে। **অতি-বিশ্লেষণকারী আলেম ও ভারসাম্যহীন সুফিবাদী এই উভয়শ্রেণির কাজের ফলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি শুধু সর্ব নিকৃষ্ট জাতিতেই পরিণত হলো না, যাদের উপর তাদের জয়ী হবার কথা এবং এক সময় হয়েও ছিল, তাদের কাছে পরাজিত হয়ে তাদের ঘৃণিত ক্রীতদাসে পরিণত হলো**। এটা যে হবে তাও রসুলাল্লাহ বলে গেছেন এবং এর কারণও বলে গেছেন। তিনি একদিন সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কি জানো, ইসলামকে কীসে ধ্বংস করবে? এই প্রশ্ন করে তিনি নিজেই জবাব দিচ্ছেন- শিক্ষিতদের ভুল, মোনাফেকদের বিতর্ক এবং ইমামদের ভুল ফতোয়া।(২) যে কাজ ইসলামকেই ধ্বংস করে দেয় সে কাজের চেয়ে বড় গোনাহ আর কি হতে পারে!

বিশ্বনবীর (সা.) পর আর নবী আসবেন না, নবুয়তের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু কোনো লোক যদি আল্লাহর রহমে এই শেষ ইসলামকে সামগ্রিকভাবে দেখতে পায়, এর উদ্দেশ্য এবং ঐ উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া বুঝতে পারে, এক কথায় সঠিক আকিদা পায় এবং সেই লোক যদি তা প্রচার করে তবে 'ধর্মীয়' জ্ঞানের দম্ভ ও আত্মম্ভরিতায় রাব্বাইরা যেমন সত্য নবী ঈসাকে (আ.) অস্বীকার করেছিলেন এবং তাঁর যে অবস্থা করেছিলেন, আজকের এই মাওলানারা তার সাথে সেই আচরণই করবেন। এটা আমার কথা নয়- স্বয়ং বিশ্বনবী (সা.) মাহ্দী (আ.) সম্বন্ধে এ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, **"যখন আল-মাহদী আবির্ভূত হবেন, তাঁর শত্রু হবে কেবল ঐ সমাজের আলেম সমাজ। তারা যদি তলোয়ার দ্বারা তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম নাও হয়, তাকে হত্যার জন্য ফতোয়া জারি করবে।"**(৩) তবে তিনি এও বলেছেন, "এই দীন ভবিষ্যতে যখন বিকৃত হবে তখন যে ভয় না করে দাঁড়িয়ে দীনের প্রকৃত রূপ প্রচার করবে, রসুলাল্লাহর নীতিকে পুনর্জীবিত করবে, তার স্থান (দরজা) নবীদের স্থানের চেয়ে মাত্র এক দরজা নিচু হবে। অন্য হাদিসে তার সওয়াব (পূণ্য) একশ' শহীদের সমান হবে।(৪)

---

১. রিয়াদুল সালেহীন

২. হাদিস: মেশকাত।

৩. হাদিস: বায়ান আল আইমা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা ৯৯।

৪. হাদিস: আবু হোরায়রাহ (রা.) থেকে বায়হাকি, মেশকাত।

ধর্মব্যবসা নিষিদ্ধ হওয়ার দলিল

এই অধ্যায়ে আমরা পবিত্র কোর'আন ও রসুলাল্লাহর পবিত্র জীবনাদর্শ থেকে ধর্মব্যবসা নিষিদ্ধ (হারাম) হওয়ার প্রমাণগুলো দেখাতে চেষ্টা করব। মুসলমানদের সমাজ কাঠামোয় ধর্মব্যবসা ও ধর্মব্যবসায়ী আলেম শ্রেণির অনুপ্রবেশের পর থেকে এ পর্যন্ত যারা ধর্মীয় কার্যাবলীর দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি করেছেন, যারা ইসলামের ভাষ্যকার বলে জনারণ্যে গৃহীত তারা স্বভাবতই আল্লাহ-রসুলের এতদ্‌সংক্রান্ত কঠোর সাবধানবাণীগুলো মানুষের কাছে প্রচার করেন না। এর কারণ এগুলো যদি ধর্মবিশ্বাসী জনমণ্ডলী জানতে পারে তাহলে তাদের ধর্মব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই তারা সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন জনগণ যেন ধর্মের বিষয়ে অজ্ঞ-মূর্খ থাকে, কেননা এ অজ্ঞতা-মূর্খতাই হচ্ছে তাদের ব্যবসায়ের পুঁজি।

এই যে তারা আল্লাহর থেকে আগত বিধানগুলোকে, শিক্ষাগুলোকে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার নিমিত্তে গোপন করে থাকেন, এই সত্য গোপন করাটা ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ। **সত্য গোপন করা আর মিথ্যাচার করা একই কথা। সত্য মানুষকে শান্তির পথ দেখায়, জান্নাতের পথ দেখায়। যারা সেই সত্যকে গোপন করে তারা মানবসমাজের শান্তির অন্তরায়, তাদের পরকালীন জান্নাতের অন্তরায় অর্থাৎ জাহান্নামের কারণ।** সামান্য কিছু টাকার জন্য যারা মানবজাতির এত বড় ক্ষতি সাধন করে তারা কত বড় অপরাধে অপরাধী এবং পরকালে তাদের কী কঠিন দুর্দশা হবে তা পবিত্র কোর'আনের বহু স্থানে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। এই কথাগুলোকেও তারা গোপন করে থাকে। যাদের মাতৃভাষা আরবি নয় তাদের কাছে কোর'আনের শিক্ষা গোপন রাখা সহজ। এমন কি যারা আরবি বোঝেন বা কোর'আনের অনুবাদ পড়েন তাদেরকেও ঐ আয়াতগুলোর ভুল ও মনগড়া তাফসির দাঁড় করিয়ে সেগুলোর প্রকৃত শিক্ষাকে আড়াল করেন ধর্মব্যবসায়ী মোফাসসের, মুফতি ও আলেমগণ।

পবিত্র কোর'আনে আল্লাহর বাণীকে, সত্যকে গোপন (conceal) করার ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যবহার করেছেন 'তাক্‌তুমু, ইয়াকতুমুনা' এই শব্দগুচ্ছ। আর ধর্মের কাজ করে মানুষের কাছ থেকে তার বিনিময়ে তুচ্ছ পার্থিব মূল্য, বৈষয়িক স্বার্থ (small price, a gain) হাসিল করার ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যবহার করেছেন 'সামানান

কালিলান’। এই শব্দ দুটো কোর’আনে বার বার এসেছে। এ কাজটি যে কেবল হারামই নয়, এটা যে কুফর, যারা এ কাজ করবে তারা যে আগুন খাচ্ছে, পরকালেও তারা যে জাহান্নামে যাবে, তারা যে আলেম নয় বরং পথভ্রষ্ট, পবিত্র কোর’আনের সুরা বাকারার ১৭৪-১৭৫ নম্বর আয়াতে এই সবগুলো কথা আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ও সরল ভাষায় উল্লেখ করেছেন যা বোঝার জন্য কোনো তাফসির বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না, সরল অনুবাদই যথেষ্ট। এ আয়াতে আল্লাহ বলেন,“বস্তুত, যারা আল্লাহ কেতাবে যা অবতীর্ণ করেছেন তা গোপন করে এবং এর বিনিময়ে পার্থিব তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই ঢুকায় না। এবং আল্লাহ হাশরের দিন তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব। এরাই হচ্ছে সেই সমস্ত মানুষ যারা সঠিক পথের (হেদায়াহ) পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা (দালালাহ) এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করে নিয়েছে। আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল।”(১)

এই দীনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি এই আয়াতে ঘোষিত হয়েছে। যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কেতাবের বিধিবিধান ও শিক্ষাকে গোপন করে এবং দীনের বিনিময়ে অর্থ বা স্বার্থ হাসিল করে তারা-

(১) “আগুন ছাড়া কিছুই খায় না।” অর্থাৎ তারা যা কিছু খায় তা সমস্তই জাহান্নামের আগুন। তাদের এই অপকর্ম, গর্হিত কাজ তাদের ভক্ষিত সকল হালাল বস্তুকেও হারামে পরিণত করে, যেভাবে আগুন সব কিছুকেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

(২) “হাশরের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না”। এ থেকে বোঝা যায় আল্লাহ তাদের উপর কতটা ক্রোধান্বিত। আল্লাহ যার সাথে কথাও বলবেন না তার সেই মহাবিপদের দিন কী দুর্দশা হবে কল্পনা করা যায়?

(৩) “তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না।” মানুষ মাত্রই পাপী, আল্লাহর ক্ষমার সরোবরে স্নান করেই মানুষ পাপমুক্ত হয়ে জান্নাতে যেতে পারে। আল্লাহর এই ক্ষমার হকদার হচ্ছে মো’মেনগণ। কিন্তু যারা ধর্মব্যবসায়ী তারা গাফুরুর রহিম, আফওয়ান গফুর, গাফুরুন ওয়াদুদ, সেই অসীম প্রেমময় ক্ষমাশীল আল্লাহর ক্ষমা থেকেও বঞ্চিত হবে। আল্লাহ তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না।

(৪) “তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব”। এ হচ্ছে চূড়ান্ত কথা যা সব অস্পষ্টতাকে নস্যাৎ করে দেয়। ধর্মের কাজ করে স্বার্থহাসিলকারীরা জাহান্নামী এ নিয়ে আর কোনো সন্দেহের বা দ্বিমত পোষণের অবকাশ থাকে না।

(৫) “তারা হেদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে”। খুবই দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য। আমরা আলেম সমাজের কাছে কেন যাই, কেন তাদের ওয়াজ, খোতবা

---

১. আল কোর’আন: সুরা বাকারা ১৭৪-১৭৫

নসিহত শ্রবণ করি? নিশ্চয়ই পরকালীন মুক্তির পথ জানার জন্য? হেদায়াহ শব্দের মানেই হচ্ছে সঠিক পথনির্দেশ। আল্লাহ বলেই দিচ্ছেন, যারা ধর্মের কাজের বিনিময় গ্রহণ করে তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট। একজন পথভ্রষ্ট মানুষ কী করে আরেক ব্যক্তিকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে? এ কি সম্ভব? সুতরাং ধর্মজীবী, পেশাদার আলেমদের কাছে যারা মুক্তিপথের সন্ধান করবে তারাও পথভ্রষ্টই হবে, তারাও জাহান্নামেই যাবে। সঠিক পথের দিশা পাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। একজন মানুষ অকপটচিত্তে কোনো একটি গন্তব্যের পানে রওয়ানা করল। কোনো এক চৌরাস্তায় গিয়ে যদি সে ভুল পথটি বেছে নেয় তাহলে সে কি বাকি জীবন পথ চলেও তার গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে? তার পথ চলাই সার হবে। সে মনে মনে ভাববে একটু পরেই আমি গন্তব্যে পৌঁছে যাব কিন্তু সে কোনোদিনই গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে না। **তেমনি ধর্মব্যবসায়ীদের দিক নির্দেশনা অনুসরণ করে কোনোদিনই একজন মহা পরহেজগার মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে না। তার সব আমল-আখলাকই দিনশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, কেয়ামতের দিন তাকে হতাশা ঘিরে ধরবে।** ধর্মব্যবসায়ী আলেম ও পীরদের ব্যাপারে আল্লাহ এ জাতিকে সতর্ক করার পাশাপাশি আখেরাতে তাদের কী শাস্তি দেওয়া হবে সেটা বলে দিয়েছেন। আজ ধর্মব্যবসায়ীদের একটি অংশ পীর সেজে বলছে, আমাদেরকে টাকা দাও, আমরা পরকালে তোমাদের নাজাতের উসিলা হব। আরেকটি অংশ তো নামাজ পড়িয়ে, ওয়াজ করে ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে ধর্মকে ব্যবহার করে জীবিকা নির্বাহ করছেনই। এই উভয় শ্রেণি সম্পর্কে আল্লাহ পূর্বেই পবিত্র কোর'আনে সতর্কবাণী ঘোষণা করেছেন এই বলে যে, "অধিকাংশ আলেম ও সুফিবাদীরা মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। তারা যে সোনা রূপা সঞ্চয় করে, হাশরের দিন সেগুলো উত্তপ্ত করে তাদের ললাটে ও পার্শ্বদেশে ছ্যাঁকা দেওয়া হবে।"(১)

অথচ **এইসব ভারসাম্যহীন সুফিবাদীদের কথায় কোটি কোটি মুরিদান নিজেদের জমি-জমা বিক্রি করে দিচ্ছে তাদের পায়ে সর্বস্ব ঢেলে দিচ্ছে, পীরদেরকে ভোট দিচ্ছে, পীরদের আহ্বানে সংখ্যাধিক্যের অহঙ্কারে আস্ফালন করছে, বিভিন্ন উদ্ভট দাবি আদায়ের নামে দেশ ও জাতির বিপুল ক্ষতি সাধন করছে এবং দেশ অচল করে দেওয়ার হুমকি ধামকি প্রদর্শন করছে।** সকল জাতীয় ধর্মব্যবসায়ীদের থেকে মো'মেনদের ঈমান ও আমলকে সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন,"তাদের অনুসরণ করো যারা তোমাদের কাছে কোনোপ্রকার বিনিময় চায় না এবং যারা সঠিক পথে, হেদায়াতে আছে।"(২)

---

১. আল কোর'আন: সুরা তওবা ৩৪।

২. আল কোর'আন: সুরা ইয়াসীন ২১

এই আয়াতে আল্লাহ পরিষ্কার দুটো বিষয় (১) যারা বিনিময় চায় না, (২) যারা হেদায়াতে তথা সঠিক পথে রয়েছে তাদের কথা শুনতে ও মানতে, তাদের অনুসরণ করতে হুকুম করেছেন। এই হুকুম সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি যারা বিনিময় নেয় এবং নিজেরাই পথভ্রষ্ট তাদের আনুগত্য, অনুসরণ করে তাহলে সে আল্লাহরই নাফরমানি করল। বর্তমানে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব এভাবেই ধর্মব্যবসায়ীদের আনুগত্য করে আল্লাহর হুকুমকে লঙ্ঘন করে চলেছে।

আল্লাহর দৃষ্টিতে দীনব্যবসা কত ঘৃণিত তা উপলব্ধি করার জন্য সুরা বাকারার ১৭৪ নম্বর আয়াতের পূর্বের আয়াতটিও পড়া দরকার। মনে রাখতে হবে, কোর'আনের একেকটি বিচ্ছিন্ন আয়াত উল্লেখ করে অনেক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী মানুষের ঈমানকে বিপথে চালিত করে। তাই একটি বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে সেটার পূর্ণ রূপটাকে বিবেচনায় নিতে হবে। হাতির একটি শুঁড় পুরো হাতির প্রতিনিধিত্ব করে না, বরং ভুল ধারণাই প্রদান করে।

সুরা বাকারা ১৭৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ কিছু বস্তুকে খাদ্য হিসাবে হারাম করেছেন, কিন্তু বলেছেন নিরূপায় হলে খেতে পার, আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি বলেন, "তিনি তো হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি অনন্যোপায় হয়ে, লোভের বশবর্তী না হয়ে বা সীমালঙ্ঘন না করে তা ভক্ষণ করে তাহলে তার কোনো গোনাহ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।"(১)

লক্ষ্য করুন, এ আয়াতে আল্লাহ কয়েকটি বস্তু ভক্ষণকে হারাম করলেন, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে পড়ে বা বিশেষ প্রয়োজনে কেউ যদি বাধ্য হয়ে খায় তাহলে তাকে তিনি ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে যেখানে আল্লাহ দীনের বিনিময়ে অর্থগ্রহণ করাকে 'আগুন খাওয়া' বললেন, তার পরে কিন্তু এটা বললেন না যে, অনন্যোপায় হলে, বিশেষ প্রয়োজনে খাওয়া যাবে এবং আল্লাহ সে অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। বরং বললেন, যারা এটা করবে তাদের সাথে তিনি রোজ হাশরে কথাই বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না। এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কোনো অবস্থাতেই, এমন কি মরে গেলেও আল্লাহর দীনের বিনিময়ে স্বার্থ হাসিল করা, অর্থ রোজগার করে, একে জীবিকার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। তাহলে আর কোন উসিলায় এই কাজকে জায়েজ করা হবে? সুতরাং অনেকে যে প্রশ্নটি তোলেন যে তারা তাহলে কী করে খাবে, সে প্রশ্নটিও অবান্তর।

যারা পথভ্রষ্ট ও ধর্মব্যবসায়ী আলেম তারা কীভাবে জাতির ধ্বংস বয়ে আনে সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ হলেও এখানে একটু উল্লেখ করে যেতে চাই। সুরা বাকারার ১৭৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ অল্প কথার মধ্যে সেই কারণটি উল্লেখ করেছেন।

---

১. আল কোর'আন: সুরা বাকারা ১৭৩

তিনি বলেন,"যে কারণে এ শাস্তি তা হলো, আল্লাহ সত্যসহ কেতাব নাজিল করেছেন। এবং যারা এই কেতাবের বিষয়বস্তু নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করে তারা চূড়ান্ত পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।"(১)

বস্তুত **আল্লাহর দীন বিকৃত হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে দীনের বিষয়বস্তু নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি করা। এই কাজটি সাধারণ মুসলিমরা করেন না, এটা করেন যাদের দীন সম্পর্কে জ্ঞান আছে অর্থাৎ কথিত ধর্মজ্ঞানীরা**। তাদের দীন সংক্রান্ত মতভেদের পরিণামে জাতিও তাদের অনুসরণ করে বহু ভাগে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেছে এবং এখনও নতুন নতুন মতবাদে দীক্ষা নিয়ে এক উম্মাহকে আরো টুকরো টুকরো করে ফেলছে। সামান্য তারাবির সালাত ৮ রাকাত না ২০ রাকাত, নবী নূরের তৈরি না মাটির তৈরি এসব অনর্থক বিষয় নিয়ে তারা শত শত বছর বিতর্ক করে যাচ্ছেন।

একজন জীবিত মানুষকে যখন দুইটি টুকরো করা হয় সে আর জীবিত থাকে না, তেমনি আজ ১৬০ কোটি উম্মতে মোহাম্মদীর দাবিদার জনগোষ্ঠী অর্ধপৃথিবী জুড়ে বিরাট লাশের মতো পড়ে আছে। হাজার হাজার ভাগে তারা খণ্ডবিখণ্ড। এই কাজটি করেছেন জাতির কথিত আলেম সাহেবরা, ফেরকা সৃষ্টিকারী ইমামগণ, দীনের অতি বিশ্লেষণকারী মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুজতাহিদ, মুফতিগণ, ভারসাম্যহীন সুফিবাদী পীর, মাশায়েখ, বুজুর্গানে দীনেরা। তারা তাদের অনুসারী তৈরি করেছেন, রসুলের (সা.) হাতে গড়া জাতি ছিন্নভিন্ন হয়ে প্রাণহীন লাশে পরিণত হয়েছে।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, **ইসলামের প্রতিটি আমলের উদ্দেশ্য হবে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কোনো আমল করা হলে সেটা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না, সেটার বিনিময়ও আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে না**। উপরন্তু সেই লোক দেখানো আমল তার জাহান্নামের কারণ হবে। রসুলাল্লাহ (সা.) বলেন, কেয়ামতের দিন এমন একজন 'আলেমকে' উপস্থিত করা হবে যে দীনের জ্ঞান অর্জন করেছে এবং মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছে এবং কোর'আন পাঠ করেছে। অতঃপর তাকে আল্লাহর নেয়ামতসমূহ স্মরণ করানো হবে। সেও তা স্বীকার করবে।

আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন: আমার দেয়া নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করেছ?

সে বলবে: আমি আপনার দেওয়া নেয়ামতের বিনিময়ে দীনের জ্ঞান অর্জন করেছি, অন্যকে তা শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার সন্তুষ্টির জন্যে কোর'আন পাঠ করেছি।

আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি এই জন্যে বিদ্যা শিক্ষা করেছিলে যাতে করে মানুষ তোমাকে আলেম বলে। আর এই জন্যে কোর'আন পাঠ করেছিলে যাতে লোকেরা তোমাকে কারী বলে। পৃথিবীতে তোমাকে এই সব বলা

---

১. আল কোর'আন: সুরা বাকারা ১৭৬

হয়ে গেছে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের আদেশ দেয়া হবে। অতঃপর নাক ও মুখের উপর উপুড় করে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।⁽¹⁾

যেখানে শুধু আলেম বা কারী বলে পরিচিত হওয়ার বাসনা থাকার দরুন তার সব আমল ব্যর্থ সেখানে অর্থ রোজগারের নিয়তে আলেম দাবিদার ব্যক্তির প্রতি কী আচরণ করা হবে সেটাও আল্লাহর রসুল বলে গেছেন, "যে ব্যক্তি এমন কোনো জ্ঞান অর্জন করল, যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, কিন্তু তা সে কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে অর্জন করল, কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত পাবে না।"(২)

বিদায় হজ্বের দিন আল্লাহর রসুল বলেছিলেন, "আজ যারা এই সমাবেশে উপস্থিত নেই তাদের কাছে যারা উপস্থিত রয়েছ তারা আমার এই কথাগুলো পৌঁছে দেবে।" সত্য প্রচারের এই যে দায়বদ্ধতা ও বাধ্যবাধকতা উম্মাহর উপর তাদের নেতা, আল্লাহর শেষ রসুল কর্তৃক অর্পিত হলো সেই দায়িত্ব কি উম্মাহ টাকার বিনিময়ে পালন করবে? **এই সত্যের শিক্ষা প্রদানের সাথে কি অর্থের বা স্বার্থের কোনো সংযোগ থাকতে পারে? আল্লাহর রসুল যা কিছু করেছেন তা কি তিনি অর্থের বিনিময়ে করেছেন?** নাউজুবিল্লাহ। তিনি নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর নির্দেশে অতিবাহিত করেছেন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য, মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ তাঁকে এর বিনিময়ে কোনো আজরিন, খার্‌জান, মা'লান অর্থাৎ মজুরি, সম্পদ, বিনিময় (payment, wealth, reward) গ্রহণ না করার জন্য অন্তত ছয়টি আয়াতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ বলেছেন,

(১) এবং তুমি তাদের নিকট কোনো মজুরি দাবি করো না। এই বাণী তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র।(৩)

(২) বল! আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাই না। এবং যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের দলভুক্ত নই।(৪)

(৩) ...বল! আমি এর (দীনের) বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে প্রেম-ভালোবাসা ও আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার ব্যতীত অন্য কোনো মজুরি চাই না।(৫)

---

১. হাদিসঃ সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ।

২. হাদিসঃ আবু হোরায়রাহ রা. থেকে আবু দাউদ।

৩. আল কোর'আন: সুরা ইউসুফ ১০৪

৪. আল কোর'আনঃ সুরা সা'দ ৮৬

৫. আল কোর'আনঃ সুরা শুরা ২৩

(৪) (হে মোহাম্মদ!) তুমি কি তাদের নিকট কোনো মজুরি চাও? তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই তো শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রেযেকদাতা।(১)

(৫) তবে কি তুমি তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাচ্ছো যা ওরা একটি দুর্বহ বোঝা মনে করে?(২)

(৬) তাঁদেরকেই (নবীদেরকেই) আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন। সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর; বল! এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না।(৩)

শেষোক্ত আয়াতটিতে আল্লাহ পূর্বের সমস্ত নবী-রসুলদের কথা উল্লেখ করে তাঁর শেষ রসুলকে (সা.) নির্দেশ দিচ্ছেন পূর্বসূরীদের পথ অনুসরণ করতে। সেই পথটি কী? সেটা হচ্ছে বিনা মজুরিতে আল্লাহর দীনকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সমসাময়িক বিকৃত ধর্মের ধারক বাহকদের ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান নেওয়ার দরুন আল্লাহর নবী-রসুলগণ ধর্মব্যবসায়ী আলেম পুরোহিত গোষ্ঠীর দ্বারা প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। নবী-রসুলরা তাদের এই ধর্মব্যবসাকে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন, যার ফলে তারা রুজি রোজগার বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি সম্মান ও কর্তৃত্ব খোয়ানোর আশঙ্কায় নবী-রসুলদের বিরুদ্ধে জনগণ ও শাসক শ্রেণিকে খেপিয়ে তুলেছেন। **নবী-রসুলগণ সকলেই তাদের জাতির উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ ঘোষণা দিয়েছেন যে, আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় রয়েছে আল্লাহর কাছে। এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি যা তাদের সামনে উপস্থাপন করছেন তা নির্ভেজাল সত্য, হক্, এতে মিথ্যার কোনো মিশ্রণ নেই। কারণ প্রতিটি মিথ্যাই হয় উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, তাতে মানুষের কোনো না কোনো পার্থিবস্বার্থ জড়িত থাকে।** নবী-রসুলগণ যে কোনো পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছেন না সেটা সুস্পষ্ট করার জন্যই এ কথাটি বলতেন। বিনিময়গ্রহণ না করা তাঁদের সত্যতার, হাকিকতের বড় একটি নির্দেশক। এ বিষয়ে নবী-রসুলদের (আ.) বেশ কয়েকজনের ঘোষণা আল্লাহ দৃষ্টান্তস্বরূপ পবিত্র কোর'আনেও সন্নিবদ্ধ করেছেন। যেমন:

১. নূহ (আ.) এর ঘোষণা: হে আমার সম্প্রদায়! এর পরিবর্তে আমি তোমাদের নিকট ধন সম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিক আল্লাহর নিকট।(৪)

---

১. আল কোর'আন: সুরা মো'মেনুন ৭২

২. আল কোর'আন: সুরা তুর ৪০

৩. আল কোর'আন: সুরা আনআম ৯০

৪. আল কোর'আন: সুরা হুদ-২৯।

২. হুদ (আ.) এর ঘোষণা: হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট কোনো মজুরি চাই না। আমার পারিশ্রমিক তাঁরই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি তবুও বুদ্ধি (আক্‌ল) খাটাবে না?(১)

৩. নূহ (আ.) এর ঘোষণা: আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো কেবল বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে।(২)

৪. সালেহ (আ.) এর ঘোষণা: আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমার মজুরি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে।(৩)

৫. লুত (আ.) এর ঘোষণা: এর জন্য আমি কোনো মজুরি চাই না। আমার মজুরি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে।(৪)

৬. নূহ (আ.) এর ঘোষণা: যদি তোমরা আমার কথা না শোনো তাহলে জেনে রাখ, আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই নি। আমার প্রতিদান কেবল আল্লাহর নিকট এবং আমাকে মুসলিম (সত্যের প্রতি সমর্পিত) হওয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে।(৫)

৭. হুদ (আ.) এর ঘোষণা: আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোনো মজুরি চাচ্ছি না। আমার পারিশ্রমিক তাঁরই নিকট যিনি এই বিশ্বজাহানের স্রষ্টা।(৬)

৮. শোয়েব (আ.) এর ঘোষণা: আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো মূল্য চাই না। আমার মজুরি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে।(৭)

পাঠকবর্গকে অনুরোধ করব এই আয়াতগুলোর পূর্বাপর আয়াতগুলোও পবিত্র কোর'আন থেকে পড়ে নিতে, তাহলে দীনের এই চিরন্তন নীতি সম্পর্কে আল্লাহর যে নীতি তা আপনাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে ধরা দেবে। নবী-রসুলগণ আজীবন সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে গেছেন। তাদের বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে এমন, "তোমরা একমাত্র আল্লাহকে মান্য করো। আমার কথা শোনো। আমি তোমাদের জাগতিক ও পারলৌকিক শান্তির ব্যবস্থা নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদেরকে অশান্তি থেকে, জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করতে চাই। তোমরা ভাবছ আমার স্বার্থ কী? না, আমার এই চাওয়ার পেছনে কোনো স্বার্থ নেই। আমাকে কোনো

---

১. আল কোর'আন: সুরা হুদ-৫১।

২. আল কোর'আন: সুরা শু'আরা ১০৯।

৩. আল কোর'আন: সুরা শু'আরা ১৪৫।

৪. আল কোর'আন: সুরা শু'আরা-১৬৪।

৫. আল কোর'আন: সুরা ইউনুস ৭২।

৬. আল কোর'আন: সুরা শু'আরা ১২৭

৭. আল কোর'আন: সুরা শু'আরা-১৮০।

টাকা পয়সা তোমাদের দিতে হবে না। আমার এই কাজের বিনিময় আল্লাহর কাছ থেকে পাব।”

ধর্মের কোনো কাজ করে নবী ও রসুলরা যেমন পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না, তেমনি তাঁদের উম্মাহর জন্যও পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ নয়। তথাপি নবীদের বিদায়ের পরে জাতির মধ্যে অবধারিতভাবে জন্ম নিয়েছে দীনের পণ্ডিত, ধারক-বাহক, আলেম, পুরোহিত, যাজক নামধারী একটি অকর্মণ্য, কর্মবিমুখ, পরনির্ভরশীল শ্রেণি। বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষাভেদে তাদের বিভিন্ন উপাধি বা বিশেষণ ধরে ডাকা হয়ে থাকে। যাহোক, তারা নিজেদেরকে নবী-রসুলদের প্রতিনিধি, ওয়ারিশ বা স্থলাভিষিক্ত (ওরাসাতুল আম্বিয়া, Inheritors of the Prophets) বলে দাবি করতে থাকেন এবং জাতিও তাদের এই দাবি মেনে নেয়। কিন্তু এই তারা যে আম্বিয়ায়ে কেরামের, নবী-রসুলদের ওয়ারিশ বলে নিজেদের দাবি করে তাদেরই রেখে যাওয়া বিনিময় গ্রহণ না করে নিঃস্বার্থ ধর্মপ্রচার, প্রসার, ধর্মীয় কার্যাদি পরিচালনার নীতি নিজেদের বেলায় বহাল রাখলেন না। সেটাকে উল্টে দিয়ে নিজেরা ধর্মের লেবাস ধারণ করে স্বার্থহাসিলে তথা ধর্মব্যবসায় মত্ত হয়ে গেলেন যা আল্লাহ হারাম করেছেন।

আলেমরা নবীদের উত্তরসূরি, এটা আমাদের কথা নয়, স্বয়ং আল্লাহর রসুলের কথা। এর অর্থ হচ্ছে, নবীদের অবর্তমানে তারা মানুষের সামনে সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য তুলে ধরবেন। এটাই হচ্ছে আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার, এর দ্বারাই তারা তাদের জ্ঞানের হক আদায় করতে পারবেন। তারা জীবন গেলেও মিথ্যার সাথে আপস করতে পারবেন না, পার্থিব স্বার্থে সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশ্রিত করতে পারবেন না।

কিন্তু বাস্তবে পৃথিবী সর্বদাই অন্য চিত্র দেখতে পেয়েছে। **বাস্তব অবস্থা দেখলে বরং মনে হতে পারে যে, আল্লাহ-রসুলের নাম ভাঙিয়ে খাওয়ার জন্যই আলেম-ওলামা শ্রেণিটির জন্ম হয়েছে। তারা একটু সম্মানের জন্য, দুটো টাকার জন্য, উন্নত জীবনমানের জন্য ক্ষমতাবান দুর্বৃত্তের সাথে হাত মিলিয়ে তাদের সকল অন্যায়কে জায়েজ করে দিয়েছেন।** তারা সমাজনেতাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মৌন থেকেছেন, খুব হেকমতের সাথে সত্যের সাথে মিথ্যা মিশিয়ে স্বার্থ হাসিল করে গেছেন।

পূর্ববর্তী কেতাবধারী জাতিগুলোর সেই অপকর্মের ইতিহাস পবিত্র কোর’আনে আল্লাহ বারংবার উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ করার কারণ যেন রসুলাল্লাহর উম্মাহর আলেমরা পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট ধর্মব্যবসায়ী আলেমদের মতো না হন। পূর্বের প্রত্যেকটি ধর্মগ্রন্থের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল এর ধারকরা যেন মানুষকে পথ প্রদর্শনের বিনিময়ে পার্থিব স্বার্থ হাসিল না করেন। কারণ এর দরুন অর্থ প্রদানকারীর চাহিদামাফিক সত্য বিকৃত হয়ে যায়। যারা আল্লাহর কাছে করা এই অঙ্গীকারকে সামান্য মূল্যে অর্থাৎ নশ্বর পার্থিব মূল্যে বিক্রি করে দেয় তাদের প্রতি আল্লাহর হুঁশিয়ারি বার্তা অত্যন্ত কঠোর। আল্লাহ

বনী ইসরাইলকে বলেছিলেন, "আর তোমরা সে গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি সত্যবক্তা হিসেবে তোমাদের কাছে। তোমরা কেতাবের প্রাথমিক অস্বীকারকারী হয়ো না আর তুচ্ছমূল্যে আমার আয়াত বিক্রি করো না। এবং আমার (আযাব) থেকে বাঁচ। তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন করো না।"(১)

কিন্তু আল্লাহর এ হুকুমকে তারা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল এবং ধর্মকেই তাদের উপার্জনের মাধ্যম, স্বার্থসিদ্ধির উপকরণে পরিণত করেছিল। এর পরিণামে তারা আল্লাহর অভিশাপের বস্তুতে পরিণত হয়েছিল এবং শত শত বছর অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীগুলোর দ্বারা নির্যাতিত, নিপীড়িত হয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে করুণার পাত্র হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিল। এটা হচ্ছে পার্থিব শাস্তি। পরকালীন শাস্তি তো জমাই রয়েছে। এ কথাই আল্লাহ বলেছেন যে, "যাদের গ্রন্থ দেয়া হয়েছে, আল্লাহ যখন তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তোমরা নিশ্চয়ই এটা মানুষের মধ্যে প্রচার করবে এবং তা গোপন করবে না। কিন্তু তারা তা তাদের পেছনে নিক্ষেপ করল এবং খুব কম মূল্যে বিক্রয় করল, অতএব তারা যা কিনল তা নিকৃষ্টতর।"(২)

আল্লাহ সত্য, তথ্য গোপন করতে এতবার নিষেধ করেছেন, ধর্মের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করাকে এতগুলো আয়াতে জাহান্নামের কারণ বলে ঘোষণা দিয়েছেন, অথচ আমাদের সমাজের যারা ধর্মব্যবসায়ী আলেম রয়েছেন তারা এ সবগুলো আয়াতকেই গোপন করে তাদের হারাম উপার্জন চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা তাদের ওয়াজে, খোতবায় ভুলেও এগুলো উল্লেখ করেন না। দীনের বিনিময় সংক্রান্ত যে আয়াতগুলো উল্লেখ করলাম, এমন আরও বহু আছে, সেগুলোও তারা গোপন করেন। এই সত্যগোপন ও দীনের বিনিময় গ্রহণ প্রসঙ্গে আল্লাহর কথা হলো, "কেয়ামতের দিন তিনি তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না, পবিত্রও করবেন না। পরকালে তাদের কোনো অংশ নেই। তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।"(৩)

এমন কঠোর সাবধানবাণী আল্লাহ আর কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে উচ্চারণ করেছেন কি?

কেউ যদি তাদেরকে এই আয়াতগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তারা হাজারো অপব্যাখ্যা, মিথ্যা ফতোয়া হাজির করে নিজেদের এই অবৈধ ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তাদের এই সত্য গোপনের ফলে মুসলিম জাতি বহু আগেই পথ হারিয়ে ফেলেছে। এখন তারা বিগত চৌদ্দশ' বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ সঙ্কটে পড়েছে। তারা সর্বত্র মার খাচ্ছে, উদ্বাস্তু হচ্ছে, তাদের দেশগুলো ধ্বংস হচ্ছে। তাদের অপকর্মের পরিণতিতে গোটা জাতি পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং দুর্দশার শিকার হয়েছে।

---

১. আল কোর'আন: সুরা বাকারা ৪১, ৪২

২. আল কোর'আন: সুরা ইমরান ১৮৭

৩. আল কোর'আন: সুরা ইমরান ৭৭

ধর্মব্যবসার কুফল

যে কাজের পরিণামে একটি জাতি ধ্বংস হয়ে যায়, যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আল্লাহ একজন নবী প্রেরণ করেন সেই উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে যায়, একটি আসমানি কেতাবের কার্যকারিতা হারিয়ে যায়, মানুষ ধর্মের কাছে এসে সেখানে অধর্ম পেয়ে ধর্মকে, আল্লাহ ও নবী-রসুলগণকে ঘৃণা করতে শুরু করে সেই কাজ কতটুকু ক্ষতিকর কাজ- তা অনুধাবন করার জন্য মুসলিম নামক জাতির পচন-পতন ও চলমান দুর্দশাকে বিবেচনায় নেওয়াই যথেষ্ট। ধর্মব্যবসা হচ্ছে এই মাত্রার বিপর্যয় সংঘটনকারী, প্রাণঘাতী, জাতিবিধ্বংসী একটি অপকর্ম। এজন্যই আল্লাহ ধর্মব্যবসা সম্পর্কে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন এই বলে যে, ‘তোমরা কেতাবের প্রাথমিক অস্বীকারকারী হয়ো না আর তুচ্ছমূল্যে আমার আয়াত বিক্রি করো না। এবং আমার (আযাব) থেকে বাঁচ। তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।”⁽১⁾

যেহেতু মানবজাতির ইতিহাস ন্যায় ও অন্যায়ের, সত্য ও মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্দ্বের ইতিহাস, তাই কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা সেটা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত না করা গেলে একজন মানুষের পক্ষে সত্যের পক্ষ অবলম্বন করা সম্ভব হয় না। ধর্মব্যবসা কী করে? ধর্মব্যবসা সেই সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায়ের মানদণ্ডটাকে নষ্ট করে দেয়। হালালকে হারাম, হারামকে হালাল বানিয়ে দেয়। যার পরিণামে ঘোরতর অন্যায় কাজ ধর্মের মোড়কে মহাসমারোহে করা হতে থাকে। হারামকে হালাল বলা অথবা হালালকে হারাম বলা কুফরী। আল্লাহর রসুল বলেছেন, “যদি কেউ হারামকে হালাল বলে অথবা হালালকে হারাম বলে তবে সে কাফির হবে।”⁽২⁾ উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ ধর্মব্যবসাকে হারাম করেছেন আর ধর্মব্যবসায়ীরা একে হালাল বানিয়ে ফেলেছেন।

হানাফি মাজহাবের মুজতাহিদ আল্লামা ফকিহ্ আবুল লায়ছ সমরকন্দি (র.) (৩৭৩ হিজরি) লিখেছেন, “যখন আলেমগণ হারাম ভক্ষণকারীতে পরিণত হবে তখন

---

১. আল কোর’আন: সুরা বাকারা ৪১, ৪২।

২. শরহে আকাইদে নফসি, ফিকহে আকবার, আকাইদে হাক্কা।

সাধারণ মানুষেরা কাফেরে পরিণত হবে।”(১) কারণ সাধারণ মানুষ মনে করবে আলেম সাহেব হালাল বলেই তো এটা করছে। তখন তারা ঐ হারামটাকে হালাল মনে করার কারণে কাফের হবে।

মানুষও ধর্মব্যবসায়ীদের মুখের কথায় বিশ্বাস করে আল্লাহ ও রসুলের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজকে অতি সওয়াবের কাজ মনে করে পালন করে যেতে থাকে। একটি উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, সঠিক বানানের মানদণ্ড হচ্ছে অভিধান। যদি কোনোভাবে অভিধানে ভুল বানান ঢুকে যায় তখন মানুষ কী করে সঠিক বানানটি জানতে পারবে? একটি মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ধর্মের প্রকৃত ভারসাম্যযুক্ত শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করা। ‘এই প্রকৃত ভারসাম্যযুক্ত শিক্ষাটিকে’ ধ্বংস করে দেয় ধর্মব্যবসা। তাই শান্তির কোনো পথই আর অবশিষ্ট থাকে না। বহুমুখী বাতাস এসে একটি জাহাজের দিক পাল্টে দিতে পারে। কিন্তু কম্পাস যদি ঠিক থাকে আবার সে একসময় ঠিকই তার বন্দরে ফিরতে পারবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ কম্পাসটিই নষ্ট করে দেয় সে যাত্রীদের গন্তব্যে যাওয়ার সকল আশাই ধ্বংস করে দেয়, যা কিনা ঝড়ের পরেও অবশিষ্ট ছিল।

এভাবেই **শান্তির একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা। যদি ধর্মব্যবসায়ীরা নিজেদের তৈরি করা, নিজেদের মগজপ্রসূত বিধি-বিধানকে আল্লাহর হুকুম বলে চালিয়ে দেয় এবং সেটাই মানুষকে মানতে বাধ্য করে, তাহলে কি মানবসমাজে আদৌ শান্তি আসবে? আসবে না। কিন্তু মানুষ মনে করবে যে তারা আল্লাহর হুকুমেরই আনুগত্য করল কিন্তু শান্তি আসলো না। ফলে আল্লাহর হুকুমের প্রতিই মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলবে। এই যে আল্লাহর উপর থেকে, আল্লাহর হুকুমের উপর থেকে মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস হারানো, এর চেয়ে ধর্মের বড় ক্ষতি আছে? নেই। ধর্মব্যবসায়ীরা এই ক্ষতিটাই করে। তারা নিজেদের মনগড়া কথাকে আল্লাহর কথা, শরিয়তের কথা বলে চালিয়ে দেয়।** এদেরকেই আল্লাহ বলেছেন অপদার্থ উত্তরসূরি।(২)

আল্লাহ যাদেরকে কেতাবের জ্ঞান দান করেছেন তারা আল্লাহর বিশেষ নেয়ামতপ্রাপ্ত। তারা যখন সেই জ্ঞানকে পুঁজি করে ব্যবসা করতে শুরু করে, তখন তারাই আল্লাহর ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়। আল্লাহ তাদের অবস্থা বোঝাতে কুকুরের উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, “তাদের উদ্দেশ্যে সেই ব্যক্তির কাহিনী বর্ণনা করুন যাকে আমি আমার আয়াত শিক্ষা দিয়েছিলাম কিন্তু সে তা হতে সরে আসল এবং শয়তানের অনুসরণ করল ফলে পথভ্রষ্ট হল। আমি চাইলে তাকে তার এলেমের কারণে সম্মানিত করতে পারতাম কিন্তু সে দুনিয়ার জীবনের দিকেই ঝুঁকে গেল আর তার মনের ইচ্ছাকে অনুসরণ করল। অতএব সে কুকুরের মতো,

---

১. তাম্বিহুল গাফিলিন

২. আল কোর’আন: সুরা মারইয়াম ৫৯।

তুমি তার উপর বোঝা চাপাও বা ছেড়ে দাও সর্বদা সে হাঁপাতে থাকে। যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের উদাহরণ খুবই নিকৃষ্ট। অতএব আপনি এসব কাহিনী বর্ণনা করুন হয়ত তারা চিন্তা করবে।”(১)

প্রকৃতপক্ষে সত্য গোপন ও দীন বিক্রিই আলেমদেরকে নিকৃষ্ট করে। আহলে কেতাব ও মোশরেকদের মধ্যে যারা কাফের (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী) তাদের বেলায় আল্লাহ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন “উলাইকাহুম শাররুল বারিয়্যাহ” অর্থাৎ তারাই সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম।(২) এই একই পরিভাষা আল্লাহর রসুল ব্যবহার করেছেন আখেরি যুগের আলেমদের ক্ষেত্রে। তিনি বলেন, “ওলামাউহুম শাররুন মান তাহতা আদীহিম সামায়ী অর্থাৎ ওলামাগণ হবে আসমানের নিচে সর্বনিকৃষ্ট জীব”।(৩)

যারা কুফরি ও শেরক করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ যে শব্দটি ব্যবহার করলেন সেই শব্দটি রসুলাল্লাহ আলেমদের বেলায় ব্যবহার করলেন, কত মারাত্মক বিষয়। প্রশ্ন হচ্ছে কেন তারা এত নিকৃষ্ট? এই আলেম কোন আলেম?

এই আলেম হচ্ছে তারা যারা মানবসমাজে ফেতনার (দাঙ্গা) সৃষ্টি করেন যে ফেতনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সকল নবী-রসুল এসেছেন, যে ফেতনাকে আল্লাহ হত্যার চেয়ে জঘন্য বলে আখ্যায়িত করেছেন,(৪) যে ফেতনাকে নির্মূল করতেই আল্লাহ তাদের মাধ্যমে যুগে যুগে সত্যদীন বা জীবনব্যবস্থা পাঠিয়েছেন। যে আলেমরা এই জীবনব্যবস্থাকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় তারাই সমাজে ফেতনার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকারী, যাবতীয় অশান্তির মূল গোড়া তারা। সত্য গোপন করাই হচ্ছে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা, সত্যই হচ্ছে শান্তির উৎস। এক শ্রেণির আলেম মানুষকে সত্য জানতে দিচ্ছেন না, কুফর করছেন, ঢেকে রাখছেন। যার ফলশ্রুতিতে মিথ্যা সংসারকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। আর মিথ্যার পরিণাম হচ্ছে ফেতনা তথা শোষণ, রক্তপাত, অবিচার ও দাঙ্গা হাঙ্গামা।

আলেম সাহেবরা কী গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি গোপন করেছেন? সেটা হচ্ছে তারা ইসলামের দৃষ্টিতে মো’মেন ও কাফের কাকে বলে সেটাই গোপন করেছেন এবং আল্লাহর দেওয়া সংজ্ঞার পরিবর্তে ভিন্ন সংজ্ঞা উদ্ভব করে জাতিকে পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছেন। আল্লাহ পবিত্র কোর’আনে বলেছেন, যারা আল্লাহর হুকুম দিয়ে হুকুম (শাসন, বিচার-ফায়সালা) করে না তারা কাফের, জালেম, ফাসেক।(৫)

---

১. আল কোর’আন: সুরা আরাফ ১৭৫।

২. আল কোর’আন: সুরা বাইয়্যেনাহ ৬।

৩. হাদিস: আলী (রা.) থেকে বায়হাকী, মেশকাত।

৪. আল কোর’আন: সুরা বাকারা ১৯১।

৫. আল কোর’আন: সুরা মায়েদা ৪৪, ৪৫, ৪৭।

জাতীয় জীবনে আল্লাহর বিধানকে জাতিগতভাবে প্রত্যাখ্যান করে দাজ্জাল অর্থাৎ পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতার তৈরি করা বিধানকে গ্রহণ করে নিয়ে, আল্লাহর পরিবর্তে মানুষকে ইলাহ'র (হুকুমদাতা) আসন প্রদান করে মুসলিম দাবিদার জনগোষ্ঠী যে আসলে মো'মেন নেই, আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা কাফেরে পরিণত হয়েছে এই সত্যটি আলেম সাহেবরা মানুষকে বুঝতে দেন না, পার্থিব স্বার্থে গোপন রাখেন।

ফলে মানুষ বাস্তবে কাফের হয়েও নিজেদেরকে মো'মেনই মনে করতে থাকে এবং জান্নাতের আশায় আমল করে যায়। তারা এটাও বলেন না যে, আল্লাহ বলেছেন, মো'মেন হচ্ছে তারাই যারা আল্লাহ ও রসুলের উপর ঈমান আনে (তওহীদ), তাতে কোনো সন্দেহ করে না এবং জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে আল্লাহর রাস্তায় (মানবতার মুক্তির জন্য) সংগ্রাম করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।[১]

এই আলেমগণ সর্বনিকৃষ্ট জীব কারণ তারা ধর্মের 'ধ্বজাধারী' হয়েও মানুষকে সত্য মিথ্যার জ্ঞান দিচ্ছে না। তারা অমূল্য জ্ঞান বহন করে চলেছেন কিন্তু সেটা না সত্যিকার অর্থে তাদের কাজে আসছে, না মানবজাতির কোনো উপকারে আসছে। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেন, "তাদের দৃষ্টান্ত হলো পুস্তক বহনকারী গাধার মতো! কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে!"[২] মুসলিম দাবিদার এই জনগোষ্ঠী যে মো'মেন না, তারা যে উম্মতে মোহাম্মদী না, তারা যে জান্নাতের পথ সেরাতুল মোস্তাকীম থেকে সরে গেছে এটা বুঝতে দিচ্ছে না। **তারা বলছেন, "নেক আমল করো। আমাদেরকে টাকা দাও, আমি তোমাদের মিলাদ পড়িয়ে দেব, নামাজ পড়িয়ে দেব, জানাজা পড়িয়ে দেব, কোর'আন খতম দিয়ে দেব, ওয়াজ শোনাবো। এগুলোই নেক আমল, এগুলোই তোমাদের জান্নাতে নিয়ে যাবে।"** যারা নেক আমল করবে তাদেরকে আগে মো'মেন হতে হবে আর এই জাতি তো মো'মেনই নয়, সুতরাং মো'মেন না হওয়া পর্যন্ত কোনো আমল দিয়েই তারা জান্নাতে যেতে পারবে না এই কথাটি তাদেরকে জানতে দিচ্ছে না। এই প্রতারণার ফলে মানুষের দুনিয়ার জীবন যেমন অশান্তিময় হয়ে গেছে, তেমনি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাদের আখেরাত।

পূর্ববর্তী ধর্মের অনুসারী সম্প্রদায়গুলোর মতো বর্তমানের বিকৃত ইসলামের ধর্মব্যবসায়ীরাও এর ব্যতিক্রম নন। তারা এমন আকর্ষণীয় সুরে বয়ান করে থাকেন যে তারা যা বলেন তাকেই সত্য কথা, কোর'আন হাদিসের কথা মনে করে বিশ্বাস করে নিতে মানুষ বাধ্য হয়। ধর্মব্যবসায়ীদের এই চিরন্তন বৈশিষ্ট্যের কথাই আল্লাহ কোর'আনে আমাদেরকে সতর্কবার্তারূপে জানিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলেন, **"তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তারা কেতাব থেকেই পাঠ করছে।** অথচ তারা

---

১. আল কোর'আন: সুরা হুজুরাত ১৫।

২. আল কোর'আন, সুরা জুম'আ: ৫

যা তেলাওয়াত করছে তা আদৌ কেতাব নয়। এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, এটি আল্লাহর কথা অথচ এসব আল্লাহর কথা নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহরই প্রতি মিথ্যারোপ করে।"(১)

আমাদের সমাজের ধর্মজীবীরাও ঠিক এভাবেই 'মুখ বাঁকিয়ে' কেতাব পাঠ করেন, যেন সবাই বিশ্বাস করে যে তারা বুঝি আল্লাহ-রসুলের কথাই বলছেন। কিন্তু আদৌ তা নয়। তারা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী একটি ইসলামকে যা তাদের পূর্বসূরীগণ বিকৃত করেছে সেগুলোকে অভিনব মুখভঙ্গি ও সুর সহযোগে আল্লাহর নামে চালিয়ে দেন। এমন পরিষ্কারভাবে আল্লাহ এই ধর্মজীবী ওয়াজকারী আলেমদের মুখোশ উন্মোচিত করে দেওয়ার পর আর কী বলার বাকি থাকে?

নবী-রসুলদের দায়িত্ব ছিল মানুষের সামনে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা আলাদা করে দেওয়া। এরপর ন্যায়পথে যারা চলতে চায় তাদেরকে নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। স্বভাবতই সেই নবীর প্রতি ঈমান আনয়নের পর প্রতিটি মো'মেনের উপরও এই একই ঐশী দায়িত্ব অর্পিত হয়। সেই মো'মেনদের দায়িত্ব কী, তারা কেন শ্রেষ্ঠ জাতি সেটা আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানবজাতির মধ্য থেকে তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে এই জন্য যে তোমরা মানুষকে ন্যায়কাজের আদেশ করবে, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখবে।"(২)

কিন্তু যে সকল কথিত আলেম-ওলামারা ধর্মব্যবসা করেন তাদের পক্ষে এইভাবে সত্য ও মিথ্যাকে আলাদা করে দেওয়া এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব হয় কি? কস্মিনকালেও না। এর কারণ তারা একটি শ্রেণির কাছে আত্মবিক্রয় করেছেন। এটা চিরকাল হয়ে এসেছে যে, কোনো শাসক যখন অন্যায় করেন তখন সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্যায়ের সমর্থনে বা নিজ দায়মুক্তির জন্য আইনও তৈরি করেন। সেই আইন তৈরি করে দেন আইন পরিষদের সদস্যরা, এর পক্ষে বিপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন বুদ্ধিজীবীরা। পূর্বকালে যখন ধর্মের আইন দিয়ে রাষ্ট্র চলত তখন শাসকের অন্যায়কে সমর্থন যোগাতে ধর্মের বিধানের মধ্যেও যোগ-বিয়োগ করা হয়েছে। সেটা করেছেন তখনকার ধর্মবেত্তাগণ তথা আলেমগণ। তাদের তৈরি করা শরিয়তকেই স্রষ্টার বিধান বলে কার্যকর করা হয়েছে। **আজকে আমরা ইসলামের যে রূপটি দেখি সেটার খুব সামান্যই স্রষ্টার নাজিল করা। বাকিটা ধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রণীত।** সুলতান, বাদশাহদের পাপ কাজকে কোর'আন সুন্নাহর মাপকাঠিতে বৈধতা দিতে তারা ভাড়াটিয়া আলেমদের ব্যবহার করেছেন যারা পদ ও সম্পদের লোভে জনগণকে ইসলাম সম্পর্কে ভুল শিখিয়েছে। আজও এই

---

১. আল কোর'আন: সুরা ইমরান ৭৮।

২. আল কোর'আন: সুরা ইমরান ১১০।

শ্রেণিটি আমাদের সমাজে রয়েছে যারা রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের প্রয়োজনমাফিক ফতোয়া ও ব্যাখ্যা প্রদান করতে অত্যন্ত পটু।

ধর্মব্যবসার একটি অতি প্রচলিত রূপ হচ্ছে মসজিদগুলোতে নামাজের ইমামতির চাকরি করা। বর্তমানে এটাই সর্বজনবিদিত রেওয়াজে (Tradition) পরিণত হয়েছে যে সমাজে যারা বিত্তবান, প্রভাবশালী (যাদের বিরাট একটি সংখ্যা দুর্নীতিগ্রস্ত) তাদেরকে মসজিদ কমিটির পরিচালক বা সদস্য করা হয়। তাদের আয়ের উৎস কী সেটা নিয়ে কেউ আর প্রশ্ন তোলে না, তাদের অর্থ আছে, প্রভাব আছে এটাই যোগ্যতার মানদণ্ড। এর উদ্দেশ্য যে প্রধানত অর্থনৈতিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মসজিদের ইমামগণ এই কমিটির অধীনে চাকরি করেন। তাদের চৌহদ্দি মসজিদের চার দেওয়াল। কেউ মারা গেলে, দোকান উদ্বোধন, মুসলমানি, বিয়ে পড়ানোর জন্য, গরু বকরি জবাই করতে তাদের ডাক পড়ে। জীবনের বাস্তব অঙ্গনে তাদের কোনো অংশগ্রহণের সুযোগই নেই।

এবার দেখুন ইমামতির হালঃ

খ্রিষ্টানদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও জীবনব্যবস্থার ফলে আমাদের সমাজেও দুই ধরনের নেতা সৃষ্টি হয়েছে - ধর্মীয় নেতা এবং অধর্মীয় নেতা। **আজ মসজিদে যে নামাজ হয় তাতে অর্ধশিক্ষিত কয়েক হাজার টাকার বেতনভোগী 'ধর্মীয়' ইমাম সাহেবের পেছনে তার তকবিরের (আদেশের) শব্দে ওঠ-বস করেন সমাজের 'অধর্মীয়' অর্থাৎ রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতারা। নামাজ শেষ হলেই কিন্তু ঐ 'অধর্মীয় নেতারা' আর 'ধর্মীয় নেতা'র দিকে চেয়েও দেখেন না।** কারণ তারা জানেন যে ঐ 'ধর্মীয়' নেতার দাম কয়েক হাজার টাকা বেতনের বেশি কিছুই নয়, জাতীয় জীবনে তার কোনো দাম নেই, প্রভাব নেই, কর্তৃত্ব নেই। ঐ 'ধর্মীয় নেতারা' অর্থাৎ ইমামরা যদি 'অধর্মীয় নেতাদের' সামনে কোনো ধৃষ্টতা-বেয়াদবি করেন বা কোনো একটি আদেশের অবাধ্যতা করেন তবে তখনই তাদের নেতৃত্ব অর্থাৎ মসজিদের ইমামতির কাজ শেষ। এমন কি কোনো কোনো জায়গায় ইমাম সাহেবদের চরম লাঞ্ছনা, অপমানও করা হয় যা হয়তো গণমাধ্যমে আসে না।

আমরা এই যে কথাগুলো বলছি এগুলো আমাদের সমাজে চলমান বাস্তবতা, একটি শব্দও হাওয়ার উপর বলছি না। এরকম শত শত ঘটনা দেশজুড়ে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে যার একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দিচ্ছি যা অনেকগুলো গণমাধ্যমেও এসেছে। ঘটনাটি ঘটেছে সিরাজগঞ্জের একটি গ্রামে। সেখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন একটি ভবন উদ্বোধন করছিলেন একজন স্থানীয় সংসদ সদস্য। শুধুমাত্র (!) মোনাজাত করার জন্য ডাক পড়েছে স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেবের (!)। কিন্তু বিধি বাম। ইমাম সাহেব দোয়ার মধ্যে মাননীয় সাংসদের নেত্রীর নাম না বলে ভুল করে প্রতিপক্ষ দলের নেত্রীর নামে দোয়া করে ফেলেন। আর যায়

কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিয়ে দোয়া থামিয়ে দেওয়া হলো এবং গালিগালাজও করা হলো। এটুকু করেই সাংসদ সন্তুষ্ট হলেন না, তিনি পুলিশ ডেকে তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন। পুলিশ থানায় নিয়ে তাকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পান ওই ইমাম। (১)

এই হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া সত্যদীনকে বিক্রি করে অন্যের করুণার পাত্রে পরিণত করায় আল্লাহপ্রদত্ত শাস্তি। পশ্চিমা খ্রিষ্টান প্রভুদের অন্ধ অনুকরণ ও আনুগত্য করতে করতে এ জাতি এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে যে, ঐ খ্রিষ্টানদের পাদ্রীদেরও তাদের জাতির উপর যেটুকু সম্মান ও প্রভাব আছে, এই 'ইমাম' সাহেবদের তাও নেই। কমিটির লোকেরা যত বড় অন্যায়ই করুক, সুদখোর হোক, মাদকব্যবসা করুক, ঘুষখোর হোক, ধান্ধাবাজির রাজনীতি করুক সেগুলোর শক্ত প্রতিবাদ ইমাম সাহেবরা করতে পারেন না।

এ তো গেল ব্যক্তিস্বার্থে ধর্ম বিক্রি। এভাবে বহুরকম স্বার্থে যখন ন্যায়ের কণ্ঠস্বর মৌন হয়ে যায়, তখন 'ধর্ম' পরাজিত হয়ে যায়। আর ধর্মের মিম্বরে দাঁড়িয়ে যখন অধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলা হয় না, তখন সমাজ থেকে ধর্ম বিদায় নিতে সময় লাগে না। অথচ মানুষের মর্জিমত না চলে আল্লাহর আয়াত দ্বারা যাবতীয় অন্যায়কে প্রতিহত করাকেই আল্লাহ জেহাদে আকবর, বড় জেহাদ বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের (কাফের) আনুগত্য করো না এবং এর (আল্লাহর কেতাব) দ্বারা শ্রেষ্ঠ জেহাদ (জেহাদে আকবর) করো।"(২) তিনি আরেকটি আয়াতে বলেছেন, "আমরা সত্য দ্বারা মিথ্যাকে আঘাত করি, অতঃপর তা মিথ্যার মস্তক চূর্ণ করে দেয়। মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।"(৩) সত্য আসে মিথ্যাকে দূর করার জন্যই। এজন্যই আল্লাহ আরো বলেছেন, সত্য যখন আসে তখন মিথ্যাকে বিতাড়িত হতেই হয়। মিথ্যা তো বিতাড়িত হওয়ারই বিষয়।(৪) কাজেই ধর্মের মিম্বরে দাঁড়িয়ে সত্য দ্বারা মিথ্যাকে আঘাত করতে না পারলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ অবস্থান নিতে না পারলে ঐ মিম্বরে দাঁড়ানোই নিরর্থক। এজন্যই আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন, "সর্বোত্তম জেহাদ হচ্ছে অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা।"(৫)

যখন অন্যায়ের প্রতিবাদ অর্থাৎ আদর্শিক লড়াই করার হিম্মত, সাহস ও যোগ্যতা জাতির মধ্যে থেকে লুপ্ত হয়ে গেল, তখন ভারসাম্যহীন সুফিবাদীরা বিকল্প হিসাবে নফসের বিরুদ্ধে জেহাদকে আবিষ্কার করলেন। আজকে জেহাদে আকবর বলতেই

---

১. ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, দৈনিক মানবজমিন, বাংলাদেশ প্রতিদিন, এনটিভি অনলাইন।

২. আল কোর'আন: সুরা ফোরকান ৫২।

৩. সূরা আম্বিয়াঃ ১৮

৪. আল কোর'আন, সুরা বনী ইসরাইল ৮১

৫. হাদিস: তিরমীজি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ, দারেমি

বোঝানো হয় নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ। এ জেহাদের আবিষ্কর্তারা তাদের বক্তব্যের সমর্থনে মাত্র তিনটি হাদিসের উল্লেখ করতে পেরেছেন। এগুলোর একটি বর্ণনা করেছেন ইবনে নাজ্জার, একটি দায়লামি ও তৃতীয়টি খতিব। সমস্ত মুহাদ্দিসগণ এক বাক্যে ঐ তিনটি হাদিসকে দুর্বল অর্থাৎ দয়ীফ বলে রায় দিয়েছেন। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানীর মতো বিখ্যাত মুহাদ্দীস ঐ হাদিসগুলোকে হাদিস বলেই স্বীকার করেন নি। বলেছেন নফসের সঙ্গে যুদ্ধ জেহাদে আকবর, এটা হাদিসই নয়। এটি একটি আরবি প্রবাদবাক্য মাত্র।(১) **গত কয়েক শতাব্দী ধরে আল্লাহর ঘোষণার বিপরীত এই 'জেহাদে আকবর' চালু করার ফল এই হয়েছে যে, সমগ্র জাতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রামের চরিত্র হারিয়ে নির্জীব, নির্বীর্য্য, নিষ্প্রাণ হয়েছে।** সেজন্য তাদের আবিষ্কৃত আত্মার বিরুদ্ধে জেহাদও দুনিয়া জোড়া তাদের মার খাওয়া ঠেকাতে পারল না, গোলাম হওয়া ঠেকাতে পারল না এমন কি চারিত্রিক অবক্ষয় থেকে সৃষ্ট সামাজিক অপরাধও দূর করতে পারল না।

যাহোক, যে বিষয়ে বলছিলাম। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ধর্মের বিবিধ কাজ করে বিনিময় গ্রহণকারীরা যে কারণে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারেন না, বরং অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন তার মূল কারণ কী? সেটা হচ্ছে অপরের কৃপার মুখাপেক্ষী থাকার দরুন তাদের তাদের নৈতিক মেরুদণ্ড ধ্বংস হয়ে যায়। দাতার শির সর্বদা উঁচু থাকে আর গ্রহীতার শির থাকে নিচু। যাদের বেতনে, অনুকম্পায়, দানে-দক্ষিণায় তাদের সংসার চলে, তাদের দ্বারা সংঘটিত কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করা এই শ্রেণিটির পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই প্রাকৃতিক নিয়ম হচ্ছে, কাউকে সত্যের উপর দণ্ডায়মান থাকতে হলে কোনভাবেই নিজেকে অন্যের দানের উপর নির্ভরশীল হওয়া যাবে না। দানে-দক্ষিণার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি কার্যত দাতার গোলামে পরিণত হয়, নেতা হতে পারে না। আর মসজিদ কমিটির দুর্নীতিগ্রস্ত সদস্যদের অনেকে এমনিতেই সামাজিক নীতি নৈতিকতার ধার ধারেন না, সামাজিক ক্ষমতা বা রাজনৈতিক শক্তির দাপটে ধরাকে সরা জ্ঞান করেন, এর উপরে যখন ধর্মনেতাদেরকেও তারা টাকা দিয়ে কিনে ফেলেন তখন তারা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতেও তারা কুণ্ঠিত হন না। এজন্য যখন কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে, কোনো ধর্মোন্মাদনা সৃষ্টির ঘটনা ঘটে তখন এই লোকগুলো সেটাকে ব্যবহার করে অন্যের বাড়িঘর, জমিজমা দখল করে নেন, যথাসম্ভব সর্ব উপায়ে স্বার্থ হাসিল করেন। ধর্মব্যবসা টিকে থাকার দরুনই এই অন্যায় অবস্থাগুলো সমাজে সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থাকে। কাজেই ধর্মের বিনিময়ে কোনোরূপ স্বার্থোদ্ধারের বিষয়ে ইসলাম এত কঠোর। যখন থেকে আল্লাহর এই হুকুম অমান্য করে নানা অসিলা দিয়ে দীনের বিনিময় নেওয়াকে বৈধ করা হলো তখন থেকে এ জাতির আলেমদের যে অংশটি বিনিময়

---

১. তাশদীদ উল কাভেস- হাফেজ ইবনে হাজার।

নিতে শুরু করল তারা আর ন্যায়ের উপর দণ্ডায়মান থাকতে পারলেন না। কিন্তু এ অবস্থা আল্লাহ-রসুলের কাম্য হতে পারে না। বরং যারাই আল্লাহর দীনের এলেম অর্জন করেছেন, আমাদের কাম্য আমাদের ইমাম সাহেবরা যেন প্রকৃতপক্ষেই ইমাম (নেতা, Leader) হন, সমাজে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হোক, তাদের মেরুদণ্ড সোজা হোক, শির উন্নত হোক, সমাজ তাদের আনুগত্য করুক। পরাশ্রয়ী মর্যাদাহীন জীবন থাকার চেয়ে জীবন না থাকা ভালো। এই উন্নত জীবন লাভ করার একটাই শর্ত, তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সত্যের উপর দণ্ডায়মান হতে হবে। আর এর পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হচ্ছে তাদের ধর্মব্যবসা।

অন্যায়কারী ও অন্যায় সহ্যকারী উভয়ই সমান অপরাধী। ধর্মব্যবসা জাতিকে কাপুরুষের মতো মুখ বুজে অন্যায় সহ্য করার শিক্ষা প্রদান করে। যারা সমাজের অন্যায়, অবিচার দেখেও তা বন্ধ করার লক্ষ্যে সংগ্রাম পরিচালনা না করে মৌন থাকে, সে আস্তিক বা নাস্তিক, আলেম বা মূর্খ, মুত্তাকী বা বেপরোয়া, নামাজী বা বে-নামাজী যা-ই হোক না কেন, সে আল্লাহর দৃষ্টিতে মুজরিম (অপরাধী, Criminal)। হাশরের দিন আল্লাহ বলবেন, "হে অপরাধীরা! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও"(১) তখন এই সর্বগোষ্ঠীর মানুষই অপরাধীদের কাতারে একীভূত হবেন। আল্লাহ মো'মেনদের রিপুজনিত দোষ- ত্রুটি গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অসংখ্যবার। এই মো'মেন হচ্ছে তারা, যারা সমাজে অন্যায় হতে দেন না, অন্যায় প্রতিরোধ করেন, আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা (জেহাদ) করেন।

মুসলমান সমাজের পরহেজগার ব্যক্তিরা নামাজ, রোজা, হজ্ব ইত্যাদির দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় করে পরকালে মুক্তি পেতে চান, কেননা এগুলোকেই তারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল মনে করেন। কিন্তু অন্যায়পূর্ণ সমাজকে বদলে দেওয়ার জেহাদ, অন্যায়কে প্রতিহত করার সংগ্রাম যে ওগুলোর চেয়ে কত গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা কয়জনে বোঝেন, কয়জনে জানেন? তাদের না জানার মূল কারণ তাদেরকে এটা জানতে দেওয়া হয় নি। ইসলামে গুরুত্বের অগ্রাধিকার (Priorities) সম্পর্কে এই অজ্ঞতা তাদের কাজেই প্রমাণিত। তাই সুদখোর কোনো মহাজন বা কোনো রাজনীতিক দলের সন্ত্রাসীও হয়ে ওঠে মসজিদ কমিটির পরিচালক। অনাহারী, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের আর্ত চিৎকারে বাতাস ভারি হয়ে উঠলেও কথিত ধার্মিকেরা মাথা নিচু করে, চেক রুমাল কাঁধে ঝুলিয়ে, টাখনুর উপরে পায়জামা তুলে পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে ছোটেন, রোজা রাখেন, হজ্ব করেন। কারণ আমাদের ধর্মনেতারা এহেন সওয়াব গণনার শিক্ষাই তাদেরকে দিয়ে থাকেন, এমন সমাজবিমুখ ধর্মশিক্ষাই বিদ্যালয়ে, মক্তব-মাদ্রাসায় দেওয়া হয়। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ বলেছেন, **"আমি কি তোমাদের এমন লোকদের কথা বলব, যারা আমলের**

---

১. আল কোর'আন: সুরা ইয়াসিন ৫৯।

দিক থেকে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত? (এরা হচ্ছে) সেসব লোক যাদের সকল প্রচেষ্টা এ দুনিয়ায় বিনষ্ট হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে মনে ভাবছে, তারা (বুঝি) ভালো কাজই করে যাচ্ছে।"(১)

"যেদিন তারা মালায়েকদেরকে দেখবে, সেদিন অপরাধীদের (মুজরিম) জন্য কোনো সুসংবাদ থাকবে না এবং মালায়েকরা বলবে, (জান্নাত তোমাদের জন্য) হারাম ও নিষিদ্ধ। আমি তাদের আমলসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করে দেব।"(২)

আদ-সামুদ ইত্যাদি জাতিগুলোকে আল্লাহ যখন ধ্বংস করলেন তখন তাদের মধ্যে কি পরহেজগার লোক ছিলেন না? অবশ্যই ছিলেন। কিন্তু তাদের পরহেজগারির তোয়াক্কা আল্লাহ করেন নি। কারণ সেই পরহেজগার লোকগুলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেয় নি। আল্লাহ বলেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মধ্যে এমন সৎকর্মশীল কেন রইল না, যারা পৃথিবীতে অরাজক পরিস্থিতি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বাধা দিত; তবে মুষ্টিমেয় লোক ছিল যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছি। আর পাপিষ্ঠরা তো ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল যার সামগ্রী তাদেরকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছিল। আসলে তারা ছিল মহা অপরাধী।"(৩)

এ আয়াতের শেষ শব্দটিও মুজরেম অর্থাৎ অপরাধী। কারা সেই অপরাধী তা তো আয়াতেই পরিষ্কার। আর বোঝাই যাচ্ছে, আল্লাহ সেই মুষ্টিমেয় লোকদেরকেই রক্ষা করেছেন এবং করবেন যারা সমাজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত অর্থাৎ মো'মেন।

আজ বাংলাদেশসহ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যে দেশগুলো এখনও সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় নি সেসব দেশের অধিকাংশ নাগরিকই যার যার সাধ্যমত ভোগবিলাসে মেতে থেকে জীবন উপভোগের চেষ্টা করে যাচ্ছে। সমাজ পরিবর্তনের জন্য, অনিবার্য বিপর্যয় থেকে নিজেদের দেশ ও জাতিকে বাঁচানোর জন্য তাদের কার্যকর কোনো ভূমিকাই নেই। আর যারা নিজেদেরকে আলেম বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন তারা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে মৌন, কেবল দোয়া মেঙ্গেই দায় সারতে চান, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করতে চান না। সামাজিক কর্মকাণ্ড, সমাজ পরিবর্তন ইত্যাদি কাজকে তারা দুনিয়াবী কাজ বলে ঘোষণা দিয়ে, সমাজকে দুর্বৃত্তের হাতে ছেড়ে দিয়ে গা বাঁচিয়ে চলেন। মসজিদে পর্যন্ত নোটিশ টানিয়ে দেন - "মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা হারাম।" এমন হাদিসও তারা উদ্ভাবন করেছেন যে, মসজিদে দুনিয়াবি কথা বললে নাকি ৪০ বছরের

---

১. আল কোর'আন: সুরা কাহাফ: ১০৩-১০৪।

২. আল কোর'আন: সুরা ফোরকান ২৩।

৩. আল কোর'আন: সুরা হুদ ১১৬

আমল বরবাদ হয়ে যাবে। যেখানে নবী এবং সত্যনিষ্ঠ খলিফাগণ এই মসজিদে বসেই দুনিয়ার বিরাট ভূখণ্ড শাসন করে গেছেন সেখানে তারা কী করে এমন ধ্বংসাত্মক দুনিয়াবিমুখ ফতোয়া জারি করে দিলেন তা ভাবতেও অবাক লাগে। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস এই যে, তারা যতই উটপাখির মতো আত্মপ্রতারণা করে দুনিয়াবি সবকিছু এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন না কেন, প্রলয় এড়াতে পারবেন না, দুর্বৃত্ত রাজনীতিকরা, জঙ্গিবাদীরা, সাম্রাজ্যবাদীরা প্রলয় ঘটিয়ে ছাড়বে। **সেই প্রলয় থেকে অতি পরহেজগার ও বুজুর্গ ব্যক্তিও বাঁচতে পারবেন না। ইরাক সিরিয়া আফগানিস্তানের অতি পরহেজগার বুজুর্গরাও রেহাই পায় নি। কারণ এটা প্রাকৃতিক বিধান যা এই জাতির তকদিরে পূর্বেও ঘটেছে।** উদাহরণ- এক সময়ের বোখারা, সমরকন্দ, বাগদাদ, কর্ডোভা, আলেকজান্দ্রিয়া ইত্যাদি অঞ্চলগুলো ছিল ইসলামের বিদ্যাপীঠ, পণ্ডিত, আলেম, বুজুর্গদের স্বর্গভূমি। আর আজ সেখানে মৃত্যুপুরি, ধর্মহীনতা, ধর্মবিদ্বেষ আর নাস্তিক্যের চারণভূমি। যারা এই বিধান বুঝতে অক্ষম, তাদের রসুলাল্লাহর (সা.) স্মরণ করা উচিত। তিনি বলে গেছেন, "কোনো সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কিছু লোক যদি অন্যায় কাজ সংঘটিত করে এবং সেটা পরিবর্তন করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যরা যদি সেটা না করে তাহলে আল্লাহ তাদের সবার উপরে আযাব নাযিল করেন।"(১)

এই সমাজকে বদলে দেওয়ার সামর্থ্য মানুষের অবশ্যই আছে, যদি একটি মাত্র শর্ত তারা পূরণ করে। সেটা হলো- যদি তারা তাবৎ অন্যায়ের বিরুদ্ধে একদেহ একপ্রাণ হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। কোটি কোটি মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তির সামনে কোনো বাধাই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু কে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াকু যোদ্ধায় পরিণত করবে? যাদের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল, সেই আলেম সমাজ, ধর্মনেতারা তো কয়েক হাজার টাকার বেতনেই পরিতুষ্ট। ও দিয়েই তারা পার্থিব জীবনটা কাটিয়ে কোনোমতে জান্নাতুল ফেরদাউসে (!) চলে যেতে চান।

ধর্মের নামে কিছু আনুষ্ঠানিক উপাসনার দ্বারা ধর্মব্যবসা বেঁচে থাকে, তাই ধর্মব্যবসায়ীরা ধর্মের সমাজকল্যাণকর বাস্তব জীবনমুখী সবকিছু ছেটে ফেলেও অনুষ্ঠানগুলোকে বাঁচিয়ে রাখেন। সব আমলের যেন এক উদ্দেশ্য- বহুত সওয়াব হবে, বহুত ফায়দা হবে; সেই সব সওয়াব জমিয়ে জান্নাতের টিকিট কেনা যাবে। অথচ আল্লাহর রসুল (স.) বলেছেন,

'দুনিয়ার জীবন হচ্ছে আখেরাতের শস্যক্ষেত্র।' (২)

---

১. হাদিস: হাইসাম (রা.) থেকে আহমদ।

২. হাদিস।

সুতরাং যাদের দুনিয়ার জীবন সফলতাপূর্ণ, আখেরাতে তারাই সফল। দুনিয়ার জীবনে যারা লাঞ্ছিত অপমানিত, আখেরাতের জীবনে তারা আরো অধিক লাঞ্ছিত অপমানিত হবে। এ সত্য উপলব্ধি করেই জাগরণের কবি, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন, "জীবন থাকিতে বাঁচিলি না তোরা, মৃত্যুর পরে রবি বেঁচে?" দুনিয়ার জীবনেই যারা আল্লাহর লানতের, গজবের, ক্রোধের, শাস্তির পাত্র, আখেরাতে তারা আরো অধিক অপদস্থ হবে, মর্মন্তুদ শাস্তির আঘাতে দিশাহারা হবে। এ কারণেই আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে আমাদেরকে দোয়া করতে শিখিয়েছেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়ার জীবনকে সুন্দর করো আর আমাদের আখেরাতের জীবনকেও সুন্দর করো। এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ করো।"(১)

আল্লাহর রসুল যে জাতিটা গঠন করে গিয়েছিলেন সেই জাতি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল। সেই ইসলাম নামক পরশমণির ছোঁয়ায় যে আরবরা নিজেদের হাতে গড়া মূর্তির সামনে মাথা নোয়াতো তারা আকাশের জ্যোতির্মণ্ডলী নিয়ে গবেষণায় যুগান্তকারী অবদান রাখল। যারা ছিল জাহেলিয়াত অর্থাৎ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত তারা জ্ঞানের প্রদীপ্ত মশালকে ধারণ করে বিশ্ববাসীকে পথ দেখানোর দায়িত্ব গ্রহণ করল। সম্পদের প্রাচুর্য, সামরিক শক্তি, প্রতাপ, মানবিক গুণাবলী শিক্ষা কোনো বিষয়ে তাদের সাথে তুলনা করা যায় এমন কোনো মানবগোষ্ঠী সেই কয়েকশ' বছর পৃথিবীতে ছিল না। তাদের দুনিয়াও সুন্দর ছিল নিঃসন্দেহে আখেরাতও সুন্দর হবে। কিন্তু আমাদের দুনিয়ার জীবনটা এমন কদর্য কেন? আমরা কেন শত শত বছর ধরে অন্য জাতিগুলোর কাছে মার খেয়ে যাচ্ছি? কেন আমরা আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থার বদলে পাশ্চাত্য পরাশক্তিগুলোর চাপিয়ে দেওয়া জীবনব্যবস্থাগুলো মেনে চলতে বাধ্য হচ্ছি? আজকে আমাদের প্রভু আল্লাহ নন, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা। আমরা বাস্তব জীবনে তাদেরই আনুগত্য করছি আর পূর্বপুরুষের অনুকরণে আল্লাহর প্রতি প্রথাগত সেজদা করে যাচ্ছি। এ সেজদা আল্লাহর সাথে তামাশা বৈ কিছু নয়। কারণ সেজদা হচ্ছে আনুগত্যের প্রতীক। আমি জাতীয় ও সামষ্টিক জীবনে যার আনুগত্য করছি না, তার পানে মাটিতে কুর্নিশ করে মাথা ঠেকিয়ে সেজদা করে কী ফল? সে জাল্লে জালাল বে-নেয়াজ আল্লাহ তো আমাদের মেকি সেজদার কাঙাল নন। **কাদের কাজের ফলে আমাদের এই হীন পরিণতি?**

এর উত্তর পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে রেখে এসেছি। যারা দীনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে মতভেদ সৃষ্টি করে জাতিটা অসংখ্য ফেরকা, মাজহাবে বিভক্ত করল, যারা জ্ঞানকে কেবলমাত্র ধর্মীয় জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করল, যারা বিকৃত সুফিবাদ আমদানি করে জাতির বহির্মুখী গতিকে উল্টিয়ে

---

১. আল কোর'আন: সুরা বাকারা ২০১।

অন্তর্মুখী করে দিল, নিষ্প্রাণ, জড়তায় জাতির মন মগজকে আচ্ছন্ন করে দিল, সেই কথিত মহাজ্ঞানী (আল্লামা), মহাবুজুর্গদের কাজের পরিণামেই মুসলিম জাতি বল-বীর্যহীন জাতিতে পরিণত হয়েছে এবং শত্রুর কাছে সামরিকভাবে পরাজিত হয়ে দাসানুদাসে পরিণত হয়েছে। মুসলিম জাতি কি কখনও অন্য জাতির দাস হতে পারে? কখনোই না। তবু এই জাতির মধ্যে থাকা ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী জাতিকে বুঝতে দিল না যে এই জাতি আল্লাহর দৃষ্টিতে আর মো'মেন, মুসলিম, উম্মতে মোহাম্মদী নেই। তারা কার্যত কাফের ও মোশরেকে পরিণত হয়েছে। ধর্মব্যবসা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তারা এই কাজটি করল। ফলে মানুষ ভাবতে শিখল না, তাদের ধর্মচিন্তার সকল দুয়ারে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।

এখন আসা যাক বর্তমান প্রেক্ষাপটে। মুসলিম দাবিদার জনগোষ্ঠীটি এই মুহূর্তে তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সঙ্কটকাল অতিক্রম করছে, কিন্তু সে হুঁশ তাদের খুব কম লোকেরই আছে। জঙ্গিবাদকে ইস্যু বানিয়ে একটার পর একটা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। ঘরের পাশে মায়ানমারে বৌদ্ধরা হাজার হাজার রোহিঙ্গা মুসলমানকে হত্যা করে, নারীদের ধর্ষণ ও শিশুদের হত্যা করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিল, সাগরে ভাসিয়ে দিল। ফিলিস্তিনে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করে তাদের বাড়িঘর থেকে উৎখাত করা হলো। গণবিধ্বংসী বোমা থাকার মিথ্যে অজুহাতে ইরাক আক্রমণ করে ইঙ্গ-মার্কিন যৌথবাহিনী দশ লক্ষ মুসলমানের রক্তে মাটি রঞ্জিত করল। সেখানে এখনও যুদ্ধ চলমান আছে। আফগানিস্তান আক্রমণ করে সেখানকার লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করা হলো। প্রায় অর্ধলক্ষ মুসলমানের জীবন কেড়ে নিয়ে লিবিয়া ধ্বংস করে দেওয়া হল। সিরিয়া হামলা করে অন্তত পাঁচ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করা হলো। **মধ্য আফ্রিকা উত্তরা আফ্রিকার মুসলিম জনবহুল এলাকাগুলোয় কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে দিয়ে লাখে লাখে হত্যা করা হচ্ছে, তাদের মাটির নিচে আল্লাহপ্রদত্ত মহামূল্যবান খনিজ সম্পদগুলো লুট করে নিয়ে তাদেরকে শীর্ণকায়, অসুস্থ, অজ্ঞ, ভিখারির জাতিতে পরিণত করল।** বিশ্বে সাড়ে ছয় কোটি মুসলমান এখন উদ্বাস্তু। খাদেমুল হারামাইন, ইসলামের পীঠস্থান হিসাবে যাদের অহঙ্কারের সীমা নেই, সেই সৌদি আরবের হামলার ফলে ইয়েমেনে চলছে ভয়াবহতম দুর্ভিক্ষ। বিশ্ব দাঁড়িয়ে আছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিনারে যার টার্গেট, লক্ষ্যবস্তু এই মুসলমানেরা। ইরাক সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে সাম্রাজ্যবাদীদের হামলা তো চলছেই, তার উপর শিয়া-সুন্নী ব্লকের যুদ্ধও বিরতিহীনভাবে চলছে। সৌদি আরব বিগত দুই বছরে ইয়েমেনের উপর লাগাতার হামলা চালিয়ে প্রায় ১২,০০০ মুসলমানকে হত্যা করেছে। এ হামলা দ্বারা তারা সেখানকার জনগণকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ওয়াচ ডগ' হিসাবে আখ্যায়িত সৌদি আরব প্রভুদের কাছ

থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র কিনে মুসলমানদের উপর ব্যবহার করছে। তারা শিয়া অধ্যুষিত ইরানকে প্রায়শই হুমকি ধামকি দিয়ে থাকে। সম্প্রতি সৌদি উপ যুবরাজ প্রিন্স মোহাম্মাদ বিন সালমান মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে চলমান যুদ্ধ ইরানে নিয়ে যাওয়া হবে বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, “রিয়াদ ও তেহরানের মধ্যে কোনো যুদ্ধ হলে তা হবে ইরানের মাটিতে।” সালমানের এ বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, “আমরা তাদেরকে মূর্খের মতো কাজ করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাব। কিন্তু তারপরও তারা যদি বেকুবের মতো কিছু করে বসে তাহলে মক্কা ও মদীনা ছাড়া সৌদি আরবের আর কোনো জায়গায় হামলা চালাতে আমরা বাদ রাখব না।”(১)

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘ইচ্ছানুসারে’ কাতারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে প্রতিবেশী ছয়টি দেশ। কাতারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যাবতীয় প্রস্তুতিও সম্পন্ন করেছে সৌদি আরব। কাতারের সমর্থনে এগিয়ে গেছে ইরান ও তুরস্ক। এই অসিলায় কাতারের কাছে চটজলদি ১ হাজার ১০০ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করে ফেলল যুক্তরাষ্ট্র।(২) এভাবেই উত্তেজনাপূর্ণ গোটা মধ্যপ্রাচ্য হয়ে উঠছে গোলা বারুদের পিঁপে। যে কোনো মুহূর্তে ঘটবে অগ্নিসংযোগ যা উপসাগরীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং অনিবার্যভাবেই বিশ্বযুদ্ধে রূপ নেবে। কেননা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর জোট ন্যাটো, ইসরাইল সকলেই মুখিয়ে আছে সন্ত্রাসী অর্থাৎ ‘মুসলিম’ নিধনের জন্য। আর দুনিয়াটা দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদি খ্রিষ্টান বস্তুবাদী ‘সভ্যতার’ হাতের মুঠোয়। সবাই হন্যে হয়ে বিধ্বংস ঘটানোর একটি অসিলা তালাশ করছে শুধু। এমতাবস্থায় যারা চলনে বলনে ইসলামের কাণ্ডারি, যাদেরকে এই জনগোষ্ঠী ধর্মের পুরোহিত পুরোধা, ধর্মের ধ্বজাধারী বলে মান্য করে, সমীহ করে, যাদের ওয়াজে প্রভাবিত হয়ে চোখের পানি প্রবাহিত হয় সেই কথিত আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, মাদ্রাসাকেন্দ্রিক কোটি কোটি মানুষ তারা জাতির এই দুর্দিনে কী ভূমিকা রাখলেন বা রাখবেন বলে ঠিক করেছেন? আমরা দেখতে পাচ্ছি, একেবারে কিছুই না। **তারা আজও ব্যস্ত আছেন তাদের নামাজ রোজার ফজিলত নিয়ে, তারাবি নিয়ে, ঈদ-কোরবানি-হজ্ব নিয়ে, শবে বরাত নিয়ে, ব্যস্ত আছেন ভাস্কর্য, সঙ্গীত ইত্যাদি জায়েজ নাকি না-জায়েজ ইত্যাদি বিষয়ের ফতোয়াবাজি নিয়ে, ব্যস্ত আছেন খানকায়, মিলাদে, ওরশ মোবারকে। সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে দীনরক্ষা ও দেশরক্ষার কাজে তাদের যে কোনো ভূমিকা থাকতে পারে এটাও তাদের আকিদার বাইরে, চিন্তার সীমানার বাইরে চলে গেছে।** তাদের কেউ কেউ দল গঠন করে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন করে নিজেদের তাগদের জানান দিচ্ছেন, এর ওর বিরুদ্ধে গলার রগ ফুলিয়ে

---

১. দৈনিক কালেরকণ্ঠ (৯ মে ২০১৭)।

২. দৈনিক যুগান্তর ৫ জুলাই ২০১৭

বক্তৃতা দিচ্ছেন কিন্তু মুসলিম জাতির অস্তিত্বের সঙ্কট উপস্থিত, সেটা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। **শীতকাল আসলেই ওয়াজ মাহফিলগুলোতে অপ্রয়োজনীয় অনর্থক বিষয়ের পাশাপাশি তারা কখনও বুশের মাথা কাটছেন, মোদির শিরোচ্ছেদ করছেন, ফিলিস্তিন দখলে নিচ্ছেন, ইহুদিদের বাড়িঘরে আগুন দিয়ে তাদের জাহান্নামে পাঠাচ্ছেন। তাদের 'জ্বালাময়ী ভাষণ' মানুষকে সাময়িক উত্তেজিত করে শীত তাড়ায় বটে কিন্তু কাজের কাজ কিচ্ছু হয় না। দিনের বেলায় সেই উত্তেজনার রেশ কেটে যায়।** এভাবেই তারা যুগে যুগে নিজেদের স্বার্থে মুসলিম জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের দিকে নিয়ে গেছে, তাদেরকে মগ্ন করে দিয়েছে অবাস্তব চিন্তারভাবনা আর তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে যার সাথে জনস্বার্থের বা জাতির প্রকৃত মঙ্গল-অমঙ্গলের কোনো সম্পর্কই নেই।

যে যে ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে তাদের স্বার্থ জড়িয়ে আছে, যে কাজটি করলে তাদের পকেট ভারি হবে তারা সেই কাজের প্রতিই আরো বেশি বেশি জাতিকে ধাবিত করেন। মসজিদে মাদ্রাসায় আরো বেশি দান করা হোক, আরো বেশি বেশি ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হোক, মানুষ আরো বেশি বেশি মিলাদ পড়াক, আরো বেশি বেশি মানুষ পীরের মুরিদ হোক, আরো বেশি বেশি তারাবির নামাজ পড়া হোক, তাদের অনর্থক আন্দোলনগুলোতে আরো বেশি বেশি মানুষ যোগদান করুক। যেসব দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন হয়েছে সেসব দেশে এখন না আছে মসজিদ, না আছে মাদ্রাসা, না হয় কোনো ওয়াজ মাহফিল আর না হয় কোনো ওরশ মোবারক (!)। কোনো ধর্মের উপাসনালয়ই সেখানে আর আবাদ হয় না। তাহলে সেখানকার প্রকৃত ধার্মিকদের জন্য কোন কাজটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল- দেশ ও মাটি, ধর্ম ও ঈমান রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে রণসাজে সজ্জিত হওয়া নাকি আনুষ্ঠানিক উপাসনা করে নেকির পাল্লা ভারি করা? ক্ষুদ্র স্বার্থের পেছনে ছুটে সেসব দেশের ধর্মব্যবসায়ীরা জাতিকে সঠিক পথে না নিয়ে তাদের ঈমানকে ভুল পথে প্রবাহিত করেছে। যার পরিণামে এখন তারা সবাই ইউরোপের পথে পথে ভিক্ষাবৃত্তি করছে নয়তো মাটির সাথে মিশে গেছে। পেটের দায়ে, বেঁচে থাকার অধিকার পেতে তাদের অনেককেই ধর্মান্তরিত হতে হচ্ছে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেহব্যবসায় নামতে হচ্ছে। নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাতের ওয়াজ শোনার অবস্থা আজ আর তাদের নেই।

এভাবেই ধর্মব্যবসা ও দীনের অতি বিশ্লেষণের পরিণামে দীনের বিকৃতি আর দীনের বিকৃতির পরিণামে মুসলিম জাতির পচন ও পতনের অধ্যায় ইতিহাসের পাতায় লিখিত হলো।

ভবিষ্যতে মুসলিম উম্মাহর কী অবস্থা হবে বলতে যেয়ে একদিন আল্লাহর রসুল (সা.) বললেন- "এমন সময় আসবে যে, এই জাতি পৃথিবীর সব জাতির দ্বারা অপমানিত, লাঞ্ছিত, পরাজিত হবে। উপস্থিত সাহাবাদের মধ্য থেকে কেউ

কেউ প্রশ্ন করলেন- হে আল্লাহর রসুল! তখন কি পৃথিবীতে তারা এত অল্প সংখ্যক হবে যে, অন্য জাতিগুলো তাদের পরাজিত ও লাঞ্ছিত করবে? মহানবী (স.) তার জবাব দিলেন- "না, সংখ্যায় তারা অসংখ্য হবে।"

জবাব শুনে আসহাবরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। বিস্মিত হবার কথাই। কারণ তখন ঐ ছোট্ট উম্মাহটার ঈমান ইস্পাতের মতো, আকিদা (দীন সম্পর্কে ধারণা) সম্পূর্ণ ও সঠিক, উদ্দেশ্য পরিষ্কার, উদ্দেশ্য অর্জন করার প্রক্রিয়া দৃঢ়, ঐক্য লোহার মতো; দুর্বলতা শুধু এই জায়গায়- সংখ্যাল্পতায়। তাই এর জবাবে তারা যখন শুনলেন যে, সেই একমাত্র দুর্বলতাই থাকবে না, সংখ্যায় ঐ উম্মাহ হবে অগণিত, তখন পরাজয় কী করে সম্ভব? বিশেষ করে যখন ঐ ছোট্ট উম্মাহ তাদের চেয়ে সংখ্যায় বহু বেশি, সুসজ্জিত, সুশিক্ষিত শত্রুদের বারবার পরাজিত করেছেন।

তারা আবার মহানবীকে (সা.) প্রশ্ন করলেন- "আমরা সংখ্যায় অসংখ্য হলে পরাজয় কী করে সম্ভব?" রসুল (সা.) জবাব দিলেন একটা উপমা দিয়ে, বললেন,"মনে করো শত শত উট, কিন্তু উটগুলো এমন যে যেটার উপরই চড়ে বসতে যাও ওটাই বসে পড়ে বা পড়ে যায়। ঐ অসংখ্যের মধ্যে খুব কম উটই পাওয়া যাবে যেগুলোর পিঠে চড়া যাবে।"(১)

বিশ্বনবীর (সা.) উপমাটা লক্ষ্য করুন- উট। উটের উদ্দেশ্য কী? উট দিয়ে কী কাজ হয়? উট হচ্ছে বাহন, মানুষকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেইটাই যদি উট দিয়ে না হয় তবে ঐ উট অর্থহীন- দেখতে অতি সুন্দর উট হলেও এবং সংখ্যায় অসংখ্য হলেও।

শেষনবীর (সা.) সেই ভবিষ্যদ্বাণী বহু আগেই বাস্তবায়িত হয়েছে, জাতির সদস্য সংখ্যা অগণিত হওয়া সত্ত্বেও শত্রুর পদানত দাস হয়েছে, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে এবং হচ্ছে। **মহানবীর (সা.) বর্ণনা অনুযায়ী এরা দেখতে অতি সুন্দর উট, লম্বা কোর্তা, পাগড়ী, লম্বা দাড়ি, ছেটে ফেলা মোচ, টাখনুর ওপরে ওঠানো পাজামা, কাঁধে চেক রুমাল, দিনে পাঁচবার মসজিদে দৌড়াচ্ছেন, গোল হয়ে বসে চারিদিক প্রকম্পিত করে আল্লাহর যিকর করছেন, খানকায় বসে মোরাকাবা, কাশফ করছেন- তাদের লেবাসে আর ছোটখাটো আমলে ভুল ধরে এমন সাধ্য কারো নেই। দেখতে একেবারে নিখুঁত উট। কিন্তু আসলে উট নয়, ওদের পিঠে চড়া যায় না, চড়লেই বসে পড়ে।**

এ অধ্যায়টি শেষ করছি কাজী নজরুল ইসলামের একটি কবিতা "জীবনে যাহারা বাঁচিল না" এর প্রথম কয়েকটি চরণ দিয়ে। যে মুসলমানেরা দুনিয়াতে অন্যের লাথিগুতো খেয়ে জিন্দেগি পার করল তারা আবার আখেরাতে জান্নাতে গিয়ে আমোদ-

---

১. হাদিসঃ আবুদল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বোখারী ও মুসলিম।

আহ্লাদে থাকার স্বপ্ন দেখে, ভাবে মুসলমান হয়ে জন্মেছি, সুতরাং জান্নাতে তো যাবোই একদিন না একদিন। তাদের এই মূর্খতার প্রতি শ্লেষ বর্ষণ করে কবি লিখেছেন:

জীবন থাকিতে বাঁচিলি না তোরা
মৃত্যুর পরে রবি বেঁচে
বেহেশ্‌তে গিয়ে বাদশার হালে,
আছিস দিব্যি মনে এঁচে!
হাসি আর শুনি! - ওরে দুর্বল,
পৃথিবীতে যারা বাঁচিল না,
এই দুনিয়ার নিয়ামত হতে-
নিজেরে করিল বঞ্চনা,
কিয়ামতে তারা ফল পাবে গিয়ে?
ঝুড়ি ঝুড়ি পাবে হুরপরি?
পরির ভোগের শরীরই ওদের!
দেখি শুনি আর হেসে মরি!
জুতো গুঁতো লাথি ঝাঁটা খেয়ে খেয়ে
আরামসে যার কাটিল দিন,
পৃষ্ঠ যাদের বারোয়ারি ঢাক
যে চাহে বাজায় তাধিন ধিন,
আপনারা সয়ে অপমান যারা
করে অপমান মানবতার,
অমূল্য প্রাণ বহিয়াই ম'ল,
মণি-মাণিক্য পিঠে গাধার!
তারা যদি মরে বেহেশ্‌তে যায়,
সে বেহেশ্‌ত তবে মজার ঠাঁই,
এই সব পশু রহিবে যথা, সে
চিড়িয়াখানার তুলনা নাই!

ধর্মব্যবসায়ীরা যখন দুরাচারী শাসকের তাবেদার

আজ থেকে ১৩শ’ বছর আগে উম্মতে মোহাম্মদী যখন তার দায়িত্ব থেকে বিমুখ হলো, বিশ্বময় সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ত্যাগ করল তখন অর্ধেক দুনিয়ার সম্পদ এই জাতির পায়ের নিচে। এই বিপুল সম্পদরাশি হাতে পেয়ে জাতির অযোগ্য নেতারা ভোগবিলাসে মত্ত হলো। **এটা সমস্ত মুসলিম বিশ্বে গৃহীত হয়ে গেল যে আমির বলতে ধনকুবের বোঝানো হয়। বাংলা ভাষায় আমির-ফকির শব্দ দু’টো দিয়ে ধনী ও গরিবকে নির্দেশ করা হয়। অথচ প্রকৃত ইসলামের যুগে আমির বলতে প্রশাসক, নেতা, আদেশদাতা বা সেনাবাহিনীর কমান্ডারদেরকে বোঝানো হতো যা কোনোভাবেই ধনীর সমার্থক নয়।** আজও আমির বলতে ধনীদেরকে বোঝানো হয়। জাতির নেতারা জাতির সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করল। পৃথিবীর অপরাপর রাজা বাদশাহদের মতই তারা সর্বরকম পাপাচারে লিপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু বৃহত্তর মুসলিম জনতা যেন খলিফা নামধারী সুলতানদের বিরুদ্ধে না চলে যায় সেজন্য সুলতানদের প্রয়োজন হয় কিছু ভাড়াটিয়া আলেমের যারা পদ ও সম্পদের লোভে শাসকদের যাবতীয় অনাচারকে কোর’আন সুন্নাহর মাপকাঠিতে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে এবং জনগণকে ইসলাম সম্পর্কে ভুল শেখাবে। রাজা বাদশাহরা যা কিছুই বলবে কোর’আন ও হাদিসকে অপব্যাখ্যা করে সেটাকে ইসলাম সম্মত করার চেষ্টা করবে।

তখন এই জাতির মধ্যে একদল অর্থলোভী আলেম, বুদ্ধিজীবী শ্রেণির জন্ম হলো। উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য এরা লক্ষ লক্ষ জাল হাদিস রচনা করল। **এই গোষ্ঠীটিকে ইসলামের ব্যাখ্যাকার ঐতিহাসিকগণ আলিমুস সুলতান বা সরকারি আলেম, দরবারী আলেম, দুনিয়াদার আলেম, ওলামায়ে ছুঁ, নিকৃষ্ট আলেম ইত্যাদি অপমানজনক নামে আখ্যায়িত করেছেন।** আল্লাহর রসুল তাঁর বহু ভবিষ্যদ্বাণীতে এই বিশেষ ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠীটির ব্যাপারে উম্মাহকে সাবধান করে গেছেন। কেননা আলেমদের দায়িত্ব হচ্ছে ন্যায় ও অন্যায়কে পৃথক করে দেওয়া, অথচ এই আলেমগণ শাসকদের ‘অন্যায়’ কাজকে ‘ন্যায়’ বলে ফতোয়া প্রদান করেছে। যার ফলে তাদের লাগামহীন ইন্দ্রিয়পূজা, অপচয়, ব্যভিচার, সম্পদ লুণ্ঠন ন্যায়সঙ্গত হয়ে গেছে এবং উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করেছে। তারা ভুলে গিয়েছিল আল্লাহর সাবধানবাণী, **“যখন আমি কোনো এলাকাকে ধ্বংস করার ইচ্ছা**

করি তখন উক্ত এলাকার ধনীদের সুযোগ করে দেই ফলে তারা অবাধ্য হয় তখন আমি উক্ত এলাকাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেই।"(১)

সাধারণ জনগণ যখন নেতৃত্বস্থানীয়দেরকে স্পষ্ট পাপাচারে লিপ্ত দেখে তখন তাদের অনুসরণে তারাও উক্ত পাপের প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়। এভাবে সমাজের উঁচু স্তরের ব্যক্তিদের পিছনে জীবন ক্ষয় করে যখন হাশরের দিন অপমানিত অবস্থায় উত্থিত হবে তখন মানুষ আফসোস করে বলবে, "হে আমাদের রব, আমরা তো আমাদের নেতা নেত্রী ও উঁচুতলার ব্যক্তিদের অনুসরণ করে চলতাম। ফলে তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করে ছেড়েছে। তুমি তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দাও, তাদের তুমি চরমভাবে অভিশপ্ত করো।"(২) কিন্তু তখন এই আফসোস কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ বলবেন, "প্রত্যেকের শাস্তিই দ্বিগুণ করা হলো। তোমরা ভীষণ অজ্ঞ।"(৩)

শাসক যখন পথভ্রষ্ট হয় তখন অপরাধ কোনো গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। সে নিজে অপরাধ করে, অন্যকে অপরাধ করতে উৎসাহিত করে, আইন করে অন্যায় কর্মের অনুমোদন প্রদান করে, মানুষকে আল্লাহর অবাধ্য হতে বাধ্য করে। আর এই অনুমোদনের কাজটি করে দেয় দরবারী আলেমগণ। আমাদের সমাজে এই গোষ্ঠীটি এখনও বেশ প্রভাবশালী অবস্থানে রয়েছে। ধর্ম যেহেতু বর্তমান পৃথিবীর প্রধান ইস্যু তাই মুসলিম নামধারী শাসকবর্গ এই ভাড়াটিয়া আলেমদেরকে যখন যেখানে দরকার পড়ে ব্যবহার করেন। রসুলাল্লাহ (সা.) ১৪শ' বছর আগেই এর ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। তিনি বলেছেন, **"আমার উম্মতের একটি দল দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করবে, কোর'আন পাঠ করবে, তারপর তারা বলবে, আমরা নেতৃবর্গের নিকট যাব, তাদের নিকট হতে দুনিয়ার সম্পদ গ্রহণ করবো কিন্তু দীনের ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করব না। এরূপ কখনো হতে পারে না। যেমন কাঁটাদার গাছ থেকে ফল আহরণের সময় হাতে কাঁটা ফুটবেই, অদ্রূপ তারা তাদের কাছে গিয়ে গুনাহ ব্যতীত তারা কিছুই লাভ করতে পারে না।"**(৪)

বস্তুত যেদিন থেকে ধর্মের ধ্বজাধারীদেরকে টাকা দিয়ে কেনা যায় সেদিন থেকেই ধর্ম বলতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। এখন পড়ে আছে কেবল ধর্মের খোলস। কিন্তু দুনিয়ার পদ ও পদবীর বিনিময়ে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলতে এদের নিষেধ করা হয়েছিল। আল্লাহ বলেছেন, "তারপর (নেককারদের পর) কিছু লোক কেতাবের ওয়ারিস হলো (কেতাবের জ্ঞানপ্রাপ্ত হলো) কিন্তু তারা (বিনিময় বা ঘুষ হিসাবে) দুনিয়ার এই নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করত এবং বলত আমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। পরে যদি আবার অনুরূপ বস্তু পেশ করা হয় তারা আবার গ্রহণ করে। তাদের নিকট কি এই ওয়াদা নেওয়া হয়

---

১. আল কোর'আন: সুরা বনী ইসরাইল ১৬।

২. আল কোর'আন: সুরা আহযাব ৬৭-৬৮।

৩. আল কোর'আন: সুরা আরাফ ৩৮।

৪. হাদিস: ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে ইবনে মাজাহ, মেশকাত, কানযুল উম্মাল, সুয়ুতী, তারগীব ওয়াত তারহীব।

নি যে আল্লাহর ব্যাপারে তারা মিথ্যা কথা বলবে না? আর কিতাবে যা আছে তারা তো তাও পাঠ করেছে। নিশ্চয় মুত্তাকিদের জন্য আখেরাতই উত্তম, তোমরা কি বোঝো না?”(১)

মুসলিমরা ইউরোপিয়ানদের গোলাম হওয়ার আগে ধর্মব্যবসায়ী দরবারী আলেমরা যে ফতোয়া দিতেন সেগুলোই মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডগুলোতে প্রয়োগ করা হতো, সেগুলোই ফতোয়ার বইতে গ্রন্থিত হতো। যেমন মোগল বাদশাহ আলমগীরের (আওরঙ্গজেব) নির্দেশে দরবারী আলেমগণ যে ফতোয়ার বইটি গ্রন্থিত করেন তার নাম ফতোয়ায়ে আলমগীরী যা কেবল এই উপমহাদেশের জীবনব্যবস্থাকেই নিয়ন্ত্রণ করত না, তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যেও এই ফতোয়াগুলোই কার্যকর করা হতো। আমরা জুমার সময় প্রাচীন যুগের যে খোতবাগুলো পাঠ করতে শুনি তার মধ্যে রসুলাল্লাহর (সা.) নামে একটি জাল হাদিসও আমাদেরকে শুনতে হয়, সেটা হচ্ছে, “আস সুলতানু জিল্লুল্লাহে ফিল আরদ অর্থাৎ সুলতান হচ্ছেন জমিনে আল্লাহর ছায়া।”(২) অথচ ইসলামে সালতানাত বা রাজতন্ত্রই নিষিদ্ধ এবং রসুল বা তাঁর সাহাবীরা কেউ সুলতান ছিলেন না। এগুলোই হচ্ছে সরকারি আলেমদের দীনি খেদমত আর অবদান যার বোঝা আমরা আজও বহন করে যাচ্ছি। তাদের রচিত নিয়ম-কানুন, হালাল-হারামের ফতোয়াগুলোই আমরা ধ্রুব সত্য বলে মনে করছি এবং সেই বিকৃত ইসলামটিকেই প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন ইসলামি দল খেয়ে না খেয়ে কথিত জেহাদ করে যাচ্ছে। এদের বিষয়ে আল্লাহর রসুলের কয়েকটি হাদিস এখানে উল্লেখ করছি:

১. রসুলাল্লাহর খাদেম সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি রসুলাল্লাহ (সা.) কে বললেন, আমি কি আপনার পরিবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত? রসুলাল্লাহ (সা.) চুপ থাকলেন। এভাবে তিনবার প্রশ্ন করার পর তিনি বললেন, “হ্যাঁ, যদি তুমি কোনো নেতার দরজাতে ধর্ণা না দাও এবং কোনো নেতার নিকট যেয়ে কিছু না চাও।”(৩)

২. রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যারা মরু অঞ্চলে বসবাস করে তারা রুক্ষতা প্রাপ্ত হয়, যারা জীবজন্তু শিকার করে তারা বেপরোয়া হয় এবং যে ব্যক্তি শাসকের (সুলতান) দরবারে যাওয়া আসা করে সে ফিতনায় পড়ে যায়। যে কেউ শাসকের নিকটতর হয় সে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়।(৪)

৩. রসুলাল্লাহ বলেছেন, “শাসকদের দরজা থেকে সতর্ক থেক কারণ সেগুলো ফেতনা, হয়রানি ও অবমাননার উৎস হয়ে দাঁড়ায়।”(৫)

---

১. আল কোর’আন: সুরা আরাফ ১৬৯।

২. হাদিস: আবু হোরায়রাহ (রা.) থেকে আল বাজ্জার, বায়হাকি, তাবারানি।

৩. হাদিস: তারগীব ওয়াত তারহীব।

৪. হাদিস: ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আবু দাউদ, তিরমিজি, মেশকাত, তারগীব ওয়াত তারহীব।

৫. হাদিস: আবু আল আওয়ার আস-সিলমি (রা.) থেকে শহীদ আদ-দায়লামি, ইবনে মুনদাহ, ইবনে আসাকি।

৪. রসুলাল্লাহ বলেছেন যে, “নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্টি হলো আলিমুস সুলতান বা সরকারি আলেম।”(১)

৫. আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলাল্লাহ বলেছেন যে, “আল্লাহর কাছ থেকে দুর্দশার গহ্বর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো।” সাহাবিরা প্রশ্ন করলেন, “হে আল্লাহর রসুল! দুর্দশার গহ্বর কী?” তিনি উত্তর দিলেন, “এটি হচ্ছে জাহান্নামের একটি নদী যা থেকে খোদ জাহান্নাম প্রতিদিন শতবার আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে।” সাহাবিরা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, “হে আল্লাহর রসুল! এতে কে প্রবেশ করবে?” তিনি বললেন, **“এটি প্রস্তুত করা হয়েছে পবিত্র কোর’আনের সেই ক্বারীদের জন্য যারা নিজেদের আমলকে প্রদর্শন করতে আগ্রহী।** আর আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ক্বারী হচ্ছে তারা যারা শাসকদের দরবারে যাতায়াত করে।”(২)

৬. রসুলাল্লাহ বলেছেন, “যদি তুমি কোনো আলেমকে দেখ যে শাসকদের (সুলতান, আমির-ওমরাহ) সাথে খুব মেলামেশা করছে, তাহলে জেনে রেখ যে সেই লোক একটা চোর।”(৩)

৭. ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেছেন, “যদি তুমি কোনো আলেমকে নিয়মিতভাবে খলিফার দরবারে যাতায়াত করতে দেখ তাহলে তার দীন ত্রুটিযুক্ত বলে জানবে।” তাঁর সময়ে যিনি খলিফা ছিলেন তিনি তাঁকে প্রধান বিচারপতি বা কাজির দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার দরুন সাজাপ্রাপ্তও হয়েছিলেন।

৮. রসুলাল্লাহ বলেছেন, “ফকীহগণ (শরিয়াহ বিশেষজ্ঞ) হচ্ছেন নবীদের প্রতিনিধি (ন্যায়পাল) যতদিন না তারা দুনিয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ে অথবা শাসকদের অনুগামী হয়। যদি তারা সেটা করে তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকবে।(৪)

৯. রসুলাল্লাহ বলেছেন, “যখন কোনো আলেম স্বেচ্ছায় কোনো শাসকের কাছে গমন করেন তখন তিনি সেই শাসকের প্রত্যেক অন্যায় কাজের অংশীদার হবেন এবং ঐ শাসকের সাথেই জাহান্নামের আগুনে সাজাপ্রাপ্ত হবেন।”(৫)

প্রশ্ন আসতে পারে, এই হাদিসগুলোতে কোন শাসকের কথা বলা হয়েছে। কারণ আবু বকর (রা.), ওমর (রা.) - এঁরাও তো শাসকই ছিলেন। তবে এখানে সেই সত্যনিষ্ঠ ন্যায় পরায়ণ শাসকদের কথা বলা হয় নি। বরং বলা হয়েছে স্বার্থবাদী, অবিচারী, জালেম

---

১. হাদিসঃ আবু হোরায়রা (রা.) থেকে জামিউল আহাদিসঃ কানযুল উম্মাল।

২. হাদিসঃ ইবনে মাজাহ।

৩. হাদিসঃ দায়লামী, মুসনাদে ফেরদাউস।

৪. হাদিসঃ আলী (রা.) থেকে ইমাম আসকারী।

৫. হাদিসঃ মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) থেকে হাকিম, দায়লামি।

শাসকদের কথা। খোলাফায়ে রাশেদিনের পরবর্তী যুগে উম্মাহর নেতৃত্বে থাকা এ ধরনের জালেম শাসকদের দ্বারাই ইসলাম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ইসলামের বদনাম হয়েছে। এহেন শাসক ও ক্ষমতাসীনদের তাবেদার যে ধর্মব্যবসায়ী আলেম, তাদের সম্পর্কে এমন আরো বহু হাদিসে রসুল, তাঁর সাহাবিদের সতর্কবাণী ও প্রাথমিক যুগের প্রসিদ্ধ ইমামদের বহু হুঁশিয়ারি বার্তা এখানে উল্লেখ করা যেত, কিন্তু পুনরুক্তি এড়ানোর স্বার্থে এখানেই থামছি। ক্ষমতাবান শাসক, আমির, সুলতান, বাদশাহদের মন যোগাতে গিয়ে ধর্মব্যবসায়ী আলেমরা কেমন করে জাল হাদিস রচনা করেছেন তার বর্ণনা দিয়ে তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস যুহাইর ইবনু হারব (২৩৪ হি) বলেন: তৃতীয় আব্বাসীয় খলিফা মুহাম্মাদ মাহ্দী (শাসনকাল ১৫৮-১৬৯ হি) এর দরবারে একবার কয়েকজন মুহাদ্দিস আগমন করেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন গিয়াস ইবনু ইবরাহীম আন-নাখয়ী। খলিফা মাহ্দী উন্নত জাতের কবুতর উড়াতে ও কবুতরের প্রতিযোগিতা করাতে ভালবাসতেন। খলিফার পছন্দের দিকে লক্ষ্য করে গিয়াস নামক এই ব্যক্তি একেবারে তথ্যসূত্র (সনদ, Chain) উল্লেখ করে বলেন, রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তীর নিক্ষেপ, ঘোড়া ও পাখি ছাড়া আর কিছুতে প্রতিযোগিতা নেই।' একথা শুনে মাহদী খুশী হন এবং উক্ত মুহাদ্দিসকে ১০ হাজার মুদ্রা হাদিয়া প্রদানের নির্দেশ দেন। কিন্তু যখন গিয়াস দরবার ত্যাগ করছিলেন তখন মাহদী বলেন, **"আমি বুঝতে পারছি যে, আপনি মিথ্যা বলেছেন। আর আমিই আপনাকে মিথ্যা বলতে প্ররোচিত করেছি।"** এরপর তিনি কবুতরগুলো জবাই করতে নির্দেশ দেন। তিনি আর কখনো উক্ত মুহাদ্দিসকে তার দরবারে প্রবেশ করতে দেন নি।(১)

এখানে লক্ষণীয় যে, মূল হাদিসটি সহীহ, যাতে ঘোড়দৌড়, উটদৌড় ও তীর নিক্ষেপে প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদানে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এই ব্যক্তি খলিফার মনোরঞ্জনের জন্য সেখানে 'পাখি' শব্দটি যোগ করেছে।

পঞ্চম আব্বাসী খলিফা হারূন আর-রশীদ (শাসনকাল ১৯৩-১৭০ হি) রাষ্ট্রীয় সফরে মদীনা আগমন করেন। তিনি মসজিদে নববীর মিম্বরে উঠে বক্তৃতা প্রদানের ইচ্ছা করেন। তাঁর পরনে ছিল কালো শেরোয়ানী। তিনি এই পোশাকে মিম্বরে নববীতে আরোহণ করতে দ্বিধা করছিলেন। মদীনার সুপরিচিত আলেম ও কাজী ওয়াহাব ইবনে ওয়াহাব আবুল বুখতুরী তখন বলেন: আমাকে ইমাম জা'ফর সাদিক বলেছেন, তাঁকে তাঁর পিতা মুহাম্মাদ আল-বাকির বলেছেন, জিবরাঈল কালো শেরোয়ানী পরিধান করে রসুলাল্লাহ (সা.) এর নিকট আগমন করেন।(২)

---

১. ইমাম মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানী, যয়ীফু সুনানি ইবনি মাজাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম প্র, ১৯৯৭)।

২. ইমাম মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ)।

এভাবে তিনি খলিফার মনোরঞ্জনের জন্য একটি মিথ্যা কথাকে হাদিস বলে চালালেন। আবুল বুখতুরী হাদিস জালিয়াতিতে খুবই পারদর্শী ছিলেন।

ওয়াজের মধ্যে শ্রোতাদের দৃষ্টি-আকর্ষণ, মনোরঞ্জন, তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার ও নিজের সুনাম, সুখ্যাতি ও নগদ উপার্জন বৃদ্ধির জন্য অনেক মানুষ ওয়াজের মধ্যে বানোয়াট কথা হাদিস নামে বলেন। এর প্রচলন বহু পূর্বে থেকেই হয়ে আসছে। **মিথ্যা ও জাল হাদিসের প্রসারে এসকল ওয়াজকারী গল্পকারদের ভূমিকা ছিল খুব বড়।** জাল হাদিসগুলো কেন, কারা, কী উদ্দেশ্যে, কীভাবে রচনা করেছিল তা নিয়ে সহস্রাধিক বছর থেকে বড় বড় কেতাব লেখা হয়েছে, আগ্রহী পাঠকগণ সেগুলো পড়লে আল্লাহ-রসুলের নামে ধর্মব্যবসায়ীদের মিথ্যাচারের দুঃসাহস দেখে বিস্মিত না হয়ে পারবেন না। এখানে সেই আলোচনায় যাব না, শুধু এটুকুই বলছি, দীনের এই বিকৃতিসাধনের ধ্বংসাত্মক ফল হয়েছিল এই যে, গোটা জাতি যাদেরকে আল্লাহর রসুল একটি ইসপাত কঠিন ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখে গিয়েছিলেন তারা ঐ সব হাদিসের ব্যাখ্যা নিয়ে, মাসলা মাসায়েল বের করে শত সহস্র ফেরকায় বিভক্ত হয়ে গেল। মুসলিম জাতি আর একক জাতি রইল না, তাদের নেতৃত্ব বিভক্ত হয়ে গেল, তাদের বিশ্বাস বিভক্ত হয়ে গেল। এইসব ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মাজহাব ফেরকা-তরিকার অনুসারীরা ঐ সব মাসলা মাসায়েল নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে বাহাস, তর্ক শুরু করল। সেই তর্ক বিতর্ক রক্তারক্তিতে গড়ালো। যে জাতি সৃষ্টি করা হয়েছিল সকল মিথ্যার মস্তকে আঘাত করে সত্যকে বিশ্বময় প্রতিষ্ঠা করতে, সেই জাতির লোকেরা নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে (Sectarian war) লিপ্ত হলো। এক দল আরেক দলকে দুনিয়া থেকে মুছে ফেলতে চাইল। জাতি লক্ষ্যচ্যুত হলো, তাদের আকিদা বিকৃত হয়ে গেল, তারা একটি বিশৃঙ্খল, ভীরু-কাপুরুষ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হলো। **ফলশ্রুতিতে তারা ইউরোপীয় ইহুদি-খ্রিষ্টান ছোট ছোট জাতিগুলোর ক্রীতদাসে পরিণত হলো। এই ইউরোপিয়ানরা তাদেরকে সীমাহীন অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ ও শোষণ করে জুতা সাফ করতে বাধ্য করল। সেই দাসত্ব, গোলামি এখনও চলছে। এভাবেই আজ মুসলিম জনগোষ্ঠী হাজারো ফেরকায় বিভক্ত হয়ে সেই পূর্বতন প্রভুদের পদলেহন করেই চলছে।** ইরানের নেতৃত্বে শিয়া ব্লক, সৌদী আরবের নেতৃত্বে সুন্নী ব্লক লড়াই করছে। তাদের পরস্পরের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য ও আরব দেশগুলো। সেখানে ইন্ধন দিচ্ছে ইসরাইল, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা। তারা একে অপরের মসজিদে হামলা করছে, বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মানুষ হত্যা করছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটানোর জন্য এই মুহূর্তে শিয়া আর সুন্নী ব্লকের এই বিবাদই যথেষ্ট। এই হচ্ছে ধর্মব্যবসা ও দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ইসলামের বিকৃতি সাধনের নেট ফল।

ধর্মব্যবসায়ী সৃষ্টির শিক্ষাব্যবস্থা

আল্লাহর রসুল তেইশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম, কঠোর অধ্যবসায় এবং সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে যে ঐক্যবদ্ধ উম্মাহর (জাতি) উন্মেষ ঘটালেন সে জাতির বিনাশ কোন পথে আসবে তাও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে, "যদি তোমরা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামে বের না হও তাহলে তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের উপরে অন্য জাতি চাপিয়ে দেবেন।"(১)

ধর্মবিশ্বাস ও সত্যের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ জাতির মধ্যে যে দুঃসাহস সৃষ্টি হয় তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তখনই যখন ঐ জাতি অভ্যন্তরীণ বিবাদে লিপ্ত হয়ে নিজেদের ঐক্যকে বিনষ্ট করে ফেলে। এটাও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে যে, "তোমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"(২)

ঐক্য ভঙ্গকে রসুলাল্লাহ (সা.) কুফর বলেছেন।(৩) **জাতির মূল কাজ - পৃথিবীতে সত্য প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক সংগ্রাম পরিত্যাগ করে দীনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার পরিণতিতে জাতি ভেঙ্গে বহু মাজহাব ফেরকায় বিভক্ত হয়ে দুর্বল হয়ে গেল। শাসকরা বিলাস ব্যাসনে শরীর এলিয়ে দিলেন**। ফলে জাতি আর মো'মেন রইল না। ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, ঐ কয়েকশ' বছরে জাতির মধ্যে হাজার হাজার ফকীহ, মুফাসসির-মুহাদ্দিস জন্ম নিলেন, বহু গাউস-কুতুব-পীর-দরবেশ জন্ম নিলেন, বহু ইমাম জন্ম নিলেন। একেকজনের ক্ষুরধার লেখনীতে বিরাট বিরাট ভলিউম ভলিউম বই রচিত হলো। কিন্তু সেই আবু বকর (রা.), ওমর (রা.), আলী (রা.), আবু ওবায়দাহ (রা.), খালেদ (রা.), দেরার (রা.), সা'দ (রা.) মুসান্নাদের (রা.) মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে ত্রাস সৃষ্টিকারী দুর্ধর্ষ যোদ্ধা আর কেউ জন্ম নিল না।

---

১. আল কোর'আন: সুরা তওবা ৩৯।

২. আল কোর'আন: সুরা আনফাল ৪৬।

৩. হাদিস: আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) থেকে মুসলিম, মেশকাত।

আল্লাহর শাস্তি হুট করেই আসে না, তিনি শাস্তি দেওয়ার আগে তাদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসার বহু সুযোগ দেন, অবকাশ দেন। মুসলিমরাও প্রায় ৭০০ থেকে ১১০০ বছর সময় পেল। দুর্দান্ত খরস্রোতা নদী যখন গতি হারিয়ে ফেলে তখন তার পানি দূষিত হয়ে যায়। সংগ্রাম ত্যাগের ফলে জাতির মাথার মধ্যেও পচন ধরেছে। সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে শেষ রসুল (সা.) উম্মতে মোহাম্মদী জাতি গঠন করেছিলেন, সেই কাজের অর্ধেকটা প্রাথমিক যুগের প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী শেষ করে দিয়ে আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। পরবর্তী উম্মাহ সেই দায়িত্ব বহন করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলার দরুন বাকি দুনিয়া শেরক আর কুফরের পদানতই রয়ে গেল। এরই মধ্যে তাদের অভ্যন্তরীণ পচনক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে পতনের কাল আসলো, আল্লাহর শাস্তি শুরু হলো। আল্লাহ সুরা তওবার ৩৯ নম্বর আয়াতে প্রতিশ্রুত কঠিন শাস্তি দিয়ে এ জাতিকে ইউরোপীয় জাতিগুলোর পায়ের তলার গোলামে পরিণত করে দিলেন। তখন তারা অর্থাৎ ইউরোপের খ্রিষ্টানরা আল্লাহর দেয়া সার্বভৌমত্বকে ছুঁড়ে ফেলে তাদের নিজেদের দেশের জন্য তৈরি আল্লাহহীন, বস্তুবাদী জীবনবিধান (দীন), বিভিন্ন রকম তন্ত্রমন্ত্র এ জাতির উপর চাপিয়ে দিল। **আমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের জীবনব্যবস্থা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ঢুকে গেলাম এবং সেখানেই বসে বসে ধর্মচর্চা চালিয়ে যেতে লাগলাম। ব্যক্তিগত ধর্মচর্চায় কে কত নিখুঁত তার প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলাম। ফলে পোশাকে-আশাকে আমরা কে কত নিখুঁত সেটাই এখন উত্তম মুসলমান হওয়ার মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হতে লাগল।** ওদিকে মাথার উপর কার তৈরি দীনের শাসন চলছে, কার সার্বভৌমত্ব, হুকুম, বিধান চলছে, কার তৈরি রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা, দণ্ডবিধি, শিক্ষাব্যবস্থা চলছে সে বিষয়ে মহা মুসলিম, মহা আবেদদের কোনো খবর নেই! তারা ধরেই নিয়েছেন যে মুসলিম পরিবারে জন্ম নিলেই মুসলিম হওয়া যায়। তারপর শুধুমাত্র নামাজ, রোজা করলেই আল্লাহর মো'মেন বান্দা অর্থাৎ উত্তম মুসলিম হয়। তাদের জন্যই জান্নাত তৈরি করা হয়েছে।

ইউরোপের খ্রিষ্টান জাতিগুলো সামরিক শক্তিবলে পৃথিবীর প্রায় সবক'টি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ অধিকার করার পর এরা যাতে আর ভবিষ্যতে কোনোদিন তাদের ঐ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিল। এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ হলো শিক্ষাব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা, কারণ শিক্ষাব্যবস্থা এমন এক বিষয় যে এর মাধ্যমে মানুষকে যা ইচ্ছা তাই করা যায়; চরিত্রবান মানুষও তৈরি করা যায় আবার দুশ্চরিত্র মানুষেও পরিণত করা যায়; কী শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তারই ওপর নির্ভর করে সে কেমন মানুষ হবে। তারা একই সাথে দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করল- একটি সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, আরেকটি মাদ্রাসা শিক্ষা। এই দুটো শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে

আদর্শ ও চেতনায় মৌলিক বৈপরীত্য রয়েছে। এর দ্বারাই তারা আমাদেরকে মানসিকভাবে ও বাস্তবে বিভক্ত করে দিয়েছে। প্রথমেই মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার প্রসঙ্গে আসি। দখলকারী শক্তিগুলো তাদের অধিকৃত মুসলিম দেশগুলোতে মাদ্রাসা স্থাপন করল। উদ্দেশ্য- পদানত মুসলিম জাতিটাকে এমন একটা ইসলাম শিক্ষা দেয়া যাতে তাদের চরিত্র প্রকৃতপক্ষেই একটা পরাধীন দাস জাতির চরিত্রে পরিণত হয়, তারা কোনোদিন তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার চিন্তাও না করে।

খ্রিষ্টানদের মধ্যে Orientalist **(প্রাচ্যবিদ) বলে একটা শিক্ষিত শ্রেণি ছিল ও আছে যারা ইসলামসহ প্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্ম, কৃষ্টি, ইতিহাস ইত্যাদির ওপর গবেষণা করে থাকেন। প্রাচ্যের প্রতিটি বড় ধর্ম ও ভাষাগুলোর উপর, বিশেষ করে আরবি ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদির উপর তারা অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।** (তাদের মতো আরবি জানা পণ্ডিত আমাদের দেশের আলেমদের মধ্যেও খুবই দুর্লভ)। উপনিবেশ পরিচালনা করার জন্য, এ অঞ্চলের মানুষগুলোর বিশ্বাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মানসিকতা বুঝে তাদেরকে মানসিক দাস বানিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত শ্রেণিটির খুব প্রয়োজন ছিল ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের। এদের সাহায্য নিয়ে খ্রিষ্টানরা মাদ্রাসায় শিক্ষা দেবার জন্য তাদের মন মতো Syllabus (কী শিখানো হবে তার তালিকা) ও Curriculum (কী প্রক্রিয়ায় শেখানো হবে) তৈরি করল। তাদের তৈরি সেই 'ইসলাম'-টিকে জাতির মনে-মগজে গেড়ে দেওয়ার জন্য বড়লাট লর্ড ওয়ারেন হেসটিংস ১৭৮০ সনে ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কোলকাতায় আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করল।

মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য কী ছিল তা আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ জনাব ইয়াকুব শরীফ "আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস" বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, "মুসলমানরা ছিল বীরের জাতি, ইংরেজ বেনিয়ারা ছলে-বলে-কৌশলে তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাদের প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা ও মর্যাদা হরণ করার জন্য পদে পদে যেসব ষড়যন্ত্র আরোপ করেছিল, আলিয়া মাদ্রাসা তারই একটি ফসল। বাহ্যত এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন করা হয়েছিল আলাদা জাতি হিসাবে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত, যাতে মুসলমানদের ধর্ম, কৃষ্টি ও আদর্শ রক্ষা পায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়াই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য।"(১) এই যে ধোঁকাটা দিল, কী সে ধোঁকা? মারটা কোন জায়গায় দিল সেটা বুঝতে হবে।

(ক) খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা গবেষণা করে যে বিকৃত ইসলামটি তৈরি করেছিল সেখান থেকে ইসলামের প্রাণ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (তওহীদ) ও উম্মাহর মূল কাজ সত্য প্রতিষ্ঠার জেহাদকে বাদ দেওয়া হলো। মো'মেনের সংজ্ঞায় আল্লাহ ঠিক এই দুটো

---

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস- ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

জিনিসের উল্লেখ করেছেন- তওহীদ ও জেহাদ।⁽¹⁾ কীভাবে ব্যাখ্যা করছি। প্রথমেই এতে কলেমার অর্থ বিকৃতি করা হলো; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র প্রকৃত অর্থ– 'আল্লাহ ছাড়া আদেশদাতা নেই' কে বদলিয়ে করা হলো– 'আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই'। এটা করা হলো এই জন্য যে, আল্লাহকে একমাত্র আদেশদাতা হিসাবে নিলে এ জাতিতো ব্রিটিশদের আদেশ মানবে না, মুসলিম থাকতে হলে আল্লাহর আদেশ মানতে হবে। আর কলেমার মধ্যে 'ইলাহ' শব্দের অর্থ বদলিয়ে যদি উপাস্য বা মা'বুদ শেখানো যায় তবে এ জাতির লোকজন ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর উপাসনা, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, দান-খয়রাত ইত্যাদি নানা উপাসনা করতে থাকবে এবং জাতীয় জীবনে ব্রিটিশ প্রভুদের আদেশ পালন করতে থাকবে; তাদের অধিকার ও শাসন দৃঢ় ও স্থায়ী হবে। এই উদ্দেশ্যে ঐ বিকৃত ইসলামে নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, আত্মার পরিচ্ছন্নতার জন্য নানারকম ঘষামাজা, আধ্যাত্মিক উন্নতির ওপর গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া হলো। কারণ এরা ঐ ইবাদত, উপাসনা নিয়ে যত বেশি ব্যস্ত থাকবে ব্রিটিশরা তত নিরাপদ হবে।

(খ) ব্রিটিশ শাসকরা এই মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার (Syllabus) মধ্যে প্রধানত বিতর্কিত বিষয়গুলোর প্রাধান্য দিল, যেগুলো অনেক আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল বিভিন্ন মাজহাব ফেরকার এমামদের এবং তাদের অনুসারীদের মধ্যে। তাদেরকে শেখানো হলো ব্যক্তিগত জীবনের মাসলা-মাসায়েল, ফতোয়া, দোয়া-কালাম, মিলাদের উর্দু-ফার্সি পদ্য ইত্যাদি যেন এই মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা যেন ঐগুলো নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তর্কাতর্কি, এমনকি মারামারি করতে থাকে, শাসকদের দিকে তাদের দৃষ্টি দেবার সময় না থাকে।

(গ) **খ্রিষ্টান প্রাচ্যবিদদের তৈরি ঐ ইসলামে কোর'আনের গুরুত্ব একেবারে কমিয়ে দিয়ে সেখানে হাদিসের প্রবল প্রাধান্য দেয়া হলো।** কারণ এই যে কোর'আন চৌদ্দশ' বছর আগে যা ছিল আজও ঠিক তাই-ই আছে, এর একটা শব্দ নয় একটা অক্ষরও কেউ বদলাতে বা বাদ দিতে পারে নাই, কারণ এর রক্ষা ব্যবস্থা আল্লাহ তার নিজের হাতে রেখেছেন,⁽²⁾ কিন্তু হাদিস তা নয়। বহু হাদিস মানুষ তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরি করেছে, খেলাফতের পরে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর উমাইয়া, আব্বাসীয়া, ফাতেমী ইত্যাদি খেলাফতের নামে আসলে রাজতন্ত্রের রাজারা তাদের যার যার সিংহাসন রক্ষার জন্য অজস্র মিথ্যা হাদিস তৈরি করে আল্লাহর রসুলের নামে চালিয়েছে। সুন্নীরা তাদের মতবাদের পক্ষে, শিয়ারা তাদের মতবাদের পক্ষে মিথ্যা হাদিস তৈরি করে নিয়েছে যার যার মতবাদকে শক্তিশালী করার জন্য। আরও বিভিন্নভাবে হাদিস বিকৃত হয়েছে। এক ইমাম বোখারী (র.) সাড়ে ছয় লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেছেন। যাচাই বাছাইয়ের পর তিনি সেখান থেকে মাত্র ৬ হাজার

---

১. আল কোর'আন: সুরা হুজরাত ১৫।

২. আল কোর'আন: সুরা হেজর ৯

হাদিসকে সহীহ বলে স্বীকৃতি দিলেন। বাকি ৬ লক্ষ ৪৫ হাজার হাদিস ভুয়া বলে গণ্য হলো। কী সাংঘাতিক বিষয় কল্পনা করা যায়? ইসলামের বিতর্কিত সবগুলো বিষয়ই হাদিসকেন্দ্রিক। মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাসে কোর'আনের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়ে হাদিসের ওপর এত জোর এবং গুরুত্ব দেয়ার উদ্দেশ্য হলো বিতর্ক, বিভেদ শুধু জিইয়ে রাখা নয় ওটাকে শক্তিশালী করা।

(ঘ) তারপর তারা যে কাজটি করলো তা সাংঘাতিক এবং যার ফল সুদূরপ্রসারী। তারা তাদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় তাদের তৈরি করা বিকৃত ইসলামে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করল তাতে মাদ্রাসার শিক্ষা শেষ করে বেরিয়ে এসে তাদের রুজি-রোজগার করে খেয়ে বেঁচে থাকার কোনো কর্মমুখী (Vocational) শিক্ষা দেয়া হলো না। অংক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থ-বিজ্ঞান, জীব-বিদ্যা ইত্যাদির কোনো কিছুই ঐ সব মাদ্রাসার সিলেবাসে (Syllabus) রাখা হলো না। খ্রিষ্টানরা এটা এই উদ্দেশ্যে করল যে, তাদের মাদ্রাসায় শিক্ষিত এই মানুষগুলো যেন ওখান থেকে বেরিয়ে যেয়ে তাদের শেখানো বিকৃত ইসলামটাকে বিক্রি করে পয়সা উপার্জন করা ছাড়া আর কোনো পথে উপার্জন করতে না পারে; কারণ ঐ মানুষগুলোর মধ্য থেকে ব্যতিক্রম হিসাবে যদি কেউ বুঝতে পারে যে তাদের শিক্ষা দেয়া ঐ ইসলামটা প্রকৃতপক্ষে নবীর মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া সত্য ইসলাম নয়, ওটা বিকৃত, তাহলেও যেন সে বাধ্য হয় ওটাকেই বিক্রি করে উপার্জন করতে, কারণ তাকে এমন আর কিছুই শিক্ষা দেয়া হয় নি যে কাজ করে সে টাকা পয়সা উপার্জন করে খেতে পারে। ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ জনসাধারণ ধর্ম সম্বন্ধে জানার জন্য, ফতোয়া নেবার জন্য স্বভাবতই এদের কাছেই যেতে বাধ্য এবং তারা অবশ্যই ব্রিটিশ-খ্রিষ্টানদের তৈরি করা ঐ প্রাণহীন, আত্মাহীন, তওহীদহীন, বিতর্ক-সর্বস্ব ইসলামটাই তাদের শিক্ষা দেবে; এবং এই ভাবেই ঐ বিকৃত ইসলামই সর্বত্র গৃহীত হবে, চালু হবে। খ্রিষ্টানরা তাদের অধিকৃত সমস্ত মুসলিম দেশগুলোতে এই নীতিই কার্যকরী করেছে এবং সর্বত্র তারা একশ' ভাগ (১০০%) সফল হয়েছে।

১৭৮০ সনে কোলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে খ্রিষ্টান শাসকরা এর পরিচালনার ভার অর্পণ করলো মাওলানা মাজদুদ্দীন ওরফে মোল্লা মদন নামক এ দেশীয় একজন মৌলভীর হাতে যিনি খ্রিষ্টানদের বেঁধে দেওয়া শিক্ষাক্রম (Curriculum) অনুযায়ী মুসলমান ছাত্রদেরকে তাদেরই বেঁধে দেওয়া পাঠ্যসূচি (Syllabus) অর্থাৎ ইসলাম শিক্ষা দিবেন। কে এই মাজদুদ্দীন, তিনি কোথা থেকে এসেছেন এ বিষয়ে কোনো প্রামাণ্য তথ্যই পাওয়া যায় না। তথাপি তিনিই হয়ে গেলেন ব্রিটিশ শাসনাধীন মুসলমান জাতির ধর্মশিক্ষার গুরু। কিন্তু এ মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণ তারা সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজেদের হাতে রাখল। তারা অর্ধশতাব্দীর অধিক সময় এ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান চালু রাখল। অর্ধশতাব্দীর পর্যবেক্ষণের পর তারা যখন দেখল যে এ থেকে তাদের আশানুরূপ ফল আসছে না, তখন মুসলিম

বলে পরিচিত এই জাতিটাকে নিজেদের তৈরি বিকৃত ইসলামের মাধ্যমে চিরদিনের জন্য পঙ্গু, অথর্ব করে নিজেদের দুঃশাসনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার এই জঘন্য পরিকল্পনা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেজন্য ১৮৫০ সালে ব্রিটিশ খ্রিষ্টান শাসকরা তাদের প্রতিষ্ঠিত আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ (Principal) পদটিও নিজেদের হাতে নিয়ে নিল। প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন ড. এ.এইচ. স্প্রিঙ্গার এম.এ. (Springer)। তারপর একাধিক্রমে ২৬ জন খ্রিষ্টান ৭৬ বৎসর (১৮৫০-১৯২৭) মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে আসীন থেকে এই মুসলিম জাতিকে ইসলাম শিক্ষা দিলেন।

খ্রিষ্টানদের গোলাম, দাস হবার আগেই আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত ইসলাম বিকৃত হয়ে গিয়েছিল তা না হলে তো আর গোলাম হতে হতো না, কিন্তু ওটার যা কিছু প্রাণ অবশিষ্ট ছিল খ্রিষ্টানদের তৈরি এই ইসলামে তা শেষ হয়ে গেল এবং এটার শুধু কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই রইল না। দীর্ঘ ১৪৬ বছর (১৭৮০ সালে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ৭০ বছর মুসলিম নামধারী মোল্লাদেরকে অধ্যক্ষ পদে রেখে এবং ১৮৫০ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ৭৬ বছর খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা নিজেরা সরাসরি অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থেকে) এ 'ইসলাম' শিক্ষা দেবার পর ব্রিটিশরা যখন নিশ্চিত হলো যে, তাদের তৈরি করা বিকৃত ইসলামটা তারা এ জাতির হাড়-মজ্জায় ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে এবং আর তারা কখনও এটা থেকে বের হতে পারবে না তখন তারা ১৯২৭ সনে তাদের আলিয়া মাদ্রাসা থেকেই শিক্ষিত মাওলানা শামসুল ওলামা কামাল উদ্দিন আহমেদ (এম.এ.আই.আই.এস) এর কাছে অধ্যক্ষ পদটি ছেড়ে দিল। তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত আলিয়া মাদ্রাসার Syllabus ও Curriculum শুধু ঐ মাদ্রাসায় সীমিত না রেখে ব্রিটিশ শাসকরা তা বাধ্যতামূলকভাবে এই উপমহাদেশের সর্বত্র বেশির ভাগ মাদ্রাসায় চালু করল।(১)

যে ২৬ জন খ্রিষ্টান পণ্ডিত অধ্যক্ষ পদে থেকে কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ৭৬ বছর ধরে মুসলিম দাবিদার ছাত্রদেরকে বিকৃত ইসলাম শিখিয়েছেন তাদের তালিকা:

১. এ.এইচ. স্প্রিঙ্গার এম.এ. (১৮৫০)

২. উইলিয়াম ন্যাসলীজ এল.এল.ডি (১৮৭০)

৩. জে. স্যাটক্লিফ এম.এ. (১৮৭৩)

৪. এইচ.এফ. ব্রকম্যান এম.এ. (১৮৭৩)

৫. এ.ই. গাফ এম.এ. (১৮৭৮)

---

১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, মূল- আ. সাত্তার, অনুবাদ- মোস্তফা হারুন, ইসলামী ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ
Ges Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal by Dr. Sekander Ali Ibrahimy (Islami Foundation Bangladesh)

৬. এ.এফ.আর হোর্নেল (C.I.P.H.D (১৮৮১)

৭. এইচ প্রথেরো এম.এ. (অস্থায়ী) (১৮৯০)

৮. এ.এফ. হোর্নেল (১৮৯১)

৯. এফ.জে. রো এম.এ. (১৮৯১)

১০. এ.এফ. হোর্নেল (১৮৯২)

১১. এফ.জে.রো এম.এ. (১৮৯৫)

১২. এ.এফ. হোর্নেল (১৮৯৭)

১৩. এফ.জে.রো (১৮৯৮)

১৪. এফ.সি.হল (বি.এ.টি.এস.সি) (১৮৯৯)

১৫. স্যার অর‍্যাল স্টেইন পি.এইচ.ডি (১৮৯৯)

১৬. এইচ.এ. স্টার্ক বি.এ. (১৯০০)

১৭. লে. কর্ণেল জি.এস.এ. রেঙ্কিং (১৯০০)

১৮. এইচ.এ. স্টার্ক বি.এ. (১৯০১)

১৯. এডওয়ার্ড ডেনিসন রাস (১৯০৩)

২০. এইচ. ই. স্টেপেল্টন (১৯০৩)

২১. এডওয়ার্ড ডেনিসন রাস (১৯০৪)

২২. এম. চীফম্যান (১৯০৭)

২৩. এডওয়ার্ড ডেনিসন রাস (১৯০৮)

২৪. এ.এইচ. হারলি এম.এ. (১৯১১)

২৫. মি.জে.এম. ব্রটামলি বি.এ (১৯২৩)

২৬. এ.এইচ. হার্টি এম.এ. (১৯২৫)

(সূত্র: ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা, বকশীবাজার)

এইখানে এসে আমি একটু থামব এবং চিন্তাশীল ও দৃষ্টিবানদেরকে একটি বিষয় চিন্তা করার অনুরোধ করব। **২৬ জন খ্রিষ্টান পণ্ডিত অধ্যক্ষ পদে থেকে এই জাতিকে কোন ইসলাম শিক্ষা দিল- আল্লাহ-রসুলের ইসলাম? তারা কত শতাব্দী ধরে কতশত যুদ্ধ করে, কত কামান দাগিয়ে ছলে বলে কৌশলে এই জাতিকে পদানত করার পর আবারো কি সেই ইসলাম শিক্ষা দেবে যে ইসলাম শিখে এই**

জাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে? তারা কী শিক্ষা দিয়েছে তা এই জাতির বর্তমান অবস্থার দিকে তাকালে বুঝতে বাকি থাকে না।

যাহোক, যে কথা বলছিলাম, উপমহাদেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান হবার পর ঐ আলিয়া মাদ্রাসা উভয় পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পরও খ্রিষ্টানদের তৈরি বিকৃত ইসলামের সেই পাঠ্যক্রমই চালু থাকে। শুধু ইদানীং সরকার এতে ভোটের প্রয়োজনে হোক, বেকারত্ব দূরীকরণ হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, অংক, ভূগোল, ইংরেজিসহ কিছু বিষয় যোগ করার চেষ্টা করছে তথাপি মাদ্রাসায় শিক্ষিত দাখেল, ফাযেল ও আলেমরা গড়পড়তায় দীন বিক্রী করে খাওয়া ছাড়া আর কিছু করে খাওয়ার যোগ্যতা লাভ করতে পারছেন না।

অর্থাৎ মুসলিম বলে পরিচিত পৃথিবীর জনসংখ্যাটি যাতে কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য খ্রিষ্টানরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে তাদের তৈরি যে প্রাণহীন, আত্মাহীন বিকৃত ইসলামটা ১৪৬ বৎসর ধরে শিক্ষা দিয়েছিল সেই বিকৃত, আত্মাহীন ইসলামটাকেই প্রকৃত ইসলাম মনে করে আমরা প্রাণপণে তা আমাদের জীবনে কার্যকরী করার চেষ্টায় আছি। **আজও অসংখ্য মাদ্রাসা থেকে কোর'আন-হাদিসের জ্ঞান নিয়ে লক্ষ লক্ষ আলেম বেরিয়ে আসছেন কিন্তু তাদেরকে জাতির ঐক্য গঠনের গুরুত্ব, জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করে সত্যদীন প্রতিষ্ঠার প্রেরণা, সমাজে বিরাজমান অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয় নি।** এই ষড়যন্ত্রের পরিণামে তাদের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞানের অহঙ্কার যেমন সৃষ্টি হলো, পাশাপাশি তাদের হৃদয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গতিশীল ভূবন থেকে পিছিয়ে থাকার দরুন একপ্রকার হীনম্মন্যতাও সৃষ্টি হলো। তাদের অন্তর্মুখিতা, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে গোঁড়ামি, বিভক্তি, নিস্পৃহতা, স্বার্থপরতা ও অন্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষের কারণ এই শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াতেই গ্রথিত রয়েছে। এ কারণে আমাদের জাতির মধ্যে লক্ষ লক্ষ আলেম থাকা সত্ত্বেও জাতীয়ভাবে আল্লাহর দেওয়া বিধান কার্যকর নেই এবং সেটা করার প্রচেষ্টাও তাদের মধ্যে নেই।

এই মাদ্রাসারই আরেকটি ভাগ উপমহাদেশে চালু রয়েছে যাকে দেওবন্দী বা কওমী মাদ্রাসা বলা হয়ে থাকে। এদের সিলেবাসও সেই ১৩ শত বছর ধরে চলে আসা বিতর্কসর্বস্ব ইসলামের খুঁটিনাটি মাসলা-মাসায়েল এবং যে দীনের বিধান, হুকুম কোথাও প্রতিষ্ঠিত নেই সেই বিধানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণা দিয়ে পূর্ণ। কিন্তু তাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে, যে বিধান প্রতিষ্ঠিতই নেই, সেই বিধানের ধারা উপধারা মুখস্থ (হেফজ) করা এবং এ বিষয়ে অগাধ জ্ঞান অর্জন করা অর্থহীন। আগে ঐ বিধান জীবন-সম্পদের কোরবানি করে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। সেটা নেই বিধায় এই সব কওমি মাদ্রাসা থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীরাও বেরিয়ে এসে অধিকাংশই কোনো না কোনো ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। দুই চারজন ব্যতিক্রম আছেন যারা

কঠোর পরিশ্রম করে, জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতা অর্জন করে, বা প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরি শিক্ষা নিয়ে ভিন্ন পেশায় বা ব্যবসা বাণিজ্য করে হালাল উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন। **এই ঘরানার মাদ্রাসার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা সেই ব্রিটিশ যুগ থেকেই বিভিন্ন গুরুত্বহীন বিষয়কে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে জাতির সামনে তুলে ধরে, আপামর মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মানুভূতিকে হুজুগ আর গুজবের দ্বারা চাগিয়ে তুলে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন করে আসছে।** এই মাদ্রাসাগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। সেগুলোর ব্যানারে আন্দোলন করে বিভিন্ন সময়ে কথিত তওহীদী জনতার ঈমানী চেতনাকে হাতিয়ার করে বহু ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড, জ্বালাও-পোড়াও, ভাঙচুর, গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা, ধর্ম অবমাননার অজুহাত দাঁড় করিয়ে কোনো দেশ, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনরোষ সৃষ্টি করা হয়েছে। এসবের দ্বারা ইসলামের কতটুকু উপকার হয়েছে তা এসবের ফলাফলই বলে দেয়। তারা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে পাশ করা আলেমদেরকে আলেমই মনে করেন না, আলিয়ার প্রতি অবজ্ঞার ভাব কওমীদের মস্তিষ্কে বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়। ঠিক একইভাবে আলিয়া মাদ্রাসার আলেমরাও কওমী আলেমদেরকে ধর্মান্ধ, গোড়াপন্থী বলেই মনে করেন।

প্রায়ই তারা একটি ঐতিহ্য ও গৌরবের দাবি করে থাকেন যে, দেওবন্দীরা ব্রিটিশ সরকারের অর্থে চালিত হয় নি, বরং ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে তারা জেহাদ করেছেন। তাদের এই দাবি প্রাথমিক পর্যায়ের পুরোধা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সত্য হলেও সামগ্রিক ফল কী হয়েছে সেটা হলো মূল বিবেচ্য। তারা সরকারের থেকে অর্থ না নিয়ে অর্থ গ্রহণ করেছেন সমাজের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের থেকে। সেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা কারা, তাদের আয়ের উৎস কী সেটাও মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ ভালো বলতে পারবেন। তবে আমাদের জানা মতে এরা অধিকাংশই হচ্ছেন সমাজের সেই অংশটি যারা সরকার গঠন করেন, যারা ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি করেন এবং যারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। **সেক্যুলার সরকারগুলো এই মাদ্রাসাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যতবারই তাদের শিক্ষার মধ্যে সংস্কার আনতে চেয়েছে ততবারই তারা কোনো না কোনো ইস্যুকে সামনে এনে সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছে। ফলে সরকারগুলো ধর্ম অবমাননার দায়ে ভোট হারানোর ভয়ে তাদেরকে সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে দিয়ে শান্ত রাখতে বাধ্য হয়েছে।** অর্থাৎ সরকারগুলো তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি এখন পর্যন্তও। ফলে তারা তাদের আলাদা সত্তা, অস্তিত্ব নিয়ে অবস্থান করছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এসব মাদ্রাসা থেকে যে হাজার হাজার লাখ লাখ ওলামায়ে কেরামগণ বের হচ্ছেন তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তওহীদভিত্তিক সত্যদীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কতটুকু করছেন? যদি ইসলাম শিক্ষার ফলে জীবন-সম্পদ উৎসর্গকারী মো'মেনই তৈরি না হয় তাহলে আলাদা সত্তা (Identity) বজায়

রেখে কী লাভ হলো? সেই সরকারি আলিয়ারও যে হাল, কওমিরও সেই একই হাল হয়ে দাঁড়ালো।

এই দুই ধারার পাশাপাশি আরো এক ধরনের মাদ্রাসা আছে যাকে বলা হয় হাফেজিয়া মাদ্রাসা। এখানে পবিত্র কোর'আন শরীফ মুখস্থ করানো হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ এতিমখানাই এখন হাফেজিয়া মাদ্রাসা। এই তিন প্রকার অর্থাৎ (১) সরকারি মাদ্রাসা, (২) কওমি মাদ্রাসা, (৩) হাফেজিয়া মাদ্রাসা - এগুলোর দর্শন, চেতনাগত অবস্থান ও সিলেবাস-কারিকুলামের মধ্যে কিছুটা ব্যবধান থাকলেও দিন শেষে তিনটি ব্যবস্থা থেকেই এমন একটি শ্রেণি সমাজে যুক্ত হচ্ছে যারা ধর্মব্যবসা করেই জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হচ্ছে। জীবিকার স্বার্থে তারা আল্লাহ যে কাজ হারাম করেছেন সেটিকে ফতোয়া দিয়ে হালাল বানিয়ে নিয়েছেন।

এক আল্লাহ, এক রসুল, এক দীন অথচ ইসলামের এমন একটি বিষয় খুঁজে পাওয়া মুশকিল যে বিষয়ে মতবিরোধ নেই। প্রতিটি বিষয় নিয়ে মাসলা মাসায়েল আর ফতোয়ার দুর্বোধ্য জাল সৃষ্টি করেছে এই জনগোষ্ঠীর এমাম, ফকিহ, মুফতি, আলেমগণ। তাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তের সমর্থনে আবার সৃষ্টি হয়েছে সমর্থকগোষ্ঠী বা অনুসারী। এইভাবে বিভক্ত হতে হতে জাতি আজ অসংখ্য মাজহাব, ফেরকা, দল, উপদল, তরিকায় বিভক্ত। এই দলগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে এতটাই শত্রু ভাবাপন্ন যে একদল আরেক দলকে কাফের ফতোয়া দিতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করে না। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ করেন, হত্যা করেন, অন্য দলের উপাসনাগৃহে হামলা করেন। **এই যে ধর্মীয় কোন্দলে মুসলিম নামক জনগোষ্ঠীটি আজ লিপ্ত হয়ে আছে এর বীজ রোপিত হয়েছে ঔপনিবেশিক আমলের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সময়। তাদের** Divide and rule **বা "ঐক্যহীন করে শাসন করো" নামক শাসননীতির একটি অংশ হিসাবে তারা মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাসেই রেখে দিয়েছেন মাজহাব, ফেরকা নিয়ে, দীনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাসলা মাসায়েল নিয়ে তর্ক করার শিক্ষা।** এই বিকৃত ইসলাম যতদিন না এই জাতি ত্যাগ করবে এবং প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ না করবে ততদিন তারা আর ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় (General Education System) দীন সম্পর্কে প্রায় কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয় নি। বরং সুদভিত্তিক অংক, ব্রিটিশ রাজা-রানির ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, পাশ্চাত্যের ধর্মহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা, পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দর্শন ইত্যাদি শিক্ষার পাশাপাশি ধর্ম সম্পর্কে, বিশেষ করে ইসলাম সম্পর্কে একটা বিদ্বেষভাব (A hostile attitude) শিক্ষার্থীদের মনে প্রবেশ করানো হলো। তারা অধিকাংশই আল্লাহকে মনে করেন প্রাচীন যুগের মানুষদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চতুর প্রকৃতির লোকদের তৈরি করা জুজু, আল্লাহর দীনকে মনে করেন সেকেলে, মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা; ধর্মকে মনে করেন কল্পকাহিনী। তাদের দৃষ্টিতে আধুনিক জ্ঞান-

বিজ্ঞানের যুগে ধর্ম অচল। তাদেরকে শেখানো হলো আধুনিক সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পশ্চিমাদের উদ্ভাবন। কিন্তু এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তি যে মুসলিমরাই নির্মাণ করেছিল সেটা তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হলো না। এদের মধ্যে অনেকেই আছে প্রচণ্ড ধর্মবিদ্বেষী অথচ মুসলিম পরিবারে তাদের জন্ম। এর মূল কারণ যে বস্তুবাদী ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা, এ বিষয়টি এখন আমাদের সবাইকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে। দুর্ভাগ্য আমাদের জাতির, কারণ আমাদের ধর্মীয় জীবন পরিচালিত হচ্ছে কিছু ব্যক্তিগত আমল করে আর জাতীয় জীবন পরিচালিত হচ্ছে পাশ্চাত্য প্রবর্তিত জীবনব্যবস্থা বা System দিয়ে।

সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আবার বেশ কয়েকটি ভাগ আছে যেমন বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। বাংলা মাধ্যমে কিছুটা বাঙালি চেতনার সংযোগ থাকলেও শিক্ষার মূল লক্ষ্য সেই ঔপনিবেশিক যুগের থেকে যেটা চলে আসছে সেটারই ধারাবাহিকতা বহন করে চলছে। আর ইংরেজি মাধ্যমে বাঙালিয়ানার ছিটেফোটাও থাকছে না, সেখানে শিক্ষার্থীদেরকে ভাষায়, চিন্তায়, চলনে-বলনে পুরোদস্তুর ইউরোপীয় হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এরা না বাঙালি, না মুসলমান, না ইউরোপীয়। এই যে একেক ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে একেক মানসিকতার মানুষ বের হচ্ছে, তারা কেউই কিন্তু জাতির সামগ্রিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানে না, ফলে তাদের কারো মধ্যেই কোনো জাত্যবোধ তৈরি হয় না। ওখান থেকে লক্ষ লক্ষ কথিত আধুনিক শিক্ষিত লোক বের হচ্ছেন যারা চরম আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। তাদের না আছে দেশপ্রেম, না আছে ঈমানী চেতনা। নিজেদের বৈষয়িক উন্নতি ছাড়া আর কিছুই তারা ভাবেন না। এটা বিতর্কের বিষয় নয়, এটা চলমান শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক ফল। যারা দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা জোঁকের মতো শুষে নিয়ে বিদেশে পাচার করেন তারা এই শিক্ষিত শ্রেণিরই লোক, যে ঘৃণিত কাজটি এককালে ইউরোপীয়রা করত। সামান্য স্বার্থের জন্য প্রয়োজনে সমগ্র দেশ বিক্রি করে দিতে, বৈদেশিক আগ্রাসনের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিতে তাদের বুক এতটুকুও কাঁপে না। এদের হাতেই ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস আদালত, প্রশাসন, এদের হাতেই গণমাধ্যম, শিক্ষা, চিকিৎসা, রাজনীতি, বিচারব্যবস্থা এক কথায় সবকিছুই। সর্বক্ষেত্রে আজ যে ভয়াবহ নৈরাজ্য, যে দুর্নীতির মহোৎসব চলছে সেটা এই শিক্ষিত জনগোষ্ঠীরই অবদান। দুইচার জন ভালোমানুষ যদি থেকেও থাকেন সেটা কোটি কোটি অসতের ভিড়ে ব্যতিক্রমমাত্র।

আমাদের এই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের বড় একটি শ্রেণি, বিশেষ করে তরুণ-যুবকেরা যারা ব্যক্তিগতভাবে ধর্মবিশ্বাসী হলেও তারা ধর্মব্যবসায়ীদের কূপমণ্ডূকতা দেখে ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ধর্মকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন, কালে ভদ্রে দু'একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে দায় সারেন। ধর্মীয় অঙ্গনের পথ তারা খুব একটা মাড়ান না, ধর্মের রাস্তাটির কর্তৃত্ব ধর্মব্যবসায়ীদের হাতেই তারা

ছেড়ে দিয়েছেন। প্রয়োজন পড়লে কিছু টাকা দিয়ে তাদেরকে ভাড়া করে আনেন, আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে সসম্মানে বিদায় করে দেন। মনে মনে তারা এদেরকে দারুণ সমীহ করেন এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখেন যেন ধর্ম নিয়ে ধর্মের ধ্বজাধারীরা কখনোই আমাদের সামষ্টিক জীবনের অঙ্গনে প্রবেশ করতে না পারে। সেই অঙ্গনগুলোর উপর যেন ধর্মহীনদের নিয়ন্ত্রণ অটুট থাকে।

কিন্তু এভাবে কেবল এড়িয়ে চললেই পরিণতি এড়ানো যাবে না, কারণ পরিণতি গোটা জাতিকেই ভোগ করতে হয়। এই ধর্মের অপব্যবহারের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা শিক্ষিতদেরও ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব। এই ধর্মব্যবসাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বৃহত্তর অশিক্ষিত জনগণ যেমন দায়ী তেমনি দায়ী ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ সাধরণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষগুলোও। কারণ **"আমরা ধর্ম সম্পর্কে ভালো জানি না" - এমন একটি মুখস্থ কথা বলে তারা ধর্মবিশ্বাসের বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ও চেতনাময় ক্ষেত্রটিকে ধর্মব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন, আর ধর্মব্যবসায়ীরা সেটাকে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করে মানবতার অকল্যাণ সাধন করছে, মানুষকে প্রতারণা করছে।** তারা বিকৃত ধর্মগুলোকে লালন করছেন নিছক অর্থ উপার্জনের জন্য। ধর্মব্যবসা এমন এক জঘন্য অপরাধ যার দ্বারা বিশ্বাসী মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাদের এত নামাজ-রোজা, হজ্ব, যাকাত, জিকির-আজকার কোনো কিছুরই কোনো প্রতিদান তারা আল্লাহর কাছ থেকে পাবে না। **কেননা বিকৃত ধর্মটি জাল নোটের মতো, দেখতে প্রায় একই রকম হলেও অবৈধ, পরীক্ষার সম্মুখীন হলেই তা বাজেয়াপ্ত করা হবে।**

তাহলে দেখা যাচ্ছে- একদিকে ইসলামের মূল চেতনাবিহীন আচারসর্বস্ব ধর্মীয় শিক্ষা অপরদিকে একেবারে ধর্মহীন পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণার একটি সাধারণ শিক্ষা। এই দুই বিপরীত চেতনায় শিক্ষিত দুটো শ্রেণির আক্রমণ পাল্টা আক্রমণের মাঝখানে পড়ে বিশাল সংখ্যক ধর্মবিশ্বাসী সাধারণ মানুষ আজ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। এই দুটো চেতনার সংঘর্ষে আমাদের সমাজ, দেশ ও জাতি প্রায়ই অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মধ্যে পতিত হয়। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের রাস্তা একটাই, সেটা হলো- এমন একটা ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করা যেটা একাধারে দেহ-আত্মা, দুনিয়া-আখেরাতের সমস্যার সমাধান করবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আরবি শিক্ষার গুরুত্ব

শিক্ষা একটা ব্যবস্থা বা সিস্টেম, আর ব্যবস্থা বিষয়টিই হলো সামষ্টিক। ব্যক্তি প্রকৃতিগতভাবেই জ্ঞান অর্জন করে, সে প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নেয়, মানুষ থেকেও নেয়। সে নিজেকে জানার জন্য, স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টির রহস্য জানার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করে, জীবিকার প্রয়োজনেও শিক্ষা গ্রহণ করে। প্রশ্ন হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব কী?

যখন মানুষ একা থাকে তখন তার জন্য বিধি-বিধানের প্রয়োজন তেমন হয় না। কিন্তু যখনই সামষ্টিকভাবে বসবাসের প্রশ্ন আসে তখনই প্রয়োজন হয় বিভিন্ন বিধি-বিধানের যেন প্রত্যেকে ন্যায়পূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে। মানুষ যখন সমাজবদ্ধভাবে বাস করতে লাগলো তখন একটি ভূখণ্ডে বিভিন্ন প্রকার সমাজের উন্মেষ ঘটল। সেই সমাজগুলোকে সামগ্রিকভাবে একটি অভিন্ন নীতি দিয়ে পরিচালনা করার জন্য বৃহত্তর সংগঠন গড়ে তোলা হলো, সেটা হচ্ছে আজকের রাষ্ট্রকাঠামো। রাষ্ট্রের একটি লক্ষ্য থাকতেই হবে অর্থাৎ রাষ্ট্র কী অর্জন করবে, কী হাসিল করবে? সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র তার নাগরিকদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়।

জাতির শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সাধারণত দুটো ভাগ থেকে থাকে। একটি হচ্ছে রাষ্ট্র তার লক্ষ্যের প্রয়োজনে নাগরিকদেরকে শিক্ষিত করে তুলবে। এর ব্যয় বহন রাষ্ট্রই করে। অপরটি হচ্ছে ব্যক্তি তার নিজ প্রয়োজনে শিক্ষা অর্জন করবে; অবশ্য এটিও সমষ্টিকে সহযোগিতা করার জন্যই রাষ্ট্রের লক্ষ্যের পরিপূরক হিসাবে করবে, রাষ্ট্রের স্বার্থের বিপরীতে করবে না। যে শিক্ষায় রাষ্ট্রের কোনো স্বার্থ নেই সেখানে রাষ্ট্র কোনো বিনিয়োগ করবে না, সেখানে কিছু দান-অনুদান দেবেও না, সেখান থেকে কিছু আয় গ্রহণও করবে না। কেননা রাষ্ট্র যে ব্যয় করে থাকে, সে অর্থের মালিক মূলত জনগণ। জ্ঞান কোনো পণ্য নয়, এটি অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের মতো আল্লাহর একটি নেয়ামত বা দান। যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করবেন তিনি মানবতার কল্যাণার্থে সেই জ্ঞানকে ব্যবহার করবেন, জ্ঞানার্থীকে দান করবেন। এখানে বৈষয়িক লেনদেন মুখ্য থাকে না।

তবে রাষ্ট্র তার প্রয়োজনের অনুকূলে প্রয়োজনীয় বিভাগের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করবে। কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের যদি ব্যাপক ডাক্তারের দরকার হয় ডাক্তার তৈরি করবে, যদি প্রকৌশলীর প্রয়োজন হয় তাহলে প্রকৌশলী তৈরি করবে, যদি জাতির সামনে যুদ্ধের পরিস্থিতি আসে তখন সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতিকে সামরিক শিক্ষায় পারদর্শী করে তুলবে। এটাই স্বাভাবিক। এখন ধরুন একটি দেশের সীমান্ত শত্রুসেনারা ঘিরে আছে, যে কোনো মুহূর্তে হামলা চালিয়ে পুরো জাতিটাকে বিনাশ করে দিতে পারে, সে সময় ঐ দেশের নাগরিকদেকে সামরিক নিয়ম-কানুন ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে না তুলে অন্য কোনো দেশের ভাষা শিক্ষা দিতে থাকে আর ঘরে ঘরে ভাষাবিদ গড়ে তুলতে থাকে তখন বিষয়টা কেমন হাস্যকর ও আত্মঘাতী হবে?

এই নিরীখে মুসলমানদের সামনে এখন বড় সংকট কী? তাদের শিক্ষাব্যবস্থাটাও হতে হবে সেই সংকটের সমাধানকল্পে। তাদের আলেম-ওলামা, সাংবাদিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী সবাইকে সেই সংকটকে উপলব্ধি করেই জাতিকে সে সংকট সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এখানে অতি আবেগের কোনো স্থান নেই, কারণ আমরা একটি কঠোর বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সেটা হচ্ছে, সমগ্র মুসলিম বিশ্ব এখন সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর টার্গেটে পরিণত হয়েছে। জঙ্গিবাদসহ নানা ইস্যুকে কেন্দ্র করে মুসলিম প্রধান দেশগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে, অনেক মুসলিম সংখ্যালঘু দেশে তাদেরকে পৈশাচিক নির্যাতন করে, গণহত্যা চালিয়ে, নারীদেরকে ধর্ষণ করে, শিশুদেরকে খুন করে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। জাতিসংঘের গণনা মোতাবেক বর্তমানে প্রায় সাত কোটি উদ্বাস্তু আছে মুসলমান। প্রত্যেকটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে চলছে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, নানামুখী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, মাদক, দুর্নীতিসহ যাবতীয় অপরাধের ভয়াবহ মহামারী। আমাদের দেশটিকে নিয়েও দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্র চলমান আছে, কারণ এ দেশের ৯০% মানুষই মুসলমান। পশ্চিমাদের তৈরি বিভিন্ন বাদ-মতবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা স্বার্থবাদী রাজনীতিকদের সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ রাজনীতিক সংঘাত, জঙ্গিবাদের প্রচার ও প্রসার আমাদের দেশেও একটা ঝুঁকিপূর্ণ মাত্রায় পৌঁছে গেছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এই সংকট মোকাবেলায় আমাদের নাগরিকদেরকে রাষ্ট্র কী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবে। কোন্ শিক্ষা দিলে তারা দল-মত, ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে জঙ্গিবাদ, অপরাজনীতি, ধর্মব্যবসা, মাদকব্যবসা, সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রসহ সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইস্পাতকঠিন ঐক্যবদ্ধ হবে, প্রতিবাদী হবে, দুঃসাহসী হবে সেটা বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, ঐক্য, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলাবোধ, ত্যাগের মানসিকতা, আমানতদারী, আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি হয় না

এমন শিক্ষা জাতিকে প্রদান করা আর না করা সমান কথা। এতে শুধু শ্রম, অর্থ ও সমায়ের অপচয় ঘটে। এই কথা সাধারণ ও মাদ্রাসা উভয় শিক্ষাব্যবস্থার জন্যই প্রযোজ্য।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের রাষ্ট্রের কী শ্রেণির শিক্ষিত মানুষ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা জানার জন্য সর্বাগ্রে জানতে হবে আমাদের রাষ্ট্রের লক্ষ্যটি কী, আমাদের জাতীয় লক্ষ্য কী? দুঃখের বিষয় হলো আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের জাতির লক্ষ্যটি ঠিক মতো নির্ধারণ করতে পারি নি, আমাদের জাতির কোটি কোটি সদস্যকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে তাদের কাছ থেকে হাজার হাজার রকমের উত্তর আসবে। অধিকাংশ মানুষ প্রথমে এই প্রশ্নটিই বুঝতে পারবেন না, অর্থাৎ জাতির কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকতে পারে, সেটাও তারা জানেন না। যাহোক, রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করে থাকেন তারা অবশ্যই জানবেন- রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কী। পশ্চিমারা সহস্রাব্দের লক্ষ্য (Millennium Goal) নির্ধারণ করেছে বহু আগেই, আমাদের Goal কী?

একাত্তরে আমাদের লক্ষ্য ছিল যুদ্ধ করা, তাই তরুণ-যুবক সবাইকে যুদ্ধের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, বক্তৃতা, গান, নাটক, পত্রিকা ইত্যাদি মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সে সময় আমরা একটি লক্ষ্য নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিলাম, সেই লক্ষ্য ছিল শোষণ, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত একটি সুখী সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ঐক্যবদ্ধ একজাতি একদেশ গড়ে তোলা। সেখানে সবার রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, ধর্মমত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত হবে। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু এ লক্ষ্য নিয়ে জাতির শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, প্রশাসনিক কাঠামো আজও সাজানো হয় নি। সেই কাঠামোগুলো ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক যুগের কাঠামোকে অনুকরণ করে গড়ে তোলা হয়েছে মাত্র। এই বিষয়ে আশা করি কেউ দ্বিমত করতে পারবেন না। নকল করাটাই যখন জাতির উদ্দেশ্য তখন আর ভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ করে কী হবে? ব্রিটিশদের প্রয়োজন ছিল ভারতীয়দের মধ্য থেকে সরকারি কাজকর্ম করার জন্য আজ্ঞাবাহী কেরাণি শ্রেণি তৈরি করা। তারা সেই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা সাজিয়েছিল। যে শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য, সেই শিক্ষা একটি স্বাধীন দেশের জন্য কখনোই উপযোগী হতে পারে না, এ জ্ঞানটুকুও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তাই আজ পুঁথিগত শিক্ষার সাথে বাস্তব জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা শিখি বিজ্ঞান, কাজ করি মার্কেটিং-এ, আরবির মহাপণ্ডিত ক্রীড়া দফতরে চাকরি করেন, কেমিস্ট্রির অনার্স-মাস্টার্স ব্যাংকের হিসাবরক্ষক। আরো বহু বিষয়ের নাম না-ই বললাম যেগুলো আমাদের বাস্তব জীবনে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু সেগুলো শিখেই শিক্ষাজীবন পার করে লক্ষ লক্ষ বেকার তরুণ তরুণী বেরিয়ে আসছেন কলেজ বিশ্ববিদ্যাল থেকে। তারা

দুর্বহ বোঝা হয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের ঘাড়ে চেপে বসছে। এভাবে ব্রিটিশের চাপানো শিক্ষাব্যবস্থার জোয়াল বয়ে চলেছি কলুর বলদের মতো।

সম্প্রতি পত্রিকায় এসেছে বাংলাদেশের প্রতি সাড়ে ছয় হাজার জনের বিপরীতে একজন নিবন্ধিত ডাক্তার রয়েছেন যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। সুতরাং এখন স্বভাবতই সরকারের করণীয় হলো প্রচুর মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করে হাজার হাজার রেজিস্টার্ড ডাক্তার তৈরি করা, অত্যাধুনিক হাসাপাতালগুলোতে উন্নত যন্ত্রপাতি বসিয়ে সেগুলোর অপারেটর তৈরি করা। শিক্ষানীতি নির্ধারকদের চিন্তাপদ্ধতি এমনটাই হওয়া উচিত ছিল।

এবার আসা যাক ভাষা শিক্ষার প্রসঙ্গে। ভাষার জন্য কেবল আমাদের জাতিই জীবন দিয়েছে। তাই মাতৃভাষা সবার আগে। তবে মাতৃভাষার পাশাপাশি বিশ্বের নাগরিক হিসাবে পৃথিবীর অন্যান্য বহুল ব্যবহৃত ভাষাও শিক্ষা করা জরুরি, সেটা ধর্মীয় কারণে হোক বা ব্যক্তিগত কারণে হোক, জ্ঞান-অর্জন, ব্যবসায়িক বা রাজনৈতিক যে কোনোপ্রকার যোগাযোগ করার প্রয়োজনেই হোক। এ অঞ্চলে এক সময় ইসলামের আগমন ঘটে আরব থেকে। তখন মুসলমানরা ছিল শাসক, কোর'আন ছিল জীবনবিধান। তাই মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষা, ধর্মীয় প্রশাসনিক ভাষা হিসাবে আরবি ভাষা শেখার প্রয়োজন পড়ে। পরবর্তীতে যখন পারস্য ও আফগান এলাকার শাসকগণ এদেশে আসেন তখন পার্সি, উর্দু ভাষাও এদেশে প্রচলিত হয়। এ ভাষাগুলো তখন ব্যাপকভাবে শেখারও প্রয়োজন অনুভূত হয়। তারপরে যখন এ জাতি ব্রিটিশের পদানত হয়ে যায় তখন ঐসকল ভাষার জায়গা দখল করে নেয় ইংরেজি ভাষা। এখন পরিস্থিতি অন্য। হাজার হাজার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হচ্ছে, অবস্থাসম্পন্ন ও মধ্যবিত্ত ঘরের মেধাবী শিক্ষার্থীরা সবাই ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করছে, কারণ অতি পরিষ্কার। আন্তর্জাতিক কারবার, আইন-আদালত, রাজনীতি-অর্থনীতির ভাষা এখন ইংরেজি। বলা চলে ইংরেজি ভাষা ও সভ্যতার প্রতি আমরা নতজানু হয়ে আছি।

এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন না করে দেশের আনাচে কানাচে মানহীন, নামসর্বস্ব হাজার হাজার মাদ্রাসা বসিয়ে আরবি/ফার্সি/উর্দু ইত্যাদি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। সেখানে তারা কতটুকু আরবি ভাষা শিখছেন, তারা আরবিতে কোনোরকমভাবে এক পৃষ্ঠাও লিখতে পারছেন কিনা বা আরবি কোনো পত্রিকা পড়ে অর্থ বুঝতে পারছেন কিনা, আরবিতে কথা-বার্তা চালাতে পারছেন কিনা সেটাও দেখা হচ্ছে না। আমরা মনে করি, তাদের এই আরবি শিক্ষা দেশ ও জাতির কতটুকু কাজে লাগছে সেটাও ভেবে দেখা দরকার। রাষ্ট্রের নানা কাজে, বাণিজ্যিক সম্পর্ক রক্ষায় দোভাষীর প্রয়োজন পড়ে থাকে, মাদ্রাসা থেকে পাশ করা ছাত্রদের দিয়ে সে প্রয়োজনটুকু পূরণ হয় কিনা তা সংশ্লিষ্টরা বলতে পারবেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, জাতীয় প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যোগাযোগের জন্য

আরবি ভাষা শেখানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পৃথক ভাষাশিক্ষা অনুষদ রাখা হয়েছে। মাদ্রাসায় দীর্ঘকাল পড়াশোনা করার পরও কেন এই বিকল্প ভাষাশিক্ষা অনুষদ প্রয়োজন পড়ছে তাও ভেবে দেখা দরকার।

এ কথাগুলো পড়ে অনেকে হয়তো আমাকে মাদ্রাসাবিদ্বেষী, আলেমবিদ্বেষী তকমা দিয়ে দিবেন কিন্তু আমি অনুরোধ করব আমার বক্তব্যের গভীরে প্রবেশ করার জন্য। আমি কারো বিদ্বেষী না, আমি কেবল জাতির কল্যাণে একটি সঠিক ভারসাম্যযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব পেশ করছি। শাসনব্যবস্থা যখন মুসলমানদের নিজেদের কর্মদোষে ব্রিটিশ ইংরেজদের হাতে চলে গেল তখনই কিন্তু আরবি মার খেয়ে গেল। ইংরেজি হয়ে গেল রুটি রুজির ভাষা, অভিজাত ভাষা, শাসকের ভাষা, আদালতের ভাষা। তারপর থেকে শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের নিমিত্তে সওয়াবের মাধ্যম হিসাবে আরবিকে মর্যাদাহীন অবস্থায় কোনোমতে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। এই যে একটি মহান ভাষা শাসনের আসন থেকে পদচ্যুত হয়ে ব্যক্তিগত ঐচ্ছিক ভাষায় পরিণত হলো, এই পদাবনতি (Demotion) দেখে কোনো মুসলিম ব্যথিত না হয়ে পারে না। আজকে একজন মানুষের নাম আরবিতে রাখাও অনেক ঝক্কি-ঝামেলার বিষয়ে পরিণত হয়েছে, অনেকেই পাসপোর্ট করার সময় আরবি নাম পাল্টে ফেলেন। একটি আন্দোলনের নাম আরবিতে রাখা নিয়ে এ পর্যন্ত কী পরিমাণ অপদস্থ আমাদের হতে হয়েছে সেটা আমরা টের পাচ্ছি। এটা হচ্ছে ব্রিটিশদের কাছে মুসলিমদের পরাজয়ের পরিণতি।

এখানে আরেকটি কথা প্রসঙ্গত বলতে হচ্ছে; যারা "কোর'আন আল্লাহর নাজেল করা কেতাব, কাজেই কোর'আন শিক্ষা করলে সওয়াব হবে, ইসলামের কাজ হবে"- এমন চিন্তা থেকে মাদ্রাসাগুলোতে পড়াশুনা করছেন নিঃসন্দেহে তাদের নিয়ত খুবই মহৎ কিন্তু তাদের প্রতি সবিনয়ে বলতে চাই, কোর'আন হলো আল্লাহর হুকুমসমূহের (আদেশ ও নিষেধ) সমষ্টি। তাই কোর'আনের পণ্ডিত হওয়ার আগে আমাদের কর্তব্য হবে সমগ্র জাতিটিকে আল্লাহর হুকুমের মধ্যে নিয়ে আসা, একটি কথার উপর জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা যে, তারা আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কারো হুকুম মানবে না। তারপরের কাজ হলো জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করে সেই হুকুমগুলোকে সামগ্রিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। জনগণ যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কথার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে তখন তাদেরকে পরিচালনার জন্য আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থাকে কার্যকর করা প্রয়োজন হবে। সেই ব্যবস্থার শিক্ষাগুলো মানুষের জানার জন্য প্রয়োজন পড়বে আরবি ভাষাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। আল্লাহর দেওয়া বিধানগুলোকে জাতীয় জীবনে প্রয়োগ করতে গিয়ে প্রয়োজন পড়বে কিছু আইন বিশারদের, বিশেষজ্ঞের যেন মানুষ আইনের সুবিধাগুলো পেতে পারে, কোনো ক্ষেত্রে যেন ঐ বিধানে প্রদত্ত অধিকারগুলো লঙ্ঘিত না হয়। আইনের সকল ধারা উপধারার (যেগুলোকে আরবি পরিভাষায় মাসলা-মাসায়েল বা ফতোয়া বলা হয়ে থাকে)

ভিত্তি হলো সংবিধান। সেই সংবিধানই যখন বলবৎ নেই তখন ধারা-উপধারার উপর ক্ষুরধার পাণ্ডিত্য অর্জন করা কি অর্থহীন নয়? কাজেই আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠা হলে তখন প্রয়োজন পড়বে তাঁর হুকুমগুলো (কোর'আন) ভালোভাবে বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আরবি জানা লোক তৈরি করা। কিন্তু গোটা জাতিকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য সব শাখা-প্রশাখা থেকে বিমুখ ও বঞ্চিত রেখে সেই সংবিধান যা বাস্তবজীবনে প্রতিষ্ঠিতই নেই সে সংবিধানের বিশেষজ্ঞ (আলেম, মুফতি, শায়েখ, মুফাসসির) বানানো কোনো শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হতে পারে না। আগে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হোক তারপর বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, রেডিও, টেলিভিশন, ফ্যান, ফ্রিজ ইত্যাদি এবং দক্ষ ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে ছোটখাটো টেকনিশিয়ান পর্যন্ত প্রয়োজন পড়বে। তখন তাদের তৈরি করা, প্রশিক্ষিত করা সময়োপযোগী হবে, কাজে লাগবে। যেখানে বিদ্যুতই নেই সেখানে এসব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও এতদ্‌সংক্রান্ত অভিজ্ঞ লোকবল দিয়ে কী লাভ? সব অনর্থক। এই সরল সত্যটি সংশ্লিষ্টরা যত তাড়াতাড়ি বুঝবেন ততই জাতির মঙ্গল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রের লক্ষ্যের সঙ্গে আমাদের বর্তমান বাস্তবের সামাজিক কাঠামোর কোনো মিল নেই। আমরা কীভাবে এখানে এলাম তা পুনরাবৃত্তি হলেও আবারো বলছি। এই ৯০% মুসলমানের দেশটি কয়েক শতাব্দী আগেই পাশ্চাত্যের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। সেই ইউরোপীয় ইংরেজ খ্রিষ্টান জাতিগুলো আমাদেরকে তাদের দেশে প্রচলিত শাসনকাঠামো (আইন-আদালত, শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতিসহ সবকিছু) এ দেশে চালু করে দিয়ে গেছে। এর আগে ইসলামের মূল্যবোধ, দণ্ডবিধি ইত্যাদি এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ইংরেজরা আসার পরে জাতীয় জীবন থেকে ইসলামকে একেবারে বাদ দিয়ে দেওয়া হলো। ফলে সরকারি কাজ করার জন্য আরবি বা ফার্সি ভাষার কোনো প্রয়োজনীয়তা আর রইল না। সেই জায়গাটি দখল করে নিল ইংরেজি। আরবি হয়ে গেল নিছক সুরা কেরাত, দোয়া-কালাম এক কথায় পরকালের ভাষা। পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রকাঠামো আমাদেরকে শান্তি দিতে না পারলেও, আমাদের জীবনের সাথে বিশ্বাসের সাথে খাপ না খেলেও তা জগদ্দল পাথরের মতো আমাদের বুকের উপর আজও চেপে আছে। সেই পাথরটিকে অপসারণ না করে লক্ষ লক্ষ মাদ্রাসা বসিয়ে আমরা আরবি পণ্ডিত বের করছি। অথচ আমাদের উচিত ছিল ফেরকা-মাজহাব সংক্রান্ত সর্বপ্রকার মতভেদ ভুলে জীবনের সর্বস্ব কোরবানি দিয়ে হলেও আগে জাতির বুকে চেপে থাকা এই পাথরটি সরানো। কিন্তু আমাদের আরবিকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই মুখ্য কর্তব্য সম্পর্কে কোনো ধারণাই দেওয়া হয় না। সেখানে ইসলামকে কেবল অক্ষরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। সেই অক্ষরগুলোকে ব্যবহার করে আরবি শিক্ষিতরা বিভিন্নভাবে জীবিকা হাসিল করে যাচ্ছেন।

জানি না বিষয়টা পরিষ্কার করে বোঝাতে পারলাম কি না। আমাদের কথা হলো, একটি মানুষের দেহ যেমন সত্য তেমনি তার আত্মাও সত্য। তার কেবল ইহকাল সত্য নয়, তার পরকালও আছে। জীবনকে খণ্ডিতভাবে ভাবার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং মানুষের এমন একটি জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন যা তার দুই জীবনকেই শান্তিপূর্ণ করবে। শিক্ষাব্যবস্থাও সেই সার্বিক জীবনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই জীবনের শিক্ষাকেও খণ্ডিত করার সুযোগ নেই। জাগতিক জীবনে মানুষ কীভাবে সফলতা ও শান্তি লাভ করবে এটা যেমন তার শিক্ষার অংশ হবে তেমনি পরকালেও সে কীভাবে জান্নাতে যাবে সেটাও তার শিক্ষার মধ্যে সমানভাবে থাকতে হবে। এজন্য তাকে তার স্রষ্টাকে জানতে হবে, স্রষ্টার হুকুম বিধান সম্পর্কে জানতে হবে, তাঁর সৃষ্টির প্রতি তার দায়িত্ব কী, কর্তব্য কী বুঝতে হবে, ভালোমন্দ-ন্যায় অন্যায়ের জ্ঞান তাকে অর্জন করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থা যেন জাতিকে বিভক্ত না করে এবং যেন তা মানুষের বস্তুগত চাহিদা ও আত্মিক প্রয়োজন পূরণ করে সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে। একেক রঙের, একেক ডিজাইনের, একে লক্ষ্যের শিক্ষাব্যবস্থা দিয়ে কখনোই জাতির সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জিত হবে না।

ইহকাল ও পরকাল এই দুইটি জীবনকে একসঙ্গে শান্তিপূর্ণ করার জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা আল্লাহ যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষাভাষী নবী-রসুলগণের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। তাতে মানুষের জাগতিক ও আত্মিক উভয়ক্ষেত্রের সমাধান রয়েছে। শেষ জীবনব্যবস্থাটি এসেছে আরবি ভাষায়, শেষ কেতাবটি নাজেল হয়েছে আরবিতে। যিনি সেটি কার্যকর করেন অর্থাৎ শেষ নবী, তিনিও আরবিতে কথা বলতেন। কাজেই এখন পৃথিবীর যে জনগোষ্ঠীই তাদের জাতীয়, ব্যক্তিগত, সামষ্টিক জীবনে শেষ জীবনব্যবস্থাটি গ্রহণ করে নেবে তাদেরকে অবশ্যই নিজ মাতৃভাষার পাশাপাশি আরবিও জানার প্রয়োজন পড়বে। গত কয়েক শতাব্দী থেকেই আমাদের রাষ্ট্রের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে পাশ্চাত্যের অনুকরণ। সে মোতাবেক আমরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছি, আইন আদালত, চিকিৎসা, ব্যবসাবাণিজ্য, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ইংরেজি না জেনে আমরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজই করতে পারছি না। কাজেই এখন মুসলমানদের মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে ইসলামকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। এখন ঘরে ঘরে আরবি শেখাতে গিয়ে যে পরিমাণ সময় ও শ্রম ব্যয় করা হচ্ছে তার চেয়ে বহু বেশি সময় ও শ্রম ব্যয় করা উচিত জনগণকে এটা বোঝানোর জন্য যে, আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা ছাড়া তাদের জীবনে শান্তি আসবে না। এই কথাটি আমরা বারবার বলছি যেন এর গুরুত্ব বুঝতে কারো অসুবিধা না হয়।

ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া শিক্ষাব্যবস্থা জাতিকে বহুভাগে বিভক্ত করছে। একদিকে চরম বস্তুবাদী ভোগবাদী দর্শন শিক্ষা দেওয়ার জন্য সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা, অপরদিকে

জাগতিক জ্ঞানশূন্য একেবারে পরকালমুখী, সওয়াবমুখী, মাসলা-মাসায়েল নির্ভর মাদ্রাসা শিক্ষা। এই দুই শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছে প্রতিনিয়ত। একই বাবা-মায়ের দুটো সন্তানকে দুটো শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত করা হলে তারা একে অপরের সঙ্গে আর মিশতে পারে না, কোনো বিষয়ে একমত হতে পারে না, একরকম করে ভাবতে পারে না। তাদের চিন্তাচেতনা, সংস্কারবোধ, মূল্যবোধ হয়ে যায় সম্পূর্ণ বিপরীত। নিজেদের পায়ে কুড়াল মারার এই আত্মঘাতী শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসার সময় কি এখনও হয়নি?

এ অধ্যায়টি পড়ে কোনো কোনো পাঠকের মনে এ প্রশ্নটি জাগতে পারে যে, বর্তমান সময়ে আরবি শিক্ষার উপযোগিতা প্রসঙ্গে এ অধ্যায়টি লেখার আসল উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হলো, সমগ্র মানবজাতিকে পরিচালিত করার মতো একটি জীবনব্যবস্থা আরবি ভাষাভাষী মানুষগুলো আমাদের এই ভূখণ্ডসহ অর্ধ দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সময়ের বিবর্তনে সেই জীবনব্যবস্থার ভাষা আরবি শাসনকার্যের জায়গা থেকে বিচ্যুত হতে হতে এখন এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, মুসলিম জাতি সেই জীবনব্যবস্থাটিকেই, ইসলামকেই জাতীয় রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রত্যাখ্যান করে পাশ্চাত্যের জীবনব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। আর আরবি ভাষাটিকে টিকিয়ে রেখেছে দোয়া-কালাম চর্চা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে প্রভাবিত করে ইসলামকে জীবিকার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করার জন্য। আরবি ভাষা ও ইসলামের জন্য এর চেয়ে বড় অমর্যাদাকর আর কিছু হতে পারে না। যতদিন এই অন্ধত্বপূর্ণ প্রথা টিকে থাকবে ততদিন আরবি ভাষা এর চেয়ে উন্নততর অবস্থানে যেতে পারবে না। মানুষ কেবল 'এক অক্ষরে দশ নেকি' হাসিল করাকেই আরবির মাহাত্ম্য বলে জেনে সন্তুষ্ট থাকবে। এর চেয়ে উচ্চতর স্তরে আরবিকে উন্নীত করার চেষ্টাও তারা করবে না, শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও সে লক্ষ্যটি নেই। কিন্তু একটি প্রাকৃতিক সত্য এই যে, সামষ্টিক ও জাতীয় জীবনের চাপে একটা পর্যায়ে এসে মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, রুচি-অভিরুচি, ভাষা, সংস্কৃতি কিছুই তার স্বরূপ ধরে রাখতে পারে না, সমষ্টির সঙ্গে বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য হয়। মানুষ প্রভুর ভাষা, শাসকের ভাষা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে। এ কারণে অতীতের বহু পরাজিত জাতির ভাষা এখন বিলুপ্ত বা মৃতভাষা। বহু ধর্মগ্রন্থের ভাষাও এখন আর মানুষের মুখের ভাষা নেই, সেগুলো কেতাব ও শাস্ত্রের পাতায় সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। আমরা চাই না যে আরবিও সেই পরিণতি বরণ করুক। এর জন্য একটামাত্র পথ আছে, তাহলো আল্লাহর নাজেল করা শেষ জীবনব্যবস্থা দীনুল হক্ব, ইসলামকে মানবজাতির শাসনের জায়গায় নিয়ে যাওয়া। যদি সেটা করা হয় তাহলেই আরবি তার হৃত মর্যাদা ফিরে পাবে, একে আর কৃত্রিম উপায়ে জনগণের করুণার দানে বাঁচিয়ে রাখা লাগবে না।

ধর্মব্যবসার পক্ষে প্রচলিত যুক্তিসমূহ ও তার খণ্ডন

কালের বিবর্তনে এমন একটা সময়ে এসে আমরা উপনীত হয়েছি যখন ধর্মব্যবসা যেন ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। ধর্মের কাজে অর্থের লেনদেন হবে এটাই সর্ব মহলে গৃহীত হয়ে গেছে। যেহেতু যারা ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছেন তাদের অধিকাংশই এর বিনিময় নিচ্ছেন, তাই এই কাজ যে হারাম এ কথাটি কেউ জানতেও পারছে না। আর যারা এটি জানেন তারাও তা বলতে পারছে না। বলতে গেলে প্রবল বিরোধিতা ছাড়াও তাদেরকে বেশ কয়েকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন:

১. তাহলে তারা খাবেন কী? তাদের সংসার চলবে কী করে?

২. ইসলামের খলিফারা তো বায়তুল মাল থেকে ভাতা নিতেন, সুতরাং ইমামতি করে টাকা নেওয়া জায়েজ আছে।

৩. প্রথমদিকে এটা জায়েজ ছিল না, কিন্তু পরে আলেম ওলামারা ইজতেহাদ আর ইজমা-কিয়াস করে বিনিময় গ্রহণকে জায়েজ বলে রায় দিয়েছেন।

৪. এটা তো তারা হাদিয়া, দান বা সম্মানী হিসাবে নেন। রসুলাল্লাহ নিজেও হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং একে অপরকে হাদিয়া দিতেও উৎসাহিত করতেন।

৫. যাকাত আদায়কারী কর্মচারীদেরকে যদি যাকাতের অর্থের একটি অংশ প্রদান করা যায় তাহলে মসজিদের ইমামকে, মুফতিকেও অর্থ প্রদান করা জায়েজ হবে।

৬. পারিশ্রমিক না দিলে ইসলাম যেটুকু আছে সেটুকুও হারিয়ে যাবে। ইসলামের খেদমত করার লোক পাওয়া যাবে না।

তাদের এই যুক্তিগুলো আসলে কতটা ভিত্তিহীন সেটাই আমরা এ অধ্যায়ে আলোচনা করব। প্রথম প্রশ্ন, তারা খাবেন কী করে?

তারা খাবেন কী করে?

বস্তুত তারা কী করে খাবেন তার চেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, এখন তারা কী খাচ্ছেন? আল্লাহর ভাষা অনুযায়ী ধর্মজীবী আলেমরা জাহান্নামের আগুন দিয়ে উদর পূর্তি

করছেন।(১) এখন তারা যদি জাহান্নামের আগুন খেতে না চান তাহলে কী খাবেন? এর জবাব হলো:

১) ধর্মব্যবসা আমরা নিষিদ্ধ করি নি, স্বয়ং আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন। সুতরাং এ প্রশ্নটি আমাদেরকে নয় বরং আল্লাহকেই করা উচিত যিনি এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। শুধু নিষেধই করেন নি, দীনের বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণকারীকে তিনি জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন বলেও ঘোষণা দিয়েছেন। ক্ষুধার তাড়নায় বা যে কোনো কারণে অনন্যোপায় হয়ে কেউ মৃত পশু, শুকরের গোশত খেলেও আল্লাহ ক্ষমা করবেন কিন্তু কোন অবস্থাতেই দীন বিক্রি করে খাওয়া যাবে না।(২) প্রশ্নের বদলে অনেক সময় পাল্টা প্রশ্ন করতে হয়। বলুন তো, সমগ্র সৃষ্টি জাহানকে রেজেক দান করেন কে? সেই মহান রাব্বুল আলামিন যার একটি নাম হচ্ছে রাজ্জাক, অর্থাৎ রেজেকদাতা। **তিনিই কিছু জীবিকাকে হালাল করেছেন, কিছু জীবিকাকে হারাম করেছেন। চুরি, ডাকাতি, ধর্মব্যবসা এগুলোকে তিনি হারাম করেছেন**। ধরুন, দীর্ঘদিনের অপসংস্কৃতি বা ভুল ব্যবস্থার কারণে কোনো এক গ্রামের মানুষ সবাই বংশ পরম্পরায় চুরি-ডাকাতির সাথে জড়িত হয়ে গেল। এটাই এখন তাদের পেশায় পরিণত হয়েছে। এখন যদি কোনো সত্যনিষ্ঠ সংস্কারকামী ব্যক্তি বলেন যে- "চুরি-ডাকাতি বন্ধ করতে হবে", তখনও এমন একটি প্রশ্নই উঠবে যে, "তারা তাহলে খাবে কী করে? আপনি খাওয়াবেন?" এ প্রশ্নটি আপাতভাবে যতই প্রাসঙ্গিক মনে হোক, কোনো বিবেকসম্পন্ন মানুষ নিশ্চয়ই বলবেন না যে, "ঠিক আছে, তারা চুরি ডাকাতিই করুক। আমরাই বরং আইন সংশোধন করে চুরি ডাকাতিকে সম্মানজনক ও বৈধ পেশা হিসাবে স্বীকৃত দিয়ে দিই।" একই কথা সুদের ক্ষেত্রে, ঘুষের ক্ষেত্রে, দুর্নীতির ক্ষেত্রে এবং ধর্মব্যবসার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সুতরাং এই অবৈধ পন্থাগুলো বাদ দিয়ে রেজেক আহরণের অসংখ্য হালাল পন্থা মানুষের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। আল্লাহ যে অবশ্যই রেজেক দান করবেন সেটা তিনি নব্যুয়তির বিরাট দায়িত্ব অর্পণের সময়ও রসুলকে বলে দিয়েছেন, "(হে মোহাম্মদ!) তুমি কি তাদের নিকট কোনো মজুরি চাও? তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই তো শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রেজেকদাতা।"(৩) সুতরাং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল রাখা মো'মেনের ঈমানের অন্যতম শর্ত, গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আর যারা ধর্মের ধারক বাহক, অন্যদেরকে দিনরাত ধর্মের নসিহত করেন তাদের আল্লাহর উপর এইটুকু আস্থা থাকবে এটা কি আমরা আশা করতে পারি না?

২) মাদ্রাসাশিক্ষিত শ্রেণিটির একটি বড় অংশের পেশা মসজিদের ইমামতি করা। 'ইমাম' শব্দের অর্থ নেতা হলেও এই ইমাম সাহেবদের নেতৃত্বের পরিধি নামাজের

---

১. আল কোর'আন: সুরা বাকারা ১৭৪।

২. আল কোর'আন: সুরা বাকারা ১৭৩-১৭৫।

৩. আল কোর'আন: সুরা মো'মেনুন ৭২।

সময়ের ৮/১০ মিনিটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে তারা মসজিদ কমিটির বেতনভুক্ত কর্মচারী মাত্র। আর তারা যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িয়ে টাকা নেন তার যৌক্তিকতা কী? নামাজ পড়াতে ও পড়তে যা জানা আবশ্যক তা ইমাম সাহেব যেমন জানেন, মুসল্লিগণও তা-ই জানেন; ইমামের যতটুকু সময় ব্যয় হয়, মুসল্লীদেরও ততটুকু সময়ই ব্যয় হয়। মুসল্লিদের নামাজ পড়া ফরদ, ইমামেরও তাই। পার্থক্য হলো মুসল্লীদের নামাজের চাওয়া-পাওয়া আল্লাহর কাছে, পক্ষান্তরে ইমামের নামাজের চাওয়া-পাওয়া আল্লাহর কাছে নয়, মুসল্লীদের কাছে, মসজিদ কমিটির কাছে। এটা তার চাকরি, বেতন বন্ধ হলে ইমামতিও বন্ধ! তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য মসজিদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়বেন।

একইভাবে ওয়াজ করে ওয়াজকারী যে সময় ব্যয় করেন-যিনি ওয়াজ শোনেন তিনিও একই সময় ব্যয় করেন। মুসল্লীগণ ও ওয়াজ শুনতে আসা লোকজন কী করে জীবনধারণ করেন? নিশ্চয় তারা সামাজের অন্য সকলের মতো ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প কারখানা, ক্ষেতখামার বা চাকরি-বাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন? তাহলে ইমাম সাহেব বা ওয়াজকারীকে কেন ধর্ম বিক্রি করেই চলতে হবে? মুসল্লী ও শ্রোতারা যদি হালাল রুজি করার সময় বের করতে পারেন তাহলে তিনি কেন পারবেন না?

৩) আল্লাহ বলেছেন, "হে মো'মেনগণ! সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (অর্থাৎ রেজেক) সন্ধান করবে।"(১) ইমাম সাহেবরা কী করে খাবেন এ আয়াতে তারই দিক নির্দেশনা রয়েছে। এখানে আল্লাহ সকল মো'মেনদেরকেই সালাহ শেষে মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে পড়ে হালাল রোজগারের সন্ধানের নির্দেশ দিয়েছেন, মুসল্লীগণ যা করে থাকেন। আল্লাহ এ কথা বলেন নি যে ইমাম সাহেবরা বাদে সবাই জমিনে ছড়িয়ে পড়বে। ইসলাম পরনির্ভরশীলতাকে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা, মেহনত করো সবে।

সুতরাং সকলের জন্যই জীবিকার নির্বাহ আবশ্যকীয়, অলসতার কোনো সুযোগ নেই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় প্রত্যেক নবী-রসুল পরিশ্রম করে রেজেক হাসিল করতেন। আদি পিতা আদম (আ.) কৃষক ছিলেন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল উৎপাদন করতেন। শিশ (আ.) ছিলেন একজন তাঁতি, ইদ্রিস (আ.) ছিলেন দর্জি, নূহ (আ.) ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রি। আল্লাহ তাঁকে জাহাজ নির্মাণও শিক্ষা দিয়েছিলেন। ইয়াকুব (আ.) ছিলেন ভেড়ার রাখাল। ইউসুফ (আ.) ছিলেন একজন ঘড়ি নির্মাতা। হুদ (আ.) ছিলেন ব্যবসায়ী। সালেহ (আ.) ছিলেন উটের রাখাল। ইব্রাহিম (আ.) আলেপ্পোতে দুগ্ধজাত সামগ্রী বিক্রি করতেন। ইসমাইল (আ.) ছিলেন একজন শিকারী। শোয়াইব (আ.) এর ছাগলের খামার ছিল, তিনি দুগ্ধজাত দ্রব্য বিক্রি করতেন। মুসা (আ.) ছাগল চরাতেন। ইলিয়াস (আ.) ছিলেন তাঁতি।

---

১. আল কোর'আন: সুরা জুমা ১০।

দাউদ (আ.) ছিলেন লোহার বর্ম, হাতিয়ার ইত্যাদির নির্মাতা। সোলায়মান (আ.) খেজুর পাতা দিয়ে বাক্স তৈরি করতেন, যদিও তিনি সম্রাট ছিলেন। যাকারিয়া (আ.) ছিলেন করাতি। ঈসা (আ.) ছিলেন কাঠমিস্ত্রি। আর শেষ নবী মোহাম্মদ (সা.) ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। মদীনায় তাঁর নিজের উটের খামার ছিল। তিনি ছাগল ভেড়া ইত্যাদিও পালন করতেন। জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে তিনি কিছুদিন এক ইহুদির কূপ থেকে পানি তুলে দেওয়ার কাজও করেছেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন আল্লাহর রাস্তায় মোজাহেদ। তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক নবীরই নিজ নিজ পেশা ছিল এবং আবার উপার্জনের পথ হচ্ছে জেহাদ।"(১)

সুতরাং নবুয়্যতির গুরুদায়িত্ব পালন করেও যদি নবী-রসুলগণ শ্রমসাধ্য উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন তবে কি আমাদের ওলামায়ে কেরামগণ দীনের কাজে নবী-রসুলদেরও অতিক্রম করে গেছেন? নাউযুবিল্লাহ!

মুফতি শফি (রহ.) লিখেছেন: প্রতিটি শিল্পকর্মের সূচনা হয়েছে ওহির মাধ্যমে।(২) আল্লামা জাহাবি (রহ.) লিখেছেন, মানুষের প্রয়োজনীয় সব ধরনের শিল্পকর্ম ওহির মাধ্যমে বিভিন্ন নবীর পবিত্র হাতে শুরু হয়েছে। তারপর প্রয়োজন অনুসারে যুগে যুগে তার মধ্যে উন্নতি, অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে। শুরুর দিকে আদম (আ.)-এর প্রতি যেসব ওহি অবতীর্ণ করা হয় তার বেশির ভাগ ছিল ভূমি আবাদ ও কৃষিকাজসংক্রান্ত। পরিবহনের জন্য চাকা চালিত গাড়ি আদম (আ.)-ই প্রথম নির্মাণ করেছিলেন।(৩)

লক্ষণীয় যে ধর্মের ব্যাপারে বলা হয়, ধর্ম পরকালমুখী। প্রকৃত সত্য হলো, ধর্ম ইহকাল আর পরকালের সমান ভারসাম্যে পূর্ণ। মানুষ যেমন তার যৌবনকালের কাজের ফল বৃদ্ধকালে ভোগ করে, তেমনি ইহকালের কর্মফল পরকালে ভোগ করবে। যার ইহকাল সুন্দর, তার পরকালও সুন্দর। যার ইহকাল মন্দ, তার পরকালও মন্দ। তাই নবী-রসুলগণ মানুষের ইহকালকে সুখ, শান্তিময় করার জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। যারা তাঁদের সঙ্গে সেই সংগ্রামে একীভূত হয়ে অংশ নিয়েছেন, তাদের পরকাল আপনা-আপনিই সুন্দর হয়ে যাবে। ইসলামে বৈরাগ্যবাদ সম্পূর্ণ হারাম। বৈরাগ্য বৈধ কেবল ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ক্ষেত্রে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পরকালীন জীবনে আল্লাহ তোমাকে যা দান করবেন, তুমি তা অনুসন্ধান করো। কিন্তু পার্থিব জীবনে তোমার ন্যায্য অংশের কথা ভুলে যেও না। ' (সুরা কাসাস ৭৭)

---

১. কিতাবুল মাগাজি, আল ওয়াকিদি।

২. তাফসিরে মা'আরেফুল কোর'আন:মুফতি শফি (রহ.)।

৩. আত-তিব্বুন নববী, আল্লামা জাহাবি (রহ.)।

রসুলাল্লাহ বলেছেন,“হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, জীবিকা নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে চেষ্টা করো এবং তোমাদের প্রচেষ্টার পরিপূর্ণতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করো। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, কোনো মো'মেনের সত্তাকে দুনিয়ায় বেকার এবং অনর্থক সৃষ্টি করা হয় নি। বরং তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কর্ম ও কর্তব্যের সঙ্গে সংযুক্ত। কর্ম ও প্রচেষ্টার জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অল্পে সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার অর্থ এ নয় যে, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা এবং নিজের বোঝা অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া। নিশ্চয়ই আল্লাহর উপর ভরসা করা আমাদের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু রেযেক হাসিল করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা নিতান্তই জরুরি বিষয়।(১) রসুল (সা.) নিজে ও তাঁর সাহাবাগণ আল্লাহর দীন কায়েমের সংগ্রামে নিজেদের শেষ সম্বলটুকু ব্যয় করে নিঃশেষ হয়েছেন, এমন কি নিজেদের জীবনও উৎসর্গ করে গেছেন। তারপরও তাঁরা পরনির্ভরশীল হননি।

সুতরাং আল্লাহ ও রসুলের অসংখ্য নির্দেশকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যারা ধর্মব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছেন সেই ধর্মব্যবসায়ীরা খাবেন কী এই প্রশ্ন করা শুধু অনুচিতই নয় আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচারণও বটে। ইসলামের শরিয়ত মোতাবেক একজন সক্ষম ব্যক্তির জন্য প্রথম ফরজই হচ্ছে নিজ ও নিজ পরিবারের জন্য উপার্জন করা। এটা হতে হবে হালাল পথে। ধর্মের বিনিময় গ্রহণ হালাল উপার্জন নয়। তাই আলেম দাবি করেও যারা ধর্মব্যবসার সঙ্গে জড়িত আছেন তাদের উচিত এই হারাম উপার্জন বন্ধ করা এবং এর বিরুদ্ধে প্রকৃত সত্য প্রচার করা। কেননা তারাই সদাসর্বদা বয়ান করেন যে, ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে হালাল রুজি আর যে শরীর পুষ্ট হয় হারাম উপার্জনের দ্বারা সে শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এটা আল্লাহর রসুলই বলে গেছেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। তিনি শুধু পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন। তিনি মো'মেনদের সেই আদেশই দিয়েছেন, যে আদেশ তিনি দিয়েছিলেন তাঁর রসুলগণকেও। আল্লাহ তা'আলা বলেন,“হে মো'মেনগণ। তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার করো, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রেজেক হিসাবে দান করেছি।” অতঃপর রসুলাল্লাহ (সা.) এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘ সফরে থাকা অবস্থায় এলোমেলো চুল ও ধূলি-ধুসরিত ক্লান্ত-শ্রান্ত বদনে আকাশের দিকে হাত তুলে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে ডাকছে, “হে আমার রব! হে আমার রব!” অথচ সে যা খায় তা হারাম, যা পান করে তা হারাম, যা পরিধান করে তা হারাম এবং হারামের দ্বারাই সে পুষ্টি অর্জন করে। সুতরাং তার প্রার্থনা কীভাবে কবুল হবে?”(২)

---

১. মহানবীর ভাষণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২. আবু হোরায়রা রা. থেকে ইমাম মুসলিম, সহীহ, খণ্ড ৩, পৃ. ৮৫, হাদিস নং ২৩৯৩।

বর্তমান বিশ্বের অর্থব্যবস্থা সুদভিত্তিক হওয়ায় মুসলিম অমুসলিম সবাই সুদে ডুবে আছে। এখন আমরা যদি বলি সুদ বন্ধ করা হোক সুদি প্রতিষ্ঠানে কর্মরতরা প্রতিবাদ করবেন যে, 'তাহলে আমরা খাব কী?' তখন কি সুদকেও কায়দা-কানুন করে হালাল বানিয়ে ফেলার সুযোগ আছে? যারা চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ধোঁকাবাজি করে লোক ঠকিয়ে অন্নসংস্থান করছেন তাদের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। সুতরাং যারা ধর্মব্যবসা করছেন, এটা মনে রাখবেন হারাম খাচ্ছেন, আগুন খাচ্ছেন। আপনাদের ইবাদত-বন্দেগি কিছুই কবুল হবে না।

যে ব্যক্তির বিষয়ে এই প্রশ্নটি উঠবে যে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে নামাজ পড়ালে খাবেন কী করে, সেই ব্যক্তির জন্য শরিয়াহ মোতাবেক ইমামতি করা জরুরি নয়, বৈধও নয়। তার জন্য প্রথম কর্তব্য হচ্ছে রেজেক অন্বেষণ করা। ইমামতি করবেন তিনি যিনি সক্ষম, যিনি পরনির্ভরশীল নন। ইমাম অর্থ নেতা। নেতা পরনির্ভরশীল হলে তার দ্বারা সমাজের নেতৃত্ব প্রদান অসম্ভব। এছাড়া আল্লাহর হুকুম হচ্ছে, "তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের আমিরের আনুগত্য করো"।(১) উম্মতে মোহাম্মদীর একজন সদস্যও কখনও নেতৃত্বহীন অবস্থায় থাকা সম্ভব নয়। দুই জন ব্যক্তিও যদি একত্রে থাকেন তাদের মধ্যে একজন আমির থাকবেন এটা ইসলামের শৃঙ্খলা, বিধি (Discipline)।(২) এখানে কোর'আনে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো "উলিল আমর" অর্থাৎ ঊর্ধ্বতন আদেশদাতা (Immediate Commander), এই আদেশদাতা, আমির একজন সমসাময়িক বিদ্যমান, অস্তিত্বমান মানুষই হতে পারেন যিনি তার অধীনস্থদেরকে আল্লাহ-রসুলের হুকুম মোতাবেক আদেশ নিষেধ করবেন, পরিচালনা করবেন। তিনিই তাঁর অধীনস্থ মুসল্লিদের নামাজের জামাতেও ইমামতি করবেন। তিনি যদি কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকেন তো তাঁর প্রতিনিধি রেখে যাবেন। প্রতিনিধিও যদি কোনো ওয়াক্তে ঘটনাক্রমে অনুপস্থিত থাকেন তখন উপস্থিত মুসল্লিরা তাঁদের মধ্য থেকে উত্তম কাউকে ইমামতি করার দায়িত্ব দিবেন। তাঁর অধীনে সবাই নামাজ সমাপ্ত করবেন। এই ক্ষেত্রে আল্লাহর রসুলের দেওয়া মানদণ্ড হলো, উপস্থিত লোকেদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সালাতের ইমামতি করবে যে আল্লাহর কেতাব সম্পর্কে অধিক অধিক জ্ঞান রাখে। যদি কেতাব সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সমপরিমাণ হয় সেক্ষেত্রে যার সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রয়েছে সে ইমামতি করবে।(৩) মো'মেনরা কোনো ভাবেই আমিরবিহীন থাকতে পারবে না। এটা ইসলামের আকিদা। সেই আমির একাধারে মো'মেনদের সমাজ যেমন পরিচালনা করবেন তেমনি নামাজও পরিচালনা করবেন। বর্তমানে সমাজের

---

১. আল কোর'আন, সুরা নিসা ৫৯

২. হাদিস

৩. আবু মাসুদ আল আনসারী (রা.) থেকে মুসলিম শরীফ, হাদীস নম্বর ১৫৩০

বিত্তশালী সক্ষম মানুষগুলো লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে সমাজের নেতা হন, আর অন্যদিকে নামাজ পড়ানোর জন্য সামান্য বেতনে একজন ইমাম রাখেন। তারপর প্রশ্ন করেন, টাকা না দিলে তারা খাবে কী? এভাবেই ইসলামকে তারা উপহাসের বস্তুতে পরিণত করেছে। **অনেকে এমনও যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশে তিন লক্ষাধিক মসজিদ আছে। ধর্মব্যবসা যদি বন্ধ করা হয় তাহলে এই মসজিদগুলোর ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণ চাকরি হারাবেন। তাই তাদের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য ধর্মব্যবসা বহাল রাখা একেবারে বাধ্যতামূলক।**

মো'মেন কখনও পরনির্ভরশীল থাকতে পারে না। তবু ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রের ফলে আমাদের দেশসহ মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে যখন এমন একটি রেওয়াজ বা প্রথা ধর্মের নামে দাঁড়িয়ে গেছে যে, টাকার বিনিময়ে নামাজ পড়ানো হয়, তখন এই হারাম কর্ম থেকে বাঁচার জন্য একটা কাজ করা যেতে পারে। সেটা হচ্ছে সমাজের সবাই মিলে ইমাম সাহেবকে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে দেবে বা জীবিকার বন্দোবস্ত করে দেবে। সালাতের ওয়াক্ত হলে তিনিও অন্যান্য মুসল্লিদের মতই মসজিদে উপস্থিত হবেন এবং ইমামতি করবেন। কেননা আল্লাহ বলেছেন, "হে মো'মেনগণ! জুম'আর দিনে যখন নামাজের আজান দেয়া হয়, তখন তোমরা দ্রুত আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ।"(১)

যদি কোনো এলাকার মুসল্লিরা চায় দুই-চারজন ব্যক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দেবে সেটা কোনো ব্যাপারই না। কিন্তু আল্লাহর সমস্ত হুকুম অমান্য করে নিজেরা চাঁদা দিয়ে পেশাদার ইমাম নিয়োগ করা কখনওই ইসলামসম্মত নয়।

"তাহলে তারা খাবে কী" - এ প্রশ্নটি যারা করেন তাদের অধিকাংশই এই ধর্মজীবী গোষ্ঠীটির প্রতি করুণায় সিক্ত হয়েই প্রশ্নটি করেন। তাদের এই প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক, তবে প্রকৃত সত্য হচ্ছে, আল্লাহ শুধু শুধু একটি খাদ্যকে বা কাজকে হারাম করেন না। যা মানবজাতির জন্য ক্ষতির কারণ হবে সেটাই তিনি হারাম করেন। যারা এ প্রশ্নটি করেন তারা আসলে জানেন না যে ধর্মব্যবসা মানবজাতির জন্য কতটা ক্ষতিকর। এটি মানবজাতির কত বড় ক্ষতি সাধন করে সেটা যখন কোনো বোধসম্পন্ন মানুষ জানবেন ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন তিনিও এই মহা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়াকে ইবাদত বলে জ্ঞান করবেন।

যুক্তিশীল মানুষদের জন্য উপর্যুক্ত প্রশ্নের বিপরীতে একটি প্রশ্ন পেশ করছি, বলুন তো - "প্রাণঘাতী রোগবাহী জীবাণুদেরকে আমরা কেন প্রতিরোধ বা ধ্বংস করি? তারাও তো জীব।" এর জবাবে নিশ্চয়ই তারা বলবেন, "রোগজীবাণুরা আমাদের

---

১. আল কোর'আন: সুরা জুম'আ ৯।

দেহকে পোষক দেহরূপে ব্যবহার করে আমাদেরই মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।" হ্যাঁ, এই কারণে আমরা রোগজীবাণুদের জীবন ধারণের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলি না? বলি না যে, তাহলে তারা খাবে কী? আর এমন কোনো অন্যায় নেই যা নিবারণ করা আবশ্যক নয়। কোনো ছোট অন্যায়কেও উপেক্ষা করতে নেই, কারণ উপেক্ষার সুযোগে সে নিজেকে বৃদ্ধি করে সর্বগ্রাসী আকার ধারণ করে। তখন আর তাকে উপড়ে ফেলা যায় না। প্রতিটি অন্যায় একেকটি বিষ বৃক্ষের বীজ। আর ধর্মব্যবসা কোনো ছোট অন্যায় নয়। যারা ধর্মের কাজ করে স্বার্থ হাসিল করেন তারাই মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে অপব্যবহার করে সমাজে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। ধর্মের নামে যে পরিমাণ রক্তপাত হয়েছে তেমনটা আর কোনো কারণে হয় নি। এই যে রক্তপাত, এই দাঙ্গাগুলো কারা সৃষ্টি করেন? এই নানা বর্ণের ধর্মব্যবসায়ীরা।

আমরা কেউ চাই না যে, তারা জীবিকাশূন্য হোক। আমরা এটুকু বলি, তারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত নন, প্রতিবন্ধীও নন। কিন্তু ত্রুটিযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে তাদেরকে পরজীবী (Parasite) বানিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা চাই, তাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তারা যেন স্বল্পমূল্যে বিক্রি না করে পরকালের পাথেয় হিসাবে সঞ্চয় করেন এবং রসুল ও তাঁর সাহাবীরা যেমন পরিশ্রম করে উপার্জন করেছেন, ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন তারা তেমন কোনো হালাল পথ খুঁজে নিন। এটা আমাদের সমাজের জন্যই উপকারী হবে। তাহলে তারা আর মসজিদ কমিটির গোলাম হয়ে থাকবেন না, তারা সত্যিই সমাজের মানুষকে কল্যাণকর কাজের নেতৃত্ব প্রদান করতে পারবেন। অন্যায়ের প্রতিবাদও করতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে রসুলাল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস উল্লেখ করতে চাই।

কা'ব ইবনে উজরাহ (রা.) বলেছেন, আমরা নয়জন ব্যক্তি এক জায়গায় অবস্থান করছিলাম। এ সময় রসুলাল্লাহ (সা.) সেখানে আগমন করলেন। তিনি আমাদেরকে বললেন, "নিশ্চয়ই আমার পরবর্তী যুগে অত্যাচারী শাসকদের আবির্ভাব ঘটবে। যারা তাদের মিথ্যাচারকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেবে এবং তাদের নিপীড়নকে, অন্যায় আচরণকে সমর্থন দেবে তারা আমার কেউ নয়, আমিও তাদের কেউ নই। কিন্তু যারা তাদের মিথ্যাচারকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেবে না এবং তাদের নিপীড়নকে, অন্যায় আচরণকে সমর্থন করবে না, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত। তারা জান্নাতে আমার সঙ্গে হাউজে কাউসার থেকে পান করবে।"(১) এ হাদিসটি ভালোভাবে খেয়াল করুন। কাদেরকে রসুলাল্লাহ তাঁর উম্মাহর থেকে বহিষ্কৃত বলে ঘোষণা দিলেন? যারা সমাজের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিবর্গের অন্যায়কে মেনে নেবে তাদেরকে। কারণ ঈমানের ঘোষণার মানেই হচ্ছে সকল শেরক, কুফর, তাগুদের ধ্বজাধারীদের সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া। সেটাই যখন করা হবে না, তখন তার

---

১. সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নম্বর ৪২০৭, ইমাম ইবনে হাজার কর্তৃক সহীহ বলে স্বীকৃত।

সঙ্গে রসুলাল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকে না। তিনি যখন মক্কার সেই সমাজের নেতাদের সামনে এই “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” অর্থাৎ তওহীদের ঘোষণা দিয়েছিলেন তখন যে ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার কারণ এই ঘোষণার দ্বারা সমাজে প্রচলিত কায়েমী স্বার্থবাদীদের সকল অন্যায়ের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছিল। রসুলাল্লাহর সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি সত্য হয়েছিল তাঁর বিদায়ের এক শতাব্দীর মধ্যেই যখন মুসলিম দুনিয়াতে খেলাফতের ছদ্মবেশে রাজতন্ত্র (মুলকিয়াত) কায়েম হয়ে গেল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত গোটা জাতি সকল অন্যায়ের সামনে আত্মসমর্পণ করে আছে। মুসলিমরা পশ্চিমাদের উপনিবেশ হলো, তিনশ বছর দাসত্ব করল, তারপর নামে মাত্র স্বাধীনতা পেলেও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক সর্বপ্রকার দাসত্বকে বরণ করে নিয়েই জীবন কাটাচ্ছে। মুসলিমরা যখন ভিন্ন জীবনব্যবস্থার অনুসারী হয়ে গেল তখন আর তারা কলেমার চুক্তিতে থাকে না, মুসলিম থাকে না, রসুলাল্লাহর জাতি থাকে না। এটাই তিনি বলেছেন যে তারা আমার কেউ নয়, আমিও তাদের কেউ নই। যারাই অন্যায়কে, শেরক-কুফরকে নীরবে সহ্য করে চলে তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মো’মেনই নয়, তারা যত বড় আল্লামা, মোফাসসির, মোহাদ্দিস হোক, পীর মাশায়েখ হোক, লেবাসধারী, ব্যক্তিগত আমলকারী পরজেগার ব্যক্তি হোক না কেন।

ইসলামে নামাজের নেতা আর সমাজের নেতা পৃথক নয়

বর্তমানে আমরা ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া যে দীন বা জীবনব্যবস্থা জাতীয় জীবনে গ্রহণ করে নিয়েছি সেখানে ধর্মীয় জীবনের আনুষ্ঠানিকতা, উপাসনাদি পরিচালনার জন্য একটি পৃথক গোষ্ঠী রয়েছে। তারা একে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন যা আদৌ ইসলাম অনুমোদন করে না। ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান, মসজিদে নামাজের ইমামতি করা ইত্যাদি কার্যাদি কখনো অর্থের বিনিময়ে করা জায়েজ নয়।

ইসলামী বিশ্বকোষ বলছে: “সালাতের ইমামত একটি বৃত্তি বা পেশা নহে, সর্বক্ষেত্রে ইহা যোগ্যতার মানদণ্ডও নহে। তিনি যতক্ষণ সালাত পরিচালনায় নিয়োজিত থাকেন কেবল ততক্ষণই ইমাম থাকেন। আদি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রত্যেক এলাকার উল্লেখযোগ্য শহরের জামে মসজিদে ইমামতের কর্তব্য পালন করতেন খলিফার প্রতিনিধি (ওয়ালি) ও তাঁদের প্রতিনিধিগণ (নায়েব) এবং কেন্দ্রে স্বয়ং খলিফা।”(১)

অর্থাৎ নামাজের ইমাম আর সমাজের ইমাম আলাদা নয়। ফকীহরা এমনও বলেছেন যে, নামাজের ইমামতি করতে অক্ষম ব্যক্তি খলিফা পদেরও যোগ্য থাকেন না। কিন্তু মুসল্লিদের দয়ার দানে বেতনপ্রাপ্ত একজন ইমাম মসজিদে থাকবেন সমাজে

---

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড, পৃ: ১৮০

যার সামান্যও কর্তৃত্ব থাকবে না এমন ব্যবস্থা ইসলামে ছিল না- এটা ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং এটি দীনের মধ্যে সংযোজন বা বে'দাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাহলে প্রশ্ন হলো মুসলমানদের সমাজে ইমাম কে হবেন আর মসজিদগুলোতে ইমামতির ধরনটাই বা কী হবে। এ বিষয়ে কিছুক্ষণ আগেই খানিকটা বলে এসেছি। বিষয়টি বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই আবারও বলছি। এটা বুঝতে হলে আমাদেরকে ইসলামের গোড়ায় যেতে হবে। আমাদেরকে দেখতে হবে রসুলাল্লাহ কী করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন গোত্রে, মতে-পথে বিভক্ত জজিরাতুল আরবের মানুষগুলোকে প্রথমে একটা কথার দিকে আহ্বান করলেন যে তোমরা আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কারো হুকুম মানবে না (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এবং আমাকে তাঁর রসুল হিসাবে মানবে। এই কথাটি যারা স্বীকার করে নিল তাদেরকে নিয়ে একটি নতুন জাতি গড়ে উঠল যাদের জীবনের সর্ব অঙ্গন পরিচালিত হয়েছে আল্লাহর হুকুম দ্বারা এবং যাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন রসুলাল্লাহ স্বয়ং। রসুলাল্লাহই ছিলেন সেই জাতিটির ইমাম, নেতা, পথপ্রদর্শক। জাতি যখন ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হতে লাগল তখন রসুলাল্লাহ বিভিন্ন দূরবর্তী এলাকাগুলোতে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে আমির, প্রশাসক নিয়োগ দিলেন। তাঁরা ঐ সমস্ত এলাকায় রসুলাল্লাহর আদেশ নির্দেশ পৌঁছে দিতেন, পাঞ্জেগানা নামাজ ও জুমার নামাজের ইমামতি করতেন, রসুলাল্লাহর পক্ষ থেকে খোতবা দিতেন, মো'মেনদের মধ্যে কোনো বিবাদ-বিসংবাদ হলে তার মীমাংসা করতেন, আল্লাহর হুকুম মোতাবেক বিচার ফায়সালা করতেন, শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক আসলে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে মদীনায় প্রেরণ করতেন। আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করার ফলে সমস্ত জাতি ছিল প্রাণময়, দুর্বার গতিশীল, দুর্বিনীত, জীবন্ত, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী, শত্রুর মনে ত্রাস সৃষ্টিকারী যোদ্ধা। সমস্ত জায়গায় ছিল শান্তি, সুবিচার, মানবাধিকার, ন্যায়বিচার। তখন সেই মানুষগুলো হলেন আল্লাহর ঘোষণা মোতাবেক মো'মেন এবং উম্মতে মোহাম্মদী। এই মো'মেনদের কোনো খণ্ড খণ্ড জাতিসত্তা ছিল না। তারা ছিলেন এক জাতি। এটাই হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত রূপ। কিন্তু **আজকে আমরা যেটা দেখছি যে বাংলাদেশের মুসলমান, ভারতের মুসলমান, আরবের মুসলমান আলাদা, ইরানের মুসলমান, আফ্রিকার মুসলমান- তাদের কারো সাথে কারো জাগতিক জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই, ইসলামের আকিদা কিন্তু এটা নয়।** আজকে তাদের প্রত্যেক খণ্ডের নেতৃত্ব আলাদা, স্বার্থ আলাদা, জীবনব্যবস্থা আলাদা। এজন্য সমগ্র জাতির কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করাও সম্ভব নয়। ফলে পৃথিবী জোড়া তাদের কপালে জুটছে লাঞ্ছনা, অপমান, দাসত্ব। কাজেই ইসলামে জাতি হবে একটা, তাদের ভূখণ্ডও হবে একটা, তাদের লক্ষ্য থাকবে অভিন্ন, তাদের নেতা, ইমাম হবেন একজন, সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হবে একটি। তিনি আল্লাহর হুকুম দ্বারা পুরো জাতিটাকে পরিচালিত করবেন। তিনি যেমন জাগতিক জীবনের নেতৃত্ব দিবেন তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনেরও নেতৃত্ব দিবেন। কারণ ইসলাম একাধারে মানুষের দেহ-আত্মা এবং দুনিয়া-আখিরাতের পথ নির্দেশ করে। এই জন্য রাষ্ট্রকে যেমন তিনি পরিচালনা করবেন তেমনি তিনি জাতির

সদস্যদের নামাজেরও ইমামতি করবেন। তিনি তার যাবতীয় কার্য নির্বাহের জন্য বিভিন্ন এলাকায় তাঁর পক্ষ থেকে আমির নিযুক্ত করবেন। সেই আমিরগণ ইমামের নির্দেশ মোতাবেক তাঁর অধীনস্থ সকলকে পরিচালনা করবেন, তাদের সমাজের নেতৃত্ব দিবেন, তাদের নামাজেরও নেতৃত্ব দিবেন।

এই নামাজের গুরুত্ব কতটুকু সেটা বোঝা দরকার। আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে অন্তত ৮২ বার নামাজ প্রসঙ্গে বলেছেন। নামাজ হচ্ছে আল্লাহর হুকুমসমূহের উপর জাতি যেন ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে, তারা যেন সুশৃঙ্খল, সময়ানুবর্তী হতে পরে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে পারে, নেতার প্রতি আনুগত্যশীল হতে পারে, ভাই ভাই হতে পারে, সদাসর্বদা আল্লাহর হুকুমের অভিমুখী থাকতে পারে সেটার জন্য এই প্রশিক্ষণ হচ্ছে সালাহ। কাজেই একটা হচ্ছে প্রশিক্ষণ আরেকটা হচ্ছে ময়দানে তার বাস্তবায়ন। নামাজে যেটার প্রশিক্ষণ নেওয়া হবে বাস্তব সমাজে সেটার প্রতিফলন ঘটবে। এজন্যই নামাজকে বলা হয়েছে জেকর। নামাজের সময় যেমন প্রতিক্ষণে আল্লাহকে স্মরণে রেখে ইমামের তাকবিরের সাথে সাথে রুকু সেজদা প্রভৃতি করা হবে তেমনি বাস্তব জীবনেরও প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমকে স্মরণে রেখে মানুষ তার ইমামের হুকুম পালন করে যাবে।

রসুলাল্লাহর কায়েম করে যাওয়া এই সামাজিক কাঠামো যখন পরিবর্তিত হয়ে গেল, ধর্মীয় নেতা ও রাজনৈতিক নেতা পৃথক হয়ে গেল তখন ইসলামের চেহারা পাল্টে গেল। এবং একটা সময়ে জাতির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, আইন বিচার ইত্যাদি চলে গেল ব্রিটিশদের হাতে। আর ধর্ম ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোনোমতে টিকে রইল। দীনের ব্যাপারে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কোনো কর্তৃপক্ষ আর রইল না, দুনিয়াবি সমস্ত নেতৃত্ব (ইমামত) চলে গেল ব্রিটিশদের কব্জায়। ধর্ম যখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে গেল, তখন নামাজও ব্যক্তিগত উপাসনায় পর্যবসিত হলো। তখনই প্রশ্ন এলো যে কে নামাজ পড়াবে, আমির তো নেই, ইমাম তো নেই। যখন জাতি ঐক্যবদ্ধ ছিল, এক ইমামের অধীনে ছিল তখন এই প্রশ্ন ওঠে নি। এই প্রশ্নের সমাধান করার জন্যই সামান্য বেতনের বিনিময়ে একজন পাঞ্জেগানা নামাজের ইমাম নিয়োগ দেওয়ার প্রথা প্রবর্তন করা হলো। সেই থেকে এই প্রথা কায়েম হয়ে গেল, সেখান থেকে জাতি আর উঠতে পারে নি, ওঠার চেষ্টাও করে নি।

এখন এই জাতির মুখ্য কর্তব্য হলো, পাড়া মহল্লার মসজিদের ইমাম নির্ধারণ, নিয়োগ, বেতন নিয়ে চিন্তা না করে আগে জাতির একজন ইমাম (নেতা) নির্ধারণ করা। তাঁর অধীনে তওহীদের ভিত্তিতে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা অর্থাৎ এক জাতি হওয়া। তখন সেই ইমামের সিদ্ধান্তে জাতির প্রত্যেকটি মসজিদে কে ইমামতি করবেন এবং তার সংসার কী করে চলবে এসব প্রশ্নের সমাধান করা হবে। ধর্মজীবিকার পক্ষে কোর'আন হাদিসে কোনো দলিল না পেয়ে মরিয়া হয়ে অনেকে বলে থাকেন, **খলিফাগণও নাকি** পয়সার বিনিময়ে নামাজের ইমামতি করতেন। নাউযুবিল্লাহ! একটি নিকৃষ্ট, হারাম

জীবিকাকে জায়েজ করার জন্য ইসলামের মহান খলিফাদের উপর ডাহা মিথ্যা অপবাদ আরোপ করতেও তাদের বিবেকে বাধে না।

প্রকৃত সত্য হচ্ছে, ইসলামের অধীনে আসা বিরাট ভূখণ্ডের শাসক হিসাবে খলিফাদেরকে রাষ্ট্রের বহু কাজ করতে হতো। আল্লাহর রাস্তায় দানে আবু বকরের (রা.) সমকক্ষ গোটা জাতির মধ্যে কেউ ছিল না। তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে তিনি নিজের সর্বস্ব আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছিলেন। বহু ক্রীতদাসকে তিনি নিজের অর্থে আযাদ করেছেন। সেই আবু বকর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যা আল্লাহ ফরদ করেছেন, সেই নামাজ পড়িয়ে টাকা নেবেন, টাকার বিনিময়ে নিজের আমল বিক্রি করে দেবেন এমন মূর্খতাসুলভ কথা মানুষ কী করে বলতে পারে? আল্লাহর রসুল স্বয়ং প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য বায়তুল মাল থেকে বেতন নির্ধারণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি আরাফাতের ময়দানে বিদায় হজ্বের ভাষণে সমবেত সাহাবীদের উদ্দেশে বলেন, "যাকে আমরা শাসনকার্যে নিযুক্ত করি, আমরা তার ভরণপোষণ করি। এরপরও যদি সে কিছু গ্রহণ করে, তা বিশ্বাসভঙ্গ বা ঘুষ হিসাবে গণ্য হবে। আর ঘুষ মহাপাপ।"(১)

বোখারী শরিফে একটি অধ্যায় আছে যার শিরোনাম হচ্ছে, "প্রশাসক ও প্রশাসনিক কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ভাতা"। রাষ্ট্রে প্রতিনিধিরূপে যারা সমাজ পরিচালনা করেন তারা হচ্ছেন প্রশাসক ও প্রশাসনিক কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ। তাদেরকে ভাতা প্রদানের নির্দেশ আল্লাহর রসুল দিয়েছেন এবং যে কোনো জীবনব্যবস্থাতেই এই নিয়ম থাকা যুক্তিযুক্ত। আল্লাহর কালাম শিক্ষা দেওয়া, মানুষকে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করা, সালাতে ইমামতি করা ইত্যাদি তো প্রশাসনিক কাজ নয়। মো'মেনদের এ সকল কাজের বিনিময় আল্লাহ দিবেন। এক বস্তু যেমন দুই জন ক্রেতার কাছে বিক্রি করা দুর্নীতি তেমনি ধর্মীয় কার্যাদির বিনিময় মুসুল্লিদের কাছ থেকে নেওয়া আবার আল্লাহর কাছেও আশা করা দুর্নীতি। প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন, সবার সমস্যার সমাধান করে থাকেন। তারা সকলের ইমাম বা নেতা। তারা মসজিদে বসেই সমাজের নেতৃত্ব দিবেন এবং সালাতের ওয়াক্ত হলে ইমামতি করবেন- এটাই আল্লাহর রসুল (সা.) ও প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

বৃদ্ধ আবু বকর (রা.) একদিন বিক্রি করার জন্য কাপড়ের গাট্টি মাথায় নিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। তাকে দেখে ওমর (রা.) ছুটে আসেন এবং তাঁকে অনুরোধ করেন বায়তুল মাল থেকে কিছু ভাতা গ্রহণ করার জন্য। তিনি বারংবার সে অনুরোধ অস্বীকার করেন। তখন মো'মেনগণ বলেন যে, "আমীরুল মো'মেনীন। আপনার উপর উম্মাহর দায়িত্ব। আপনি ব্যক্তিগত উপার্জনের জন্য এতটা সময় ও শ্রম ব্যয় করলে জাতি বঞ্চিত হবে।"

---

১. মহানবী (সা.)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

আবু বকর (রা.) পরে এ বিষয়টি জাতির সামনে ব্যাখ্যা করেন, "আমার কাওমের লোকেরা জানে, আমার ব্যবসা আমার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্টই ছিল। কিন্তু এখন খেলাফতের দায়িত্বের কারণে আমি জাতির কাজে ব্যস্ত হয়েছি বলে মুসলিমরা আমাকে বলছে যে আমার পরিবার পরিজনের ব্যয়ভার বায়তুল মাল থেকে নির্ধারিত হবে। তাই সেটা নিতে আমি বাধ্য হচ্ছি।" প্রশাসক হিসাবে ভাতা গ্রহণ আল্লাহর রসুল বৈধ বলে ঘোষণা দিলেও সাহাবীরা চাইতেন জাতির কাজ বিনা পারিশ্রমিকে সেবামূলকভাবে করতে এবং এর বিনিময় আল্লাহর কাছ থেকে গ্রহণ করতে। তাই আবু বকর (রা.) যদিও বাধ্য হয়ে যৎকিঞ্চিৎ ভাতা নিয়েছেন তবু এটা যেন কোনোভাবে দীনের বিনিময় গ্রহণ না হয়ে যায় সেই চিন্তা তাকে সদা-সর্বদা ভাবিত করত।

আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর ইন্তেকালের সময় তখন তাঁর কন্যা আয়েশাকে (রা.) ওসিয়ত করেন, বায়তুল মালের যে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস তাঁর কাছে রয়েছে সেগুলো যেন তাঁর মৃত্যুর পর পরবর্তী খলিফার কাছে হস্তান্তর করা হয়। শুধু তা-ই নয়, তিনি সে পর্যন্ত বায়তুল মাল থেকে যে পরিমাণ অর্থ ভাতাস্বরূপ গ্রহণ করেছেন সমুদয় অর্থ যেন একটি নির্দিষ্ট জমি বিক্রি করে তা বায়তুল মালে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ইন্তেকালের সময় আবু বকরের (রা.) কাছে কোনো দিনার-দিরহাম ছিল না। একটি দুধের উটনী, একটি পেয়ালা, একজন খাদেম, কোনো কোনো বর্ণনায় একটি চাদর ও একটি বিছানার কথাও উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীকালে এ সমস্ত জিনিস যখন ওমরের (রা.) কাছে পৌঁছে তখন তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা আবু বকরের প্রতি রহম করুন। তিনি তাঁর পরবর্তীদেরকে কষ্টে ফেলে গেলেন।'(১)

একবার খলিফা উমরকে (রা.) জিজ্ঞেস করা হলো, "আল্লাহর মাল থেকে আপনি কতটুকু গ্রহণ করা নিজের পক্ষে বৈধ মনে করেন?" তিনি উত্তরে বলেন, "শীত ও গ্রীষ্মের জন্যে দু'খানা কাপড়, হজ্ব-ওমরা করার জন্য সওয়ারি জন্তু এবং আমার পরিবারবর্গের জন্য কোরেশদের কোনো মাঝারি পরিবারের সমমানের খাদ্য। এর পরে আমি সাধারণ মুসলমানের মতই একজন মুসলমান। তারা যা পাবে আমিও তাই পাব।" তিনি এভাবেই জীবন যাপন করতেন। এমন কি কখনও কখনও তিনি নিজের জন্য যা বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন তার ব্যাপারেও অসাধারণ কঠোরতা প্রয়োগ করতেন।(২)

ওমর (রা.) এর জীবনের আরেকটি ঘটনা এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। আবদুল্লাহ্ ইবনু সা'দী (রা.) কোনো একটি অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, 'উমর (রা.)-এর খেলাফতকালে তিনি একবার আমার কাছে আসলেন। তখন 'উমর (রা.) আমাকে বললেন- আমাকে কি এ সম্পর্কে জানানো হয় নি যে তুমি জনগণের অনেক দায়িত্ব পালন করে থাক। কিন্তু যখন তোমাকে এর

---

১. হেকায়াতে সাহাবা- মওলানা যাকারিয়া (র.)।

২. ইসলামের স্বর্ণযুগে সামাজিক ন্যায়নীতি - সাইয়েদ কুতুব শহীদ

পারিশ্রমিক দেয়া হয়, তখন তুমি সেটা নেয়াকে অপছন্দ কর? আমি বললাম, হ্যাঁ। উমর (রা.) বললেন, ‘কী কারণে তুমি এরূপ কর।’ আমি বললাম, ‘আমার অনেক ঘোড়া ও খাদেম আছে এবং আমি ভাল অবস্থায় আছি। কাজেই আমি চাই যে, আমার পারিশ্রমিক সাধারণ মুসলমানদের মাঝে দান করে দেওয়া হোক।’ ‘উমর (রা.) বললেন, ‘এরকম করো না। কেননা, আমিও তোমার মতো এরকম ইচ্ছে পোষণ করতাম। রসুলাল্লাহ (সা.) যখন আমাকে কিছু দিতেন, তখন আমি বলতাম, ‘আমার চেয়ে যার প্রয়োজন বেশি তাকে দিন।’ একবার তিনি আমাকে কিছু মাল দিলেন। আমি বললাম, ‘আমা হতে এ মালের প্রয়োজন যার অধিক তাকে দিন।’ তখন নবী (সা.) বললেন, এটা নিয়ে সম্পদশালী হও এবং সম্পদ বৃদ্ধি করে তা থেকে দান কর। আর এ সম্পদের যা কিছু তোমার নিকট এভাবে আসে, তুমি যার অধিকারী নও বা প্রার্থী নও তা গ্রহণ করো। তা না হলে তার পিছনে নিজেকে নিয়োজিত করো না।(১)

এই হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, বিচারকের বিচারকার্য পরিচালনার পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ। ইমাম ত্ববারী (রহ.) বলেনঃ উমর (রা.) এর হাদিসের মধ্যে মুসলিমদের জাতীয় কর্মকাণ্ডে প্রশাসক কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তি তার ঐ কর্মের পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবে এটা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। যেমন শাসক, বিচারক, কর বা ট্যাক্স আদায়কারী, যাকাত আদায়কারী ইত্যাদি। কারণ রসুল (সা.) উমরকে (রা.) তার এতদসংক্রান্ত কর্মের মজুরি প্রদান করেছিলেন।(২)

আলী (রা.) যখন খলিফা ছিলেন তখনও তাঁর স্ত্রী স্ব-হস্তে গম পিষে রুটি প্রস্তুত করতেন এবং সেটাই তিনি আহার করতেন। একবার তিনি নিজের এক বস্তা গমের উপর বায়তুল মালে জমা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকারি সিল মোহর অঙ্কিত করছিলেন। বললেন, “আমি নিজের পেটে শুধু তাই প্রবেশ করাতে চাই যার হালাল হওয়া সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।” কখনও কখনও এমন অবস্থাও হয়েছে যে, তাঁকে খাদ্য-বস্ত্র খরিদ করার জন্য নিজের তরবারি পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে।

আলী (রা.) নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের ব্যাপারে এরূপ কঠোর দারিদ্র্যের নীতি অবলম্বন করার সময় এ কথা নিশ্চয়ই জানতেন যে, ইসলাম তাকে এর চেয়ে অনেক বেশি গ্রহণের অনুমতি দেয়। ইসলাম কাউকে সর্ব রকমের আরাম আয়েশ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে নিতান্ত সংসারবিরাগীর মতো জীবনযাপন করতে বাধ্য করে না। তিনি জানতেন যে, তখনও একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে বায়তুল মালের ধন-সম্পদে তার যা প্রাপ্য ছিল তার চাইতে তিনি অনেক কম গ্রহণ করছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে জনগণের কাজে সর্বক্ষণ নিয়োজিত শাসক হিসাবে অন্তত ওমর (রা.) বিভিন্ন দেশের প্রশাসকদের (আমির) যেরূপ বেতন নির্ধারণ করতেন সে পরিমাণ

---

১. হাদিসঃ বোখারী শরীফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হাদিস নম্বর ৬৬৭৭।

২. হাদিসঃ ফাতহুল বারী- ইবনে হাজার আসকালানি (র.)

বেতন গ্রহণ করতে পারতেন। ওমর (রা.) কুফার আমির আম্মার ইবনে ইয়াসীর এবং তাঁর সহকারীদের জন্য মাসিক ছ'শ দিরহাম বেতন, দৈনিক একটি ছাগলের অর্ধাংশ ও আধ বস্তা আটা নির্ধারণ করেছিলেন। আলী (রা.) খলিফা হয়েও সে পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করেন নি।

খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ (র.) নিজের জন্য বায়তুল মাল থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করতেন না। তিনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকেও নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে একটি পয়সাও ব্যয় করতেন না। অথচ ওমর (রা.) সেখান থেকে (ফায়) নিজের জন্য দৈনিক দুই দিরহাম নির্ধারণ করেছিলেন। ওমর বিন আব্দুল আজিজকে (র.) ওমর ফারুকের (রা.) সমান গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে তিনি তার জবাবে বলেন, “ওমর ইবনে খাত্তাবের নিকট ব্যক্তিগত সম্পত্তি মোটেই ছিল না- এদিকে আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি যা আছে তাতে আমার বেশ চলে যায়।”

যারা নামাজ পড়িয়ে বেতন নেওয়াসহ ধর্মীয় কাজের বিনিময় গ্রহণকে বৈধতা দিতে এহেন খলিফাদের উদাহরণ দিচ্ছেন তাদের প্রতি কথা হলো, তারা ইসলামিক রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে ভাতা নিতেন, মুসল্লিদের চাঁদা আর পথচারীদের দানের টাকায় সংসার চালাতেন না। তারা যে ভাতা নিতেন সেটা নামাজ পড়ানোর বিনিময়ে নিতেন না, ইসলামের শিক্ষা প্রদানের বিনিময়েও নিতেন না। তারা প্রশাসনিক বহুবিধ কাজ করার দরুন নিজেদের পূর্বের পেশায় সময় দিতে না পারার দরুন নিতেন। যারা ব্যক্তিগতভাবে স্বচ্ছল ছিলেন তারা সেটাও নিতেন না। তারা একাই যে ভাতা নিতেন সেটাও নয়, প্রত্যেক নাগরিক বায়তুল মাল থেকে ভাতা পেত, খলিফারাও রাষ্ট্রের কর্মচারী হিসাবে, নাগরিক হিসাবে সেই ভাতাটাই নিতেন। যারা তাদের উদাহরণ দিচ্ছেন, তাদের প্রতি অনুরোধ, আগে আপনারা নবীর আসহাবদের মতো জীবন-সম্পদ কোরবানি করে, জেহাদ করে আল্লাহর সত্যদীন প্রতি**ষ্ঠা করুন, তাঁদের মতো খলিফা হন, শাসক হন, তারপর রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে ভাতা নিন, তাতে আমাদের বিন্দুমাত্রও আপত্তির কারণ নেই কারণ তখন সেটা যুক্তিযুক্ত ও বৈধ হবে।** মসজিদ কমিটির সদস্যরা অনেক সময় ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সঙ্গে ভৃত্তের মতো আচরণ করেন, যা যে কোনো ইসলামপ্রিয় ব্যক্তিকেই কষ্ট দেবে। ইসলামের নামে চলা এই অসম্মানজনক ব্যবস্থা যে কোনো মোমেনকে ব্যথিত করবেই। তারা অবশ্যই চাইবেন যে, ইমামগণ এই অবমাননার জীবন থেকে বেরিয়ে আসুন, তাদের গৌরব পুনরুদ্ধার হোক।

হাদিয়ার নামে আল্লাহ এবং বান্দা উভয়ের সাথে ধোঁকাবাজি

অনেকে বলে থাকেন, আলেম সাহেবরা এই অর্থ ‘আমলের বিনিময়ে’ নেন না, তারা নেন হাদিয়া হিসাবে। তারাও আসলে নিজেদেরকে নিজেরাই ধোঁকা দিচ্ছেন। কীভাবে ব্যাখ্যা করছি।

বিনিময় ছাড়া কাউকে কোনো জিনিস দেওয়ার নাম উপঢৌকন, উপহার বা হাদিয়া। হাদিয়া বৈধ ও কল্যাণকর একটি বিষয়। আল্লাহর রসুল বলেছেন, “তোমরা পরস্পরে হাদিয়ার আদান-প্রদান করো, তাহলে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।”(১) তিনি আরো বলেন, “তোমরা পরস্পরে হাদিয়া বিনিময় করো। এর দ্বারা অন্তরের সঙ্কীর্ণতা ও হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়ে যায়।”(২) এই দুটো হাদিসেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে হাদিয়া, উপহার এমন একটি বিষয় যার দ্বারা মো’মেনদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, মমত্ব (রুহামা) সৃষ্টি হয়। এটি অবশ্যই কোনোপ্রকার চুক্তিভিত্তিক বিনিময় নয়। ইমামতির জন্য স্পষ্টতই বেতন ধরা হয়। হাদিয়া আর বেতন এক কথা নয়। সেই বেতন তোলা নিয়ে চাঁদাবাজি, কমিটির সদস্যদের মধ্যে বাদানুবাদ, সামাজিক বয়কট থেকে শুরু করে মারামারি, কাটাকাটি, খুনোখুনি পর্যন্ত হওয়ার উদাহরণ রয়েছে। যেমন: ১. হবিগঞ্জে মসজিদ কমিটি নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ২।(৩) মসজিদ কমিটি নিয়ে সংঘর্ষে সাবেক সেনা সদস্য খুন।(৪) এমন সংবাদের উদাহরণ বহু দেওয়া যায়। কাজেই এরকম বাধ্যতামূলক, জবরদস্তিমূলক, চুক্তিকৃত লেনদেনকে হাদিয়া বা উপহার বলা চলে না। সাধারণ মানুষকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যই এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়।

যেটা বলছিলাম, পরস্পরকে হাদিয়া বা উপহার দেওয়া কল্যাণকর কাজ বটে, কিন্তু হাদিয়ার নামে কোনো হারাম বস্তু বা অর্থের লেনদেন জায়েজ নয়, কোনো অন্যায় উদ্দেশ্যে বা অন্যায় কাজে সহযোগিতার জন্য হাদিয়া দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম।(৫) সুতরাং দীনের কোনো কাজের বিনিময়ে অর্থ লেনদেন যখন হারাম তখন তা কোনোভাবেই হাদিয়া হিসাবে প্রদান করা যেতে পারে না।

সমস্ত আমলই নির্ভর করে নিয়তের উপর।(৬) যিনি এই অর্থ প্রদান করছেন তিনি কি এমনিতেই সংশ্লিষ্ট আলেম সাহেবকে ঐ অর্থ প্রদান করতেন? যদি উক্ত ধর্মজীবী আলেম নামাজ না পড়াতেন, মিলাদ না পড়াতেন, ওয়াজ না করতেন তাহলে কি কেউ তাদেরকে উপযাচক হয়ে ‘হাদিয়া’ প্রদান করতে যেত? কখনোই না। সুতরাং এটাই বিনিময়, এটা উপহার হতে পারে না। উপহারের সাথে কোনো শর্ত বা স্বার্থ জড়িয়ে গেলেই তা হয়ে যায় পারিশ্রমিক কিংবা উৎকোচ (ঘুষ)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিনিময় নিয়ে খতম তারাবি সম্পর্কে হজরত মুফতি আজিজুর রহমান (রহ.) বলেন, “বিনিময় গ্রহণ করে কোর’আন শরিফ তেলাওয়াত করা জায়েজ নেই।

---

১. হাদিস: বোখারি, হাদিস নং- ৫৯৪।

২. হাদিস: মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং- ৯২৫০।

৩. bdnews24.com, Published: ১২-০৮-২০১৭

৪. বাংলা ট্রিবিউন, প্রকাশিত: ১৭-০৭-২০১৭

৫. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর মাজমুআ ফাতাওয়া: খ. ২৯, পৃ. ২৫২।

৬. হাদিস: উমর বিন খাত্তাব (রা.) থেকে বোখারি, হাদিস নম্বর ১

যাদের নিয়তে দেওয়া-নেওয়া আছে, তাও বিনিময়ের হুকুমে হবে। এমতাবস্থায় শুধু তারাবি আদায় করাই ভালো। বিনিময়ের কোর'আন তেলাওয়াত না শোনা উত্তম। কিয়ামুল লাইলের সাওয়াব শুধু তারাবি পড়লেই অর্জন হয়ে যাবে।"(১)

সরকারি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বেতন দেওয়া হবে এটা সাধারণ জ্ঞান। যারা যাকাত আদায়কারী তারা সরকারি কর্মচারী। আর উত্তোলিত যাকাত থেকেই উত্তোলনকারীদের অংশ পরিশোধ করা যাকাতের অর্থ ব্যয়ের আটটি খাতের অন্যতম।(২) সেটা পরিশোধ করবে সরকার, কেউ ব্যক্তিগতভাবে তা হাদিয়া হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে না। এর প্রমাণ আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে রসুল (সা.) যাকাত উত্তোলনকারী হিসাবে নিয়োগ দেন। তার নাম ছিল ইবনুল লুতবিয়্যাহ (রা.)। কাজ থেকে ফেরার পর বললেন,"এ হচ্ছে যাকাতের সম্পদ; আর এগুলো আমাকে হাদিয়া হিসাবে দেওয়া হয়েছে।" তখন রসুলাল্লাহ (সা.) মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর বললেন, আমার প্রেরিত কর্মচারীর কী হলো, সে বলে এটা যাকাতের সম্পদ, আর এটা আমি হাদিয়াস্বরূপ পেয়েছি। সে তার বাপ-মা'র ঘরে বসে দেখতে পারে না তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা? আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমাদের কেউ খেয়ানত করলে তা নিজের কাঁধে নিয়েই কেয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে। উট, গরু বা ছাগল যাই হোক সেগুলো আওয়াজ করতে থাকবে। এরপর রসুল (সা.) উভয় হাত উত্তোলন করে দুইবার বললেন,"হে আল্লাহ! আমি পৌঁছে দিয়েছি?"(৩)

অপর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, রসুলাল্লাহ এও বলেছেন, "প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গ হাদিয়া কবুল করলে চুরি বলে গণ্য হবে।" অর্থাৎ হারাম।(৪)

এক ব্যক্তি খলিফা ওমর বিন খাত্তাব (রা.) এর কাছে প্রতিবছর জবাইকৃত উটের পা হাদিয়া পাঠাত। একবার তার বিরুদ্ধে খলিফার দরবারে মামলা দায়ের করা হয়। তখন সে বলল, 'হে আমীরুল মুমিনীন! এমন চূড়ান্ত ফয়সালা প্রদান করুন, ঠিক যেমনভাবে সমস্ত জবাইকৃত উট থেকে পা পৃথক করা হয়।' তখন ওমর (রা.) নিয়মমাফিক বিচার করলেন এবং রায়টি ঐ লোকের বিরুদ্ধে গেল।

এই ঘটনার পর তিনি মুসলিম বিশ্বের সমস্ত প্রশাসক ও কর্মকর্তাদের কাছে এই মর্মে ফরমান পাঠালেন যে, হাদিয়া-উপঢৌকনও ঘুষের অন্তর্ভুক্ত; তোমরা কারো কাছ থেকে উপঢৌকন গ্রহণ করবে না।'[৫]

---

১. ফতোওয়া দারুল উলুম ৪/২৪৬- হজরত মুফতি আজিজুর রহমান (রহ.)

২. আল কোর'আন: সুরা তওবা ৬০।

৩. হাদিস: সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৬৫৭৮, ৮৮৩

৪. হাদিস: মুসনাদে আহমদ: খ. ৫, পৃ. ৪২৪।

৫. ইমাম শা'বী, আখবারুল কুজ্জাত: খ. ১, পৃ. ৫৫-৫৬।

এ হচ্ছে কর আদায়কারী, বিচারক, প্রশাসক তথা সরকারি কর্মচারীদের প্রসঙ্গ। এ ধরনের সরকারি দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের হাদিয়া নেওয়া ও দেওয়া নিষিদ্ধ কারণ এতে করে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। একজন যাকাত আদায়কারী কর্মচারীকে যে মুসলিম হতে হবে এমন বাধ্যবাধকতাও শরিয়তে নেই। সে যে কোনো ধর্মের লোক হতে পারে। কিন্তু দীনের জ্ঞান অপরকে শিক্ষা দেওয়া, মানুষের সামনে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য তুলে ধরা হচ্ছে নবী-রসুলদের দায়িত্ব। যারা নিজেদেরকে ওরাসাতুল আম্বিয়া বা নবীদের উত্তরসূরি বলে দাবি করেন তাদেরও এই একই কাজ। এই কাজ অর্থাৎ জান্নাতের পথ দেখানো, জাহান্নামের পথ থেকে সাবধান করার কাজ করে কোনোরূপ বিনিময় গ্রহণ করাকে আল্লাহ হারাম করেছেন। নবীদের জন্যও হারাম করেছেন, উম্মতের জন্যও হারাম করেছেন। যদি তারা কখনও ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কর আদায়কারী কর্মচারী নিযুক্ত হন তখন আল্লাহ নির্ধারিত বেতন বা অংশ গ্রহণ করবেন, কোনো আপত্তি নেই।

খলিফা ওমর (রা.) কর্তৃক কোর'আনকে স্বার্থের উপকরণ না বানানোর নির্দেশ

কোর'আন বই আকারে লিপিবদ্ধ হয় ওসমান (রা.) এর সময়ে। এর পূর্বে কোর'আন মুখস্থ করাই ছিল শেষ ঐশী গ্রন্থ সংরক্ষণের একমাত্র পথ। তাই খলিফারা কোর'আন মুখস্থ করাকে খুব উৎসাহিত করতেন, কোর'আনে হাফেজদেরকে অত্যন্ত সমাদর করতেন। তাঁদেরকে কোর'আন শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুসলিম ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলসমূহে প্রেরণ করা হতো। এভাবে যাঁদেরকে কোর'আন শিক্ষাদানের দায়িত্ব দিয়ে সরকারিভাবে প্রেরণ করা হতো তাদের খোরপোষের দায়িত্ব সরকারই বহন করত। তারা যেন ব্যক্তিগতভাবে কারো থেকে কোনো হাদিয়া বা বিনিময় গ্রহণ না করেন সে বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হতো। আজকের সময় কোর'আন মুদ্রণযন্ত্রের কল্যাণে ঘরে ঘরে বিরাজ করছে। সারা পৃথিবীতে বহু ভাষায় অনূদিত কোটি কোটি সংখ্যক কোর'আন রয়েছে, তার উপর আছে অডিও রেকর্ড, আছে সফট কপি। এক কথায় কোর'আনের অস্তিত্ব এখন কেবল মুখস্থ করার উপর নির্ভরশীল নয়। আর চূড়ান্ত কথা হলো, কোর'আনের সংরক্ষণ আল্লাহ নিজেই করবেন। তিনি কীভাবে সেটা করবেন, কার মাধ্যমে করবেন সেটাও তাঁরই সিদ্ধান্তের ব্যাপার। বাস্তবক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, আল্লাহ কখনও সেটা হাফেজে কোর'আনদের মাধ্যমে করেছেন, কখনও করেছেন ছাপার অক্ষরের মাধ্যমে, কখনও করছেন আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে।

যখন কোর'আনের কোনো লিখিত কপি ছিল না তখন কোর'আন মুখস্থ করার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করা হতো। খলিফা ওমরের (রা.) এর শাসনামলে কোর'আনে হাফেজদেরকে কখনও কখনও সরকারিভাবে পুরস্কৃত করা হতো। ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। যখন ইসলামের ভূখণ্ডের পরিধি বাড়তে লাগলো তখন স্বভাবতই জাতিও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগলো। কেননা ইসলামের নীতি হলো সম্পদ পুঞ্জিভূত করা যাবে না। নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত

সম্পদ দান করে দিতে হবে। যখনই কোনো যুদ্ধলব্ধ সম্পদ শাসকের কাছে আসতো তিনি দ্রুততম সময়ের মধ্যে দরিদ্রদের মধ্যে, সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের মধ্যে বিলি-বণ্টন করে দিতেন। রসুলের যারা আসহাব ছিলেন তাদেরকেও ভাতা দেওয়া হতো। এভাবে কোর'আনে হাফেজদেরকেও পুরস্কৃত করা হতো, সম্মান দেওয়া হতো। একবার কোর'আন তেলাওয়াতকারীদেরকেও খলিফা ওমর (রা.) পুরস্কৃত করতে মনস্থির করলেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ সে সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেন।

খলিফা ওমর (রা.) কোনো একটি এলাকার শাসকের প্রতি চিঠি লিখে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, "যারা কোর'আন পড়ে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য দাও।" সেখানকার শাসনকর্তা এই নির্দেশকে কার্যকর করেন। কিন্তু এর ফল দাঁড়ায় এই যে, বহুলোক কেবল অর্থের লোভে কোর'আন পড়তে শুরু করে। উক্ত শাসনকর্তা এহেন অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে খলিফাকে অবগত করলে খলিফা এই হুকুমটি প্রত্যাহার করেন এবং কোর'আন পাঠ বা শিক্ষাদানের বিনিময়ে পার্থিব স্বার্থহাসিলের যে কোনো সুযোগ ইসলামে নেই এবং এর পরিণতি যে জাহান্নাম সে প্রসঙ্গেও একটি চিঠি মুসলিম ভূখণ্ডের শাসকদের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি মূলত চাইতেন কোর'আনে হাফেজদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাক, কোর'আনের পাঠক বৃদ্ধি পাক কারণ কোর'আনকে সংরক্ষণ করা খলিফা হিসাবে তাঁর একটি গুরু দায়িত্ব। কিন্তু কোর'আন যেন স্বার্থ হাসিলের মাধ্যম না হতে পারে সে দিকেও তিনি ছিলেন সজাগ ও সতর্ক। উপরোক্ত ফরমানটি প্রত্যাহার করে তিনি নতুন করে নির্দেশ দিলেন যে, "যে সকল ব্যক্তি উদার ও দানশীল এবং রসুলাল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তাদেরকে আর্থিক সাহায্য দাও।"(১)

খলিফা ওমর একবার মনস্থির করেন যে তিনি বিভিন্ন সেনাঘাঁটিতে অবস্থানরত মুজাহিদদের মধ্যে যাঁরা কোর'আনের হাফেজ তাঁদেরকে মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডের বিভিন্ন এলাকায় কোর'আন শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করবেন। তিনি তাঁদের জন্য একটি ভাতা (বাৎসরিক ২৫০০ দিরহাম) নির্ধারণ করেন। তিনি বসরা ও এর অধীন এলাকার প্রশাসক আবু মুসা আশ'আরী (রা.) এর কাছে পত্র লিখে হাফেজে কোর'আনদের তালিকা চান। আবু মুসা আশ'আরী (রা.) বসরার তিনশতেরও বেশি হাফেজের তালিকা পাঠালেন। তখন ওমর (রা.) তাঁদের নামে একটি চিঠি প্রেরণ করেন যেখানে তিনি কোর'আন দ্বারা স্বার্থহাসিল সংক্রান্ত বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তিনি খলিফার সেই চিঠিটি পেয়ে হাফেজদেরকে নিয়ে একটি সম্মেলন করেন এবং সেখানে চিঠিটি পাঠ করে শোনান।

---

১. কিতাবুল আমওয়াল, কাসিম ইবনে সাল্লাম, পৃষ্ঠা ২৬

হাফেজে কোর'আনদের নামে খলিফা ওমরের চিঠি

আল্লাহর বান্দা ওমরের পক্ষ থেকে আবু মুসা আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস এবং কোর'আনের হাফেজগণের প্রতি।

তোমাদের সবার প্রতি সালাম রইল। জেনে রাখ যে, এই কোর'আন তোমাদের জন্য পুরস্কার ও সওয়াব অর্জনের অসিলা। অতএব এর শিক্ষার উপর আমল করো। একে নিজের স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার বানিও না। যে ব্যক্তি কোর'আনকে নিজের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের মাধ্যম হিসাবে বানাবে কোর'আন তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আর যারা কোর'আনকে নিজের পথপ্রদর্শক ও অনুসরণীয় বানাবে কোর'আন তাদেরকে জান্নাতের উদ্যানে ভ্রমণ করাবে। লক্ষ্য রাখবে, কোর'আন যেন আল্লাহর দরবারে তোমাদের জন্য সুপারিশকারী হয়। তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী যেন না হয়। কোর'আন যার সুপারিশ করবে সে জান্নাতে যাবে। আর কোর'আন যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে সে জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। মনে রেখো, এই কোর'আন হেযদায়াতের উৎস, জ্ঞানের কলি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সদ্য নাজিলকৃত জীবন্ত এক কেতাব। এর মাধ্যমে আল্লাহ অন্ধের চোখ, বধিরের কান এবং মনের বন্ধন খুলে দেন।

আল্লাহর বান্দা যখন রাতে নিদ্রা থেকে ওঠে, মেসওয়াক করে, ওজু করে অতঃপর তাকবির বলে সালাতে দাঁড়িয়ে কোর'আন তেলাওয়াত করে তখন মালায়েকগণ (ফেরেশতা) তাকে চুম্বন করে এবং বলে, "পড়ো, পড়ো। তুমি পাক পবিত্র হয়ে গেছ। এবার কোর'আন পাঠ করলে তোমার আনন্দ আসবে।" সালাতে কোর'আন তেলাওয়াত গুপ্তধন পাওয়ার মতো। এতে অসীম কল্যাণ ও বরকত রয়েছে।

অতএব যত বেশি সম্ভব কোর'আন পাঠ করো। সালাত হলো নূরস্বরূপ, যাকাত হলো প্রমাণস্বরূপ, ধৈর্য হলো আলোস্বরূপ, আর কোর'আন হলো তোমাদের পক্ষে অথবা বিপক্ষে দলিলস্বরূপ। অতএব কোর'আনের সম্মান করো, এর প্রতি অমনোযোগী হয়ো না। কেননা আল্লাহ তাঁর সম্মান করে থাকেন যে কোর'আনের সম্মান করে। আর আল্লাহ তাকে অসম্মান করে থাকেন যে কোর'আনের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। স্মরণ রেখো, যে কোর'আন পড়ে তা মনে রাখে এবং তদনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করে দেন। অন্যথায় তাঁর আরাধ্য বস্তু পরকালের জন্য জমা করে রাখেন। আল্লাহর ইনআম (উপহার) সর্বোৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী। আর সে পুরস্কার তারাই পায় যারা মো'মেন এবং যারা নিজের প্রভুর উপর পূর্ণ আস্থাশীল।(১)

আবু মুসা আল আশয়ারী (রা.) সেই সম্মেলনে উপস্থিত ৩ শ হাফেজের উদ্দেশে যে বক্তব্য পেশ করেন সেখানে তিনি বলেন, "নিঃসন্দেহে কোর'আন হয় আপনাদের জন্য সওয়াবের, না হয় আপনাদের জন্য শাস্তির কারণ হবে। অতএব কোর'আনের

---

১. ইবনে যানজাবিয়্যার বর্ণনায় কানযুল উম্মাল, ১ঃ২১৭

অনুসরণ করবেন। কিন্তু কোর'আনকে নিজের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির কামনা পূরণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবেন না। কেননা যে ব্যক্তি কোর'আনকে নিজের পথ প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করবে কোর'আন তাকে জান্নাতের বাগানে নিয়ে যাবে। আর যে কোর'আন নিজের কামনা পূরণের হাতিয়ার বানাবে কোর'আন তাদেরকে গলা ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।"(১)

উল্লেখ্য যে, রসুলাল্লাহর সময় থেকেই আবু মুসা আশ'আরীর (রা.) বিশেষ দায়িত্ব ছিল উত্তর ইয়েমেনের বিভিন্ন প্রদেশে কোর'আন শিক্ষাদান ও যাকাত সংগ্রহ। তিনিসহ রসুলাল্লাহর প্রত্যেক সাহাবি জানতেন যে কোর'আনের বিনিময়ে স্বার্থ হাসিল, পার্থিব সম্পদ, উপহার-হাদিয়া, ইনআম গ্রহণ নিষিদ্ধ, হারাম। তাঁরা কোর'আনের সংরক্ষণের গুরুত্ব এবং কোর'আনের শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে আমাদের চাইতে বেশি বুঝতেন। এজন্য তাঁরা জাতিকে কোর'আন শিক্ষা দিলেও কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছ থেকে এর বিনিময় নিতেন না, উপহার নিতেন না। কোনোভাবেই হেদায়াতের উৎস কোর'আনকে তাঁরা স্বার্থের হাতিয়ার হতে দেন নি।

মুসলিম জাতির একটি কর্তৃপক্ষ থাকা সব সময় বাধ্যতামূলক। তারা কখনও নেতৃত্বহীন হতে পারে না। ইসলামের অনুসরণকারী পুরো জাতি হবে এক জাতি, তাদের নেতা হবে একজন। তিনি অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ যখন কোর'আন শিক্ষা দেওয়ার জন্য, দীনের জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করবেন, তখন ঐ ব্যক্তির ভরণপোষণের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সেটা কর্তৃপক্ষ বহন করবে। প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিতদের বেলাতেও একই কথা। কিন্তু সরকার নিয়োগ দেয় নি, ব্যক্তি উদ্যোগে একজন লোক অন্যকে ইসলামের জ্ঞান দিবে, কোর'আন শেখাবে আর সেটা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করবে এই পেশাদারী দীনশিক্ষাদানের কোনো বৈধতা ইসলামে নেই। এটা কেন সে কথা পূর্বে একাধিকবার বলে এসেছি, আবারও বলছি। একজন মানুষ যার থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করে তার প্রতি সে নৈতিকভাবে অনুগত হয়ে যায়, তার অন্যায়ের বিরুদ্ধেও সে প্রতিবাদ করতে পারে না। একজন মুসলিম তার ঊর্ধ্বতন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এবং সর্বোচ্চ নেতার প্রতি এমনিতেই অনুগত থাকতে বাধ্য। তাই সেই কর্তৃপক্ষ যখন তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয় তখন সেটি তার আনুগত্যের ক্ষেত্রে, চেইন অব কমান্ডের ক্ষেত্রে কোনো বৈপরীত্য, সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না। কিন্তু কেউ যদি ধর্মের কাজ করে কোনো ব্যক্তি বা যে কারো থেকে অর্থ গ্রহণ করে তখন তার আনুগত্য সেখানে বাঁধা পড়বে। সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অন্যায়ের প্রতিবাদ সে করতে পারবে না। এভাবে হক, সত্য ঢাকা পড়ে যাবে।

তাই আজকে যখন ইসলামের কোনো একক নেতৃত্ব নেই, ইমামত নেই, কর্তৃপক্ষ নেই, মুসলিমরা যখন আল্লাহর জীবনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে ইবলিসের প্রদর্শিত

---

১. সাফওয়াতুস সাফওয়াত, ইবনুল যাওজী, হায়দরাবাদ, ভারত, ১৩৫৫ হি. ১:২৬৬, তথ্যসূত্র: হযরত ওমর রা. - এর সরকারী পত্রাবলি

জীবনব্যবস্থা মেনে চলছে তখন মুসলিম দাবিদারদের মুখ্য কর্তব্য হলো একজন নেতার নেতৃত্বে আগে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, একটি সর্ববাদিসম্মত কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা খলিফাদের যিনি রসুলাল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হবেন। এই প্রেক্ষাপটের তারতম্যকে বিবেচনার মধ্যে না এনে, মানুষকে সেটা বুঝতে না দিয়ে কোনোরকমে একটা কোর'আন শেখানোর জীবিকার বন্দোবস্ত করে নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেওয়ার সুযোগ ইসলামে নেই।

আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা ইজমা কিয়াস করে হালাল করা হয়েছে

দীনের কাজ করে টাকা নেওয়া যাবে কিনা এ প্রশ্ন করলে আলেম সাহেবরা বলে থাকেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এটি জায়েজ না থাকলেও পরবর্তী যুগের আলেম-ওলামা ও ফুকাহাদের মত হলো ইমামতি, মুয়াজ্জিনী, দীনী শিক্ষকতা, ওয়াজ ও মিলাদ মাহফিল, কবর জেয়ারত ইত্যাদি করে পারিশ্রমিক নেয়া জায়েজ আছে। ৫ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে বাংলা নিউজে প্রকাশিত "ওয়াজের জন্য চুক্তি করে টাকা নেওয়া জায়েজ নেই" শিরোনামের একটি প্রবন্ধে মুফতি আবুল হাসান শামসাবাদী লিখেছেন, "অনেকে ওয়াজকে মাদরাসার শিক্ষকতা কিংবা মসজিদের ফরজ নামাজের ইমামতির সঙ্গে তুলনা করে ওয়াজের জন্য চুক্তি করে টাকা নেওয়াকে জায়েজ করতে চান। কিন্তু এটা ঠিক নয়। মাদরাসার শিক্ষক অথবা মসজিদের ইমামের ওপর বক্তাকে কিয়াস (কোর'আন, হাদিস বা ইজমার কোনো দলিল দ্বারা প্রমাণিত কোনো বিষয়ের ওপর অনুমান করে এই তিন উৎসে নেই এমন কোনো বিষয়ে মাসয়ালা নির্ণয় করাকে কিয়াস বলে) করা যাবে না। কেননা, তাদের ক্ষেত্রে পরবর্তী যুগের আলেমরা বেতন গ্রহণকে জায়েজ বলেছেন। পরবর্তী যুগের আলেমদের পরিচয় প্রসঙ্গে 'দুসতূরুল উলামা' (২/১৭৮) তে বলা হয়েছে, ৪৪৮ হিজরি থেকে ৬৯৩ হিজরি পর্যন্ত আলেমরা উলামায়ে মুতাআখখিরিন কিংবা পরবর্তী যুগের অন্তর্ভুক্ত। আর এটা এ কারণে যে, এ কাজের ওপর দীনের ইলম ও আমলের স্থায়ীত্ব নির্ভরশীল। তাই বেতন না হলে, সেই অবস্থায় কেউ এ কাজের জন্য সময় বের করতে না পারলে দীনের ইলম ও আমলের ক্ষতি হবে।"

মুফতি সাহেবের সুস্পষ্ট মত হচ্ছে - দীনের ইলম ও আমলের ক্ষতি হবে এই কারণে পরবর্তী যুগের আলেমরা দীনের বিনিময় নেওয়াকে জায়েজ করে দিয়েছেন। এই পরবর্তী যুগের আলেমদের অনেকেই বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে এটিকে নাজায়েজ বলে ফতোয়া দিলে ইসলামের খিদমত ও কোর'আনের শিক্ষা বিস্তারের কাজ নিদারুণভাবে বিঘ্নিত হবে। এ কাজ বিঘ্নিত হওয়া মারাত্মক ধরনের অনভিপ্রেত ব্যাপার যে, এর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ক্ষুদ্রতর অনভিপ্রেত কাজ সহ্য করে নিতেই হবে। আল্লামা ইবনে আবেদীন বলেন: "পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শিক্ষাদানকে যদি অনুমোদন না করা হয়, তবে কোর'আন বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হয়ে

যাবে।"(১) এজন্য ইজমা কিয়াস আর ইজতেহাদ করে তারা ধর্মব্যবসাকে জায়েজ করে দিয়েছেন। খেয়াল করুন, আল্লাহর হুকুম বা রসুলের নির্দেশ নয় বরং ইজমা কিয়াস করে এ বৃত্তিকে জায়েজ করা হয়েছে। কিন্তু সেটাও যে বৈধ নয় তার প্রমাণ দেখুন। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ফকীহ আল্লামা আবু বকর জাসসাস (মৃত্যু ৩৭০ হিজরী) তাঁর সুবিখ্যাত আহকামুল কোর'আন গ্রন্থের ঘুষ সংক্রান্ত অধ্যায়ে লিখেছেন, "এ থেকে প্রমাণিত হয়, যে কাজ ফরজ হিসেবে অথবা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, সে কাজে পারিশ্রমিক নেয়া জায়েজ নেই। যেমন হজ্ব এবং কোর'আন ও ইসলাম শিক্ষাদান ইত্যাদি।"(২)

তাঁর পূর্বসূরি সকল ফকীহগণই পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েজ নেই বলেই ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কিছুদিন পরেই ৪র্থ শতাব্দীর শেষভাগে ফেকাহবিদদের কেউ কেউ ইসলামের চিরন্তন এ বিধানকে পরিবর্তন করে ফেলেন। আমরা জানি না তাদের উপর নতুন করে ওহি নাজিল হয়েছিল কিনা। ফতোয়ায়ে কাযী খান গ্রন্থে ইমাম হাফেজ আবু লায়েসের উক্তি এভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে: "ইমাম আবু লায়েস বলেন যে, আগে আমি কোর'আন শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক নেয়া নাজায়েজ বলে ফতোয়া দিতাম.......... কিন্তু এখন তা প্রত্যাহার করেছি।"(৩)

ফকীহ আবু লায়েস সমরকন্দী আবু বকর জাসসাসের সমসাময়িক এবং ৩৭৩ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। স্বয়ং কাযীখানও (তাঁর পুরো নাম ফখরুদ্দীন হাসান বিন মানসুর) এটাকে জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তিনি ৫৯২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। আমরা সম্মানিত ফকীহদের বক্তব্য নিয়ে সূক্ষাতিসূক্ষ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যাবো না। কেবল এটুকুই বলব ইসলামের হালাল-হারামের মূলনীতি হচ্ছে আল্লাহর কেতাব আর রসুলাল্লাহর জীবনাদর্শ। সেখানে আমরা যা দেখি সেটাই হচ্ছে ইসলামের রূপরেখা। এর বাইরে ইসলামের মধ্যে যা কিছুর সংযোগ বা বিয়োগ ঘটেছে সেটা ইসলাম নয়। ওগুলো আঁকড়ে ধরে রাখার কোনো নির্দেশ রসুলাল্লাহ দিয়ে যান নি। বরং আমরা যেন কোনটা ইসলাম আর কোনটা ইসলাম নয় তার সুস্পষ্ট পার্থক্য করতে সক্ষম হই সেজন্য মহান আল্লাহ তাঁর পাক কালামে মানদণ্ড দিয়ে দিয়েছেন-"যে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কোনো সিদ্ধান্ত থাকবে সে বিষয়ে কোনো মো'মেন নারী বা মো'মেন পুরুষের ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত প্রদানের এখতিয়ার থাকবে না। এবং যারাই আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অবাধ্য হবে তারাই সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।"(৪)

সুতরাং দীনের কাজের বিনিময়ে পার্থিব স্বার্থ হাসিলকে পবিত্র কোর'আন ও হাদিসে আল্লাহ ও তাঁর রসুল সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করার পরও যারা নানাবিধ অজুহাত দাঁড়

---

১. রদ্দুল মুখতার - আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.)

২. আহকামুল কোর'আন: ২য় খণ্ড, ৫২৬ পৃষ্ঠা - আল্লামা আবু বকর জাসসাস (রহ.)

৩. ফতোয়ায়ে কাযী খান

৪. আল কোর'আন: সুরা আহযাব ৩৬।

করিয়ে একে পরবর্তীকালে জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন তারা অবশ্যই আল্লাহর উপর্যুক্ত আয়াত মোতাবেক মো'মেন পুরুষ বা মো'মেন নারী নন এবং আল্লাহ ও রসুলের অবাধ্যতা করে তারা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। যে বিষয়ে স্বয়ং আল্লাহর কোনো সিদ্ধান্ত থাকে সে বিষয়ে কারো ভিন্নমত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, সেই মত যিনিই প্রদান করে থাকুক না কেন। যারা সেই মত গ্রহণ করবে তারা আদতে আল্লাহর বদলে গায়রুল্লাহকেই নিজেদের রব (প্রভু) বলে, ইলাহ (বিধাতা) বলে গ্রহণ করে নিল। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তাঁর কেতাবে আমাদের অবহিত করেছেন এই বলে যে, "তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের আলেম ওলামা আর পীরদেরকে নিজেদের প্রভু (রব) বানিয়ে নিয়েছে।"(১)

'কীভাবে আলেমদেরকে প্রভু মানা হতো' এ বিষয়ে রসুলাল্লাহকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, "তারা আলেমদের ইবাদত করত না, কিন্তু তারা যা হালাল করেছে তাকে হালাল করেছে এবং যা হারাম করেছে তাকে তারা হারাম বলে মেনে নিয়েছে। আর এটাই হলো তাদের ইবাদত করা।"(২) ঠিক এই কাজটিই এখন আমাদের এই মুসলিম জাতি করছে। এখন জনসাধারণের কয়জন এ বিবেচনা করেন যে, আল্লাহ যা বলেছেন তা-ই ঠিক, সেই ক্ষেত্রে কোনো আলেম-ওলামা, গাউস কুতুব, মুফতি সাহেবের কথা শুনবো না। বরং তারা এই ধ্যান-ধারণায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন যে, আলেমরা, পীর সাহেবরা যা বলেন সেটাই বুঝি আল্লাহর কথা, তাঁরা যা বলেন সেটাই সঠিক, সেটাই ধর্ম। যদিও বাস্তবে সেগুলো আল্লাহর হুকুমের সরাসরি পরিপন্থী। ধর্মগুরুদের প্রতি এই অন্ধ আনুগত্য (তাক্বলীদ) জাতির ধ্বংসের এক অন্যতম কারণ।

হাদিসের অপব্যাখ্যা করে ধর্মব্যবসাকে বৈধ করে নেওয়ার আরো উদাহরণ আছে। চিকিৎসা কার্যের বিনিময় গ্রহণ করাকে আল্লাহ বৈধ করেছেন। এক সাহাবি সুরা ফাতিহা পড়ে ফু দিয়ে এক অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা করেছিলেন এবং বিনিময় নিয়েছিলেন। যারা ধর্মব্যবসার পক্ষে অসিলা তালাশ করেন তারা এই ঘটনাটিকে নিজেদের অপকর্মের সাফাই হিসাবে উপস্থাপন করে থাকেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রসুলাল্লাহ (সা.) এর কিছু সংখ্যক সাহাবি কোন এক সফরে ছিলেন, তাঁরা কোন একটি আরব সম্প্রদায়ের বসতির নিকট দিয়ে রাস্তা অতিক্রমকালে তাদের নিকট মেহমানদারীর ব্যাপারে বললেন। কিন্তু তারা তাদের আতিথেয়তা করল না। পরে তাদেরকে তারা বলল, "তোমাদের দলে কি কোন ঝাড়ফুঁককারী আছে? কারণ, বসতির সর্দারকে সাপে দংশন করেছে অথবা বিপদগ্রস্ত হয়েছে। সে সময় এক লোক বলল, 'হ্যাঁ'। তারপরে সে তার নিকট গমন করে সুরা আল-ফাতিহা পড়ে ঝাড়ফুঁক করল। যার দরুন ব্যক্তিটি ভাল হয়ে গেল এবং ঝাড়ফুঁককারীকে বকরির একটি

---

১. আল কোর'আন: সুরা তওবা ৩১।

২. হাদিস: আদি ইবনে হাতিম রা. থেকে তিরমিজি।

ক্ষুদ্র পাল দেয়া হলো। সে তা নিতে আপত্তি জানালো এবং সে বলল, ‘যতক্ষণ তা রসুলাল্লাহর (সা.) নিকট বর্ণনা না করি ততক্ষণ গ্রহণ করতে পারি না’। অতঃপর সে রসুলাল্লাহর (সা.) নিকট এসে বিষয়টি তাঁর নিকট বর্ণনা করে বলল, হে আল্লাহর রসুল! আল্লাহর শপথ! আমি সুরা ফাতিহা ছাড়া ভিন্ন কোন কিছু দিয়ে ঝাড়ফুঁক করি নি। সে সময় তিনি মৃদু হাসলেন এবং বললেন, “তুমি কি করে বুঝলে যে, তা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা যায়?” অতঃপর বললেন, “তাদের নিকট থেকে তা নিয়ে নাও এবং তোমাদের সঙ্গে আমার জন্যও একাংশ রেখো।”(১)

এই হাদিসটি লক্ষ্য করুন। এখানে উক্ত সাহাবি কি কাউকে পবিত্র কোর’আন শিক্ষা দিয়েছিলেন, ইসলাম প্রচার করেছিলেন বা ইসলামের কোনো আনুষ্ঠানিক কাজ করে দিয়েছিলেন যেমন তিনি কি নামাজ পড়িয়েছিলেন, যার বিনিময়ে তিনি বকরিগুলো গ্রহণ করেছিলেন? না। গোত্রপতির একজন চিকিৎসক প্রয়োজন ছিল, তারা ঝাড়ফুঁকেও বিশ্বাসী ছিল। ক্ষুধার্ত সাহাবি সুরা ফাতিহা পড়ে ঝাড়ফুঁক দিয়ে দেখলেন লোকটার রোগ ভালো হয়ে গেছে। তথাপি তিনি যেহেতু পবিত্র কোর’আনের আয়াত পাঠ করে ঝাড়ফুঁক দিয়েছিলেন তাই তাঁর মনে একটি দ্বিধা সৃষ্টি হয় যে, এই ছাগলগুলো গ্রহণ করা দীনের বিনিময় গ্রহণ হয়ে যাবে নাতো? তাই তিনি রসুলাল্লাহর (সা.) কাছে ছুটে আসেন এবং নিজের প্রশ্ন উপস্থাপন করে নিশ্চিত হন। এই হাদিস থেকে কী করে দীনের বিনিময় গ্রহণের বৈধতার ফতোয়া আবিষ্কার করা যেতে পারে?

এক শ্রেণির আলেম ওলামারা কীভাবে হারাম ধর্মব্যবসাকে জায়েজ করে নিয়েছেন যা পাঠকের সামনে আরেকটু খোলাসা করার জন্য কোর’আনের বিনিময় গ্রহণ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিসের দিকে মনোনিবেশ করব। ধর্মের পণ্ডিতগণ কী সূক্ষ্ম কলাকৌশলের মাধ্যমে পার্থিব স্বার্থে ইসলামের বিধানকে কেবল বিকৃত নয়, বিপরীতমুখী করে দিতে পারেন তা বোঝার জন্য এই একটি উদাহরণই উন্মুক্ত হৃদয়ের পাঠকের জন্য যথেষ্ট হবে আশা করি।

আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের গবেষকদের দ্বারা গ্রন্থিত সহীহ হাদিসের বই সুনানে আবু দাউদ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। আসহাবে সুফফার অন্যতম সাহাবী উবাদাহ বিন সামিত (রা.) বলেন, “আমি আহলে-সুফফার কিছু লোককে লেখা এবং কোর’আন পড়া শেখাতাম। তখন তাদের একজন আমার জন্য একটি ধনুক হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করে। তখন আমি ধারণা করি যে, এ তো কোনো মাল (সম্পদ) নয়, আমি এ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় তীরন্দাযী করবো।

এরপর রসুলাল্লাহর (সা.) নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি: ইয়া রসুলাল্লাহ (সা.)! আমি যাদের কোর’আন পড়া এবং লেখা শিখাই, তাদের একজন আমাকে হাদিয়া হিসেবে একটি ধনুক প্রদান করেছেন, যা কোনো সম্পদই নয়।

---

১. হাদিসঃ আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে মুসলিম।

আমি এ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় তীরন্দাযী করবো। তিনি (সা.) বলেন: ‘তুমি যদি তোমার গলায় জাহান্নামের কোনো বেড়ি পরাতে চাও তবে তুমি তা গ্রহণ করো।’”(১)

হাদিসটির নিচে টিকাতে বলা হয়েছে, ইমাম আবু হানিফা (র.) হাদিসের বাহ্যিক অর্থের দিকে খেয়াল করে কোর’আন শেখানোর জন্য বিনিময় গ্রহণকে মাখরূহ বলেছেন। কিন্তু হানাফি মাযহাবের পরবর্তী আলেমগণ এবং অধিকাংশ আলেমের মত এর পক্ষে দেখা যায়। বিশেষত: এ যুগে, যখন কোর’আন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করে, তাতে দোষের কিছু নেই। সম্ভবতঃ সতর্কতা অবলম্বন হেতু ইমাম আবু হানিফা (র.) একে মাকরূহ বলেছেন। এখানে কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করুন।

প্রথমত, কোর’আন শিক্ষাদানের বিনিময়ে উবাদাহ বিন সামিত (রা.) যখন ধনুক উপহার পান তখন তিনি সেটা এই ভেবে গ্রহণ করেন যে ধনুকটি তো তিনি কোনো ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করবেন না, বরং সত্যকে বিজয়ী করার জেহাদে এটি ব্যবহার করবেন। সুতরাং এটা গ্রহণ করা হারাম হবে না। তবু তাঁর মনে সন্দেহের একটি খোঁচা থেকে গেল, কারণ সব সাহাবীই জানতেন ইসলাম শিক্ষা দিয়ে, দীনের কাজের বিনিময়ে পার্থিব মূল্য গ্রহণ করা মানে আগুন ভক্ষণ করা।(২) তাই তিনি নিশ্চিত হওয়ার জন্য রসুলাল্লাহর (সা.) কাছে জিজ্ঞাসা করলেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি কিন্তু ধনুকটি চেয়ে নেন নি বরং সেটা তাঁকে হাদিয়া হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। তথাপি রসুলাল্লাহ **সেটা গ্রহণ করতে দিলেন না। সুতরাং ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার প্রেক্ষিতে উপহারও গ্রহণ করা যাবে না। করলে সেটা জাহান্নামের কারণ হবে।**

তৃতীয়ত, টিকায় কী লেখা আছে লক্ষ্য করুন। আল্লাহর রসুল যেটাকে বললেন ‘জাহান্নামের বেড়ি’ সেটাকে কী সুন্দর করে একদম হালাল বানিয়ে দিলেন আমাদের বিজ্ঞ আলেমগণ। যে হাদিসের বক্তব্য দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট সেটাকেও জটিলতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা নিজেদের সাধারণ জ্ঞানের দুয়ারে তালা দিয়ে ইমাম আবু হানিফার উদ্ধৃতি টানলেন। যে বিষয়ে কোর’আনে সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকে সে বিষয়ে ভিন্ন কোনো মত হাদিসে থাকলেও তো সেটা গ্রহণযোগ্য নয়, তাহলে আর ইমাম আবু হানিফার (র.) প্রশ্ন আসে কেন? দীনের বিনিময় গ্রহণের বিপক্ষে কোর’আনে অন্তত অর্ধশত আয়াত আছে, তারপরও এ নিয়ে ইজমা কিয়াস করে ভিন্ন ফতোয়া আবিষ্কারের সুযোগ আদৌ থাকে কি?

চতুর্থত, ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেছেন, আমার কোনো মতামত যদি কোর’আন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে আমার ফতোয়াকে দেওয়ালে ছুঁড়ে মারবে। যেটা জাহান্নামের বেড়ি হয় সেটা কি মাকরুহ? অসম্ভব। সেটা নিঃসন্দেহে কুফর এবং হারাম তো বটেই।

---

১. হাদিস: উবাদা ইবন সামিত (রা.) আবু দাউদ চতুর্থ খণ্ড, হাদিস নং- ৩৩৮১

২. আল কোর’আন: সুরা বাকারা ১৭৪।

পঞ্চমত, তারপর হানাফি মাজহাবের পরবর্তী আলেমরা কী করলেন? তাদের মাজহাবের ইমাম যেটাকে 'মাকরুহ' বললেন সেটাকে তারা 'মাকরুহ'-ও রাখলেন না। ভাবখানা এমন যে, ইমাম আবু হানিফা হাদিসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম হন নি, তাই তিনি বাহ্যিক অর্থের দিকে খেয়াল করে একে মাকরুহ বলেছেন। অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝি আমরা। তাই "এ যুগে কোর'আন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করায় দোষের কিছু নেই।" তারা না আল্লাহর অনুসরণ করলেন, না রসুলের কথার তোয়াক্কা করলেন, না তাদের মহান ইমামের।

দেখলেন, কীভাবে রসুলের (সা.) শিক্ষাকে ধর্মব্যবসায়ীরা (কাঠমোল্লা নয়, একেবারে সর্বোচ্চ স্তরের আলেম, কায়রো, মদীনা থেকে বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে আসা বিশেষজ্ঞ, যাদেরকে ইসলামের কর্তৃপক্ষরূপে সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে) একেবারে উল্টিয়ে দিলেন?

অথচ ইমাম আবু হানিফা ধর্মব্যবসায়ী ছিলেন না, তিনি ছিলেন কাপড়ের ব্যবসায়ী। আর তার পরবর্তী বহু বিখ্যাত মনীষী ব্যবসায়ী অথবা কারিগর ছিলেন। তারা জানতেন ধর্মব্যবসা অর্থাৎ ইসলামের কাজ করে অর্থোপার্জনের মতো নিকৃষ্ট জীবিকা আর কিছু হতে পারে না। ইমাম আহমদ ইবনে আমর (আবু ইউসুফ) ছিলেন জুতা প্রস্তুতকারী। তিনি একদিকে জুতা তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন, আবার অপরদিকে খলিফা মুহতাদি বিল্লাহর জন্য "কিতাবুল খারাজ" বা "ইসলামের রাজস্বনীতি" প্রণয়ন করছিলেন। এই সময়ে তিনি ফেকাহ শাস্ত্রের ওপর নিজের মূল্যবান গ্রন্থাবলী প্রণয়ন সমাপ্ত করতেন।

শাফেয়ী মাজহাবের অন্যতম ইমাম আবু বকর মোহাম্মদ কাফফাল শাশী এর হাতে তালা বানানোর দাগ পরিদৃষ্ট হতো, ইবনে কাহতান দুবাগা দর্জির কাজ করতেন, খ্যাতনামা ইমাম জাসসাস ছিলেন কাঁচপাত্র নির্মাতা। যারা তাদের ক্ষুরধার মেধাকে কাজে লাগিয়ে ইসলামের বিধিবিধানকে সন্নিবেশন করে ফেকাহ শাস্ত্রগুলো তৈরি করে গেলেন তারা ওগুলোর বিনিময়ে এক পয়সাও রোজগার করেন নি। তারা ওগুলো করেছেন সমাজের প্রয়োজনে। বিচার করতে আইনের বই লাগবেই, রাজস্বের কাজ করতে অর্থনীতির বই লাগবেই। তখন ইসলামের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাই এই মানুষগুলো কষ্ট করে এই গ্রন্থগুলো প্রণয়ন করেছেন মানুষের কল্যাণার্থে।

উপমহাদেশের দেওবন্দী আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব মাওলানা কাসেম নানুতাবি (রহ.) দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার আগে মিরাটের একটা ছাপাখানায় প্রুফ দেখার কাজ করতেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর চাকরিটি ছেড়ে দেবার তাগাদা দিয়ে তাঁকে চিঠি দেওয়া হলো। তিনি আরজ করলেন, 'চাকরি ছেড়ে দিলে আমার পরিবারের খরচ বহন করবো কী করে!' পরে অবশ্য তিনি ঐ চাকরিটা ছেড়ে অপর

একটি ছাপাখানায় কাজ নেন যা করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে তিনি কোনোদিনও বেতন গ্রহণ করতেন না।

আজ মাদ্রাসাগুলোয় এহেন নিঃস্বার্থ ফকিহ ও আলেমদের লেখা বই পাঠ করে আলেম সনদ নিয়ে যারা বেরিয়ে আসেন, ফেকাহর কেতাব পাঠ করার অহঙ্কারে তাদের পা জমিন স্পর্শ করে না। অথচ তারা সেই প্রাথমিক যুগের ইমামদের আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে বহু দূরে নিক্ষেপ করে, পৌরোহিত্য করাকে, দীনের জ্ঞান বিক্রি করাকে, ইমামতি করাকে পেশায় পরিণত করেছেন। আদর্শচ্যুতির কী করুণ দৃষ্টান্ত!

আরেক যুক্তি: আলেমদের পারিশ্রমিক না দিলে ইসলামই থাকবে না!!!

ইসলামকে আল্লাহ বিজয়ী করবেন এটা তিনি পাক কালামে ঘোষণা করেছেন। এটা কখন হবে, কীভাবে হবে, কাদের মাধ্যমে হবে সেটা তিনি নির্ধারণ করবেন। মানুষের কাজ হচ্ছে আল্লাহর হুকুম মান্য করা, আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম করা। সেটা বাদ দিয়ে, পাশ্চাত্যের হুকুম বিধানের দাসত্ব করে ইসলামকে আনুষ্ঠানিক উপাসনা ও আচার আচরণের (জরঃঁধষ) হিসাবে টিকিয়ে রাখলে কি আল্লাহ আদৌ বিজয়ী হবেন? আর আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে কি কখনও তাঁকে বিজয়ী করা সম্ভব?

এ কথাগুলো বলছি এজন্য যে, অনেকে বলে থাকেন যদি আলেম ওলামাদেরকে টাকা পয়সা না দেওয়া হয় তাহলে আর এসব কাজে সময় দিতে আগ্রহী হবেন না। ফলে ইসলামের চর্চা হবে না, ইসলাম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই ইসলামকে হেফাজত করার জন্য মরিয়া হয়ে তারা ধর্মব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে চান। সমাজে ধর্মজীবীদের অপরিহার্যতা বোঝানোর জন্য এটাও অনেকে বলে থাকেন যে, 'জন্মের পর আকিকা দিতে, বিয়ে পড়াতে, আবার মৃত্যুর পর জানাজা দিতে ঠিকই এই আলেমদেরই শরণাপন্ন হতে হবে।" আসলেই কি তাই? এই প্রথাগুলো কে প্রবর্তন করল? আল্লাহর রসুল (সা.) বা খলিফায়ে রাশেদিনদের সময় তো উম্মাহর মধ্যে কোনো ধর্মজীবী আলেম শ্রেণি ছিল না।

তখন মানুষ জন্ম নিলে পরিবারের কোনো একজন জ্যেষ্ঠ সদস্য আযান দিতেন। আকিকার সময় নামও রাখতেন নবজাতকের অভিভাবকগণ। সাহাবিদের বিয়ে পড়াতে, দোয়াদুরুদ পাঠ ও মোনাজাত করতে কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণকারী (চধরফ) 'কাজী'র প্রয়োজন পড়ত না। পরিবার বা সমাজের যে কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সাক্ষীদের সামনে বিয়ের মধ্যস্থতা করে দিতেন। তাছাড়া এই মধ্যস্থতা বিয়ের অপরিহার্য শর্ত নয়। বিয়ের ফরদ হচ্ছে, বর-কনের সম্মতি, দেনমোহর পরিশোধ করা এবং কয়েকজন সাক্ষীর উপস্থিতি। মো'মেনরা নিজেরাই নিজেদের কোরবানির পশু জবাই করতেন। কাউকে ভাড়া করার প্রয়োজন পড়ত না। মসজিদে নামাজ

পড়াতেন খলিফার পক্ষ থেকে নিযুক্ত সামাজিক নেতা (আমির)। তার অনুপস্থিতিতে মুসল্লিরা যাকে পছন্দ করত তিনিই ইমামতি করতেন।

কারো মৃত্যুর পর মৃতের সন্তান, পিতা বা মুসলিমদের সমাজের যিনি নেতা তিনিই জানাজা পড়াতেন। এটি একদিকে তাদের জন্য যেমন ছিল ধর্মীয় কর্তব্য তেমনি ছিল সামাজিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সম্পর্কে তারা সকলেই সচেতন ছিলেন। এ বিষয়ে শরিয়তের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি যদি কাউকে জানাজার ইমামতি করার অসিয়ত না করে যান তাহলে মৃতের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় জানাজা পড়াবেন। ঘনিষ্ট আত্মীয়দের মধ্যে প্রথমে পিতা, তারপর দাদা, তারপর পুত্র, তারপর পৌত্র, তারপর ভাই।(১)

প্রসঙ্গত এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। রসুলাল্লাহর (সা.) সময় মসজিদে নববী ঝাড়ু দিতেন একজন মহিলা সাহাবী। তিনি যেদিন মারা যান সেদিন রসুলাল্লাহর সাহাবীরা নিজেদের উদ্যোগে তাঁর জানাজা ও দাফন করেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ রসুলাল্লাাহকে জানানো হয়েছিল না। তিনি যখন সংবাদটি জানলেন খুব আফসোস করে বললেন, "তোমরা যদি আমাকে খবরটি দিতে।"(২)

একবার চিন্তা করুন, মসজিদে নববী ঝাড়ু দিতেন একজন নারী। অথচ আমরা আজ প্রায়ই দেখি, "মসজিদে মহিলাদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ।" এই নিষেধাজ্ঞা যারা জারি করে রেখেছেন তারা ধর্মরক্ষার অজুহাতেই বহু ইজমা কিয়াস করে রসুলাল্লাহর সুন্নাহ বা নীতিকে উল্টিয়ে দিয়েছেন। যাহোক যে বিষয়ে বলছিলাম, উপরে উল্লিখিত কোনো একটি ধর্মীয় কাজেও কিন্তু তখন অর্থের লেনদেন হতো না। সেই রীতি রক্ষা করাই আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য ও অনুসরণ। এই সুন্নাহ বা আদর্শ পরিত্যাগ করে ইসলামের হেফাজত করার দাবি নিতান্তই উদ্দেশ্যমূলক।

এখন এই ধর্মবিশ্বাসী জাতির অধিকাংশ মানুষই ধর্মান্ধ। তারা কোর'আন হাদিসের সুস্পষ্ট বক্তব্য পড়েও নির্বোধের মতো ঐ আলেমদের মুখপানে চেয়ে থাকেন। আলেমদের কথায় তারা কোর'আন হাদিস সব অস্বীকার করে ফেলেন, তাদের কাছে একটাই মানদণ্ড, মাওলানা সাহেব কি কম বুঝেন? তিনি যখন বলেছেন তখন আল্লাহ রসুল কী বললেন সেটা নিয়ে আমি চিন্তা করার কে? বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর চিন্তার এই জড়ত্ব, হৃদয়ের অন্ধত্ব যতদিন না যাবে ততদিন ইসলাম ঐ পুরোহিত শ্রেণির কুক্ষিগতই থাকবে, মুসলিম জাতির ভাগ্যেরও কোনো পরিবর্তন ঘটবে না।

---

১. ইমাম নবভী প্রণীত রওযাতুত তলিবীন, ২য় খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা।

২. হাদিসঃ বোখারি 'সালাত' অধ্যায়, হা/৪৫৮; মুসলিম, 'জানাজা' অধ্যায়, হা/৯৫৬।

সর্বধর্মীয় পর্যালোচনাঃ কোনো ধর্মেই ধর্মব্যবসার বৈধতা নেই

সকল অন্যায় অশান্তি থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই আল্লাহ যুগে যুগে ধর্ম প্রেরণ করেছেন। সেই ধর্মগুলোকে, ধর্মগ্রন্থগুলোকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে গেছে একটি শ্রেণি, তারা হলো ধর্মব্যবসায়ী। তাদের কথা হচ্ছে, ধর্ম শিখতে হবে তাদের কাছ থেকে, তারা ধর্মের মালিক। ধর্মগ্রন্থ খুব কঠিন, ওটা সাধারণ মানুষ বুঝবে না। সেই শ্রেণিটি ধর্ম সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দেবে সেটাই শিরোধার্য করতে হবে, নয়তো ফতোয়া দিয়ে প্রয়োজনে কাফের, নাস্তিক, মুরতাদ বানিয়ে দেওয়া হবে। এমন এক সময় ছিল যখন সাধারণ হিন্দুদের কাছে তাদের শাস্ত্র ছিল অস্পৃশ্য। ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের যদিওবা বেদ শোনার অধিকার ছিল, কিন্তু শুদ্র বেদ শুনলে তার কানে গরম সীসা ঢেলে দেওয়ার কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ ধর্মব্যবসায়ীরা ধর্মের নামে এই পাশবিক প্রথা বা উপধর্ম চালু করেছিল। **মানুষ ভুলে গিয়েছিল যে, স্রষ্টা কেবল উপাসনালয়ে থাকেন না তিনি থাকেন আর্ত-পীড়িত, নির্যাতিত মানুষের কাছে।** আজও সনাতন ধর্মের পুরোহিত গোষ্ঠী অর্থ উপার্জনের জন্য ধর্মকে উপাসনা, পূজা প্রার্থনার বস্তুতে পরিণত করে ধর্মগুলোকে উপাসনালয়ের চার দেওয়ালের বন্দী করে রেখেছেন যদিও অন্য সকল ধর্মের মতো সনাতন ধর্মেও ধর্মব্যবসা নিষিদ্ধ। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে:

যজ্ঞার্থমথং ভিক্ষিত্বা যো ন সর্বং প্রয্চ্ছতি

স যাতি ভাসতাং বিপ্রঃ কাকতাং বা শতং সমাঃ।(১)

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞের জন্য অর্থ ভিক্ষা করে তার সমস্তটা ঐ কাজে ব্যয় করে না, সে শত বৎসর শকুনি অথবা কাক হয়ে থাকে।

একই নীতি মন্দির-মসজিদ নির্মাণের বেলাতেও প্রযোজ্য। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, নামাজ, রোজা, উপবাস, পূজা-অর্চনা ধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য যেমন একজন বে-নামাজিকে শুধু নামাজি বানানো

---

১. মনুসংহিতা, একাদশ অধ্যায়, শ্লোক ২৫।

নয়, বরং মানবসমাজে নিরাপত্তা, ন্যায়, সুবিচার এক কথায় শান্তি স্থাপন করা তেমনি অন্যান্য ধর্মগুলোরও চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সেই লক্ষ্য কালক্রমে তাদের সকলের সামনে থেকেই হারিয়ে গেছে বলেই শেষ দীনের আগমন হয়েছে। **ওঙ্কার শান্তির প্রতীক, ইসলাম শব্দটিও এসেছে 'সালাম' থেকে যার অর্থ শান্তি। পৃথিবী যখন অশান্তির অগ্নিকুণ্ড হয়ে আছে, মানুষের মুখে ভাত নেই, মসজিদ-মন্দির থেকে জুতা চুরি হয়, যে সমাজে দুই বছরের শিশু ধর্ষিত হয় সেখানে নির্বিরোধী আত্মকেন্দ্রিক মানুষগুলো মসজিদে গিয়ে মনে করেন ইবাদত করছেন, মন্দিরে গিয়ে দুধ-কলা দিয়ে মনে করেন খুব উপাসনা হচ্ছে, মক্কা-গয়া-কাশিতে গিয়ে মনে করেন দেবতারা স্বর্গ থেকে পুষ্পবর্ষণ করছেন, তারা ভ্রান্তির মধ্যে আছেন।** সমাজের অন্যায় অবিচার অশান্তি দূর না করে কেবল আনুষ্ঠানিক উপাসনা ও আমলের গুরুত্ব প্রদানই সবচেয়ে বড় ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেছে। ধর্মের মোড়কে এই অন্ধত্ব দূর করার জন্যই আল্লাহ কালান্তরে নতুন রসুল বা অবতার পাঠিয়েছেন। মানুষ যেন ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় লিপ্ত হয়ে ধর্মের মূল লক্ষ্য অর্থাৎ ন্যায়-শান্তি-সুবিচার ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ভুলে না যায় সেজন্য আল্লাহ তাঁর নাজেলকৃত শেষ কেতাবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, **"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনো পুণ্য নেই।** বরং পুণ্য আছে কেউ স্রষ্টার উপর, মহাপ্রলয়ের উপর, মালায়েকদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসুলগণের উপর ঈমান আনবে, আর স্রষ্টাকে ভালোবেসে সম্পদ ব্যয় করবে আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও দাসমুক্তির জন্যে।"(১)

নবী-রসুলগণ মানুষকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ দেখাতে এসেছে যে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিটি মানুষের কাছে কাম্য। তবুও **নবী-রসুলদের জীবনপথ এত কণ্টকাকীর্ণ ছিল কেন? কারা তাঁদেরকে সীমাহীন নির্যাতন নিপীড়নের মুখে ঠেলে দিয়েছিল?** সে ইতিহাস সকলেরই জানা। পূর্ব থেকে সেই সমাজে যে ধর্মটি প্রচলিত ছিল সেই ধর্মের ধারক-বাহক পুরোহিত শ্রেণিটিই নবী-রসুলদের সামনে সবচেয়ে বড় বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারাই সমাজের ক্ষমতাশালী শাসক শ্রেণিটিকে নবী-রসুলদের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়েছিল। এ জন্য হাজারো মিথ্যা অপবাদ তারা রচনা করেছিল, রটনা করেছিল। তারা চেয়েছিল তাদের ধর্মব্যবসা টিকিয়ে রাখতে। নবীদের প্রচারিত সত্য যদি জনগণ গ্রহণ করে নেয় তাহলে ধর্মব্যবসার কবর হয়ে যাবে, প্রভাব, সম্মান আর জীবিকা হারানোর অনিবার্য পরিণতিই ছিল তাদের আতঙ্কের কারণ।

ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী সব সময় নবী-রসুলদেরকে বলেছেন, "তুমি যদি নবী হও তাহলে মো'জেজা প্রদর্শন করো। আমরা তোমার উপর ঈমান আনব।" নবী-রসুলগণ মো'জেজা দেখিয়েছেন কিন্তু এই গোষ্ঠীটি কখনো ঈমান আনে নি।

---

১. আল কোর'আন: সুরা বাকারা ১৭৭।

উল্টো নবীদেরকে জাদুকর বলে গালিগালাজ করেছে। অনুসারীরাও নবীদেরকে পিড়াপিড়ি করতেন কাফেরদেরকে আল্লাহর নিদর্শন দেখানোর জন্য। তারা ভাবতেন যে, মো'জেজা দেখলে কাফেররা ঈমান না এনে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ বলেন, "আমি যদি তাদের কাছে মালায়েকদেরকে অবতরণ করতাম এবং তাদের সাথে মৃতরা কথাবার্তা বলত এবং আমি সব বস্তুকে তাদের সামনে জীবিত করে দিতাম, তথাপি তারা কখনও বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়; কিন্তু যদি আল্লাহ চান তবে ভিন্ন কথা। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ।"(১)

মুসা (আ.)-এর কওম তাঁর কাছে দাবি জানিয়েছিল আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখানোর: "যখন তোমরা বলেছিলে, "হে মুসা! আমরা আল্লাহকে সরাসরি না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবো না" তখন বজ্র তাদেরকে পাকড়াও করেছিল।"(২)

সামুদ জাতি সালেহ (আ.) কাছে দাবি করেছিল যে, 'হে সালেহ! যদি তুমি বাস্তবিকই আল্লাহর প্রেরিত রসুল হও, তবে কোনো নিদর্শন দেখাও যাতে আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারি।' সালেহ (আ.) বললেন, 'এমন যেন না হয় যে, নিদর্শন আসার পরও তোমরা অবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো।' জাতির সর্দারগণ দৃঢ়তার সাথে ওয়াদা করল যে, নিদর্শন আসলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঈমান আনব। তখন সালেহ (আ.) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কী প্রকার নিদর্শন চাও?' তারা দাবি করল, "সামনের পাহাড় হতে অথবা এই বড় পাথরটি হতে এমন একটি উষ্ট্রী প্রকাশ করো যা গর্ভবতী হয় এবং সাথে সাথে বাচ্চা প্রসব করে।"

সালেহ (আ.) আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন। সাথে সাথে ঐ নির্দিষ্ট পাথরটির মধ্য থেকে সকলের সামনে একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী প্রকাশিত হলো এবং সাথে সাথে বাচ্চা প্রসব করল। এ ঘটনা দেখে নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে যিনি সর্বপ্রধান, জোদ্দো ইবনে আমর তখনই নবীর উপর ঈমান আনলেন। তার দেখাদেখি অন্যান্য সর্দারেরাও নবীর উপর ঈমান আনার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু মন্দিরগুলোর প্রধান পুরোহিত বা মোহান্ত জাওয়ার ইবনে আমর, দ্বিতীয় ধর্মনেতা (কাহেন) রোবাব ইবনে ছেফর তাদেরকে এ কাজ হতে বিরত রাখল। এভাবে তারা অন্য সকলকেও নবীর উপর ঈমান আনা থেকে বিরত রাখল।(৩) আল্লাহর আয়াত (নিদর্শন) অমান্য করে ঐসব ধর্মব্যবসায়ীদের কথা মান্য করার কী করুণ পরিণতি হয়েছিল সেটা সকলেরই জানা। সামুদ জাতি আল্লাহর গজবের শিকার হয়ে চিরতরে ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলীন হয়ে যায়।

---

১. আল কোর'আন:সুরা আন'আম ১১১

২. আল কোর'আন: সুরা বাকারাহ ৫৫, সুরা নিসা ১৫৩

৩. সূত্র: কোর'আনে বর্ণিত পঁচিশ জন নবী ও রাসূল, লেখক: মাওলানা মুহাম্মদ রেজাউল করিম।

এভাবে আমরা যদি নবী-রসুলদের জীবনী পর্যালোচনা করি, দেখব এই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, তাদের প্রায় সকলকেই পূর্ববর্তী বিকৃত ধর্মের পুরোহিত আলেম শ্রেণির দ্বারা প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। চিরকাল এরাই ছিল সত্যের প্রকাশ্য শত্রু। যে নবী এই ধর্মব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠা করে রাখা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে পারেন নি, তাদের হয় ঐ ধর্মব্যবসায়ীদের হাতে প্রাণ হারাতে হয়েছে, নয়তো ঐ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। আল্লাহ ঐ জনপদ ও সম্প্রদায়কে সমূলে বিনাশ করে দিয়েছেন। ইয়াকুব (আ.) এর সর্বাধিক বিরোধিতা করেছিল ঐ 'ইশতার' দেবতার মন্দিরের পুরোহিতরা যারা সত্যের বিরুদ্ধে টিকতে পারে নি। ইউসুফ (আ.) এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল মিশরের 'আমন' দেবতার খেদমতকারী পুরোহিতরা। ঈসা (আ.) এর প্রবল বিরোধিতা করেছিল তওরাতের ধারক-বাহক আলেম ওলামা তথা রাব্বাই, সাদ্দুসাই, ফরিসিরা। তারা নিজেদের কপালে তাবিজ বানিয়ে তওরাত কেতাবের নির্দেশসমূহ বেঁধে রাখত। ঈসা (আ.) ইহুদি জনগণের সামনে তাদের ধর্মনেতাদের ধর্মব্যবসার মুখোস খুলে দিয়েছিলেন। তিনি যে তিন বছর নব্যুয়তির দায়িত্ব পালন করেন তার প্রায় পুরোটাই কাটে ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বিরোধিতা, ষড়যন্ত্র, হুমকি আর সেসবের বিরুদ্ধে আল্লাহর প্রেরিত সত্যদীনের শিক্ষা প্রচারের মধ্য দিয়ে। তিনি যত মো'জেজা প্রদর্শন করেন সেগুলো এই ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠীর দাবি পূরণ করণার্থেই করেছিলেন। তিনি ইহুদি আলেমদের লক্ষ্য করে বায়তুল মোকাদ্দসে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "শরিয়ত শিক্ষা দেবার ব্যাপারে আলেমরা ও ফরিসিরা মুসা (আ.) এর জায়াগায় আছেন। সুতরাং এরা যা কিছু করতে আদেশ করেন তোমরা তা পালন করো। **কিন্তু তারা যা করেন সেটা তোমরা অনুসরণ করো না, কারণ তারা মুখে যা বলেন কাজে তা করেন না।**

তারা ভারি ভারি বোঝা বেঁধে মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দেন, কিন্তু সেগুলো সরাবার জন্য নিজেরা একটা আঙ্গুলও নাড়াতে চান না। সব কাজই তারা করে থাকেন কেবল লোক দেখানোর জন্য। দাওয়াত খাওয়ার সময় তারা সম্মানের জায়গায় এবং সিনাগগেও প্রধান প্রধান আসনে তারা বসতে ভালোবাসেন।

তারা হাটে-বাজারে সম্মান খুঁজে বেড়ান আর চান যেন লোকেরা 'আমাদের প্রভু' বা রাব্বাই বলে ডাকে। কিন্তু কেউ তোমাদেরকে প্রভু বলে ডাকুক তা তোমরা চেয়ো না, কারণ তোমাদের প্রভু বলতে কেবল একজনই আছেন। আর তোমরা সবাই ভাই ভাই।

ভণ্ড আলেম ও ফরিসিরা, কী নিকৃষ্ট আপনারা! আপনারা মানুষের সামনে জান্নাতে প্রবেশের দরজা বন্ধ করে রাখেন। তাতে নিজেরাও ঢোকেন না আর যারা ঢুকতে চেষ্টা করছে তাদেরও ঢুকতে দেন না। একদিকে আপনারা লোকদের দেখাবার জন্য লম্বা লম্বা মোনাজাত করেন, অন্য দিকে বিধবাদের সম্পত্তি দখল করেন।

ভণ্ড আলেম ও ফরিসিরা, কী ঘৃণ্য আপনারা! আপনারা পুদিনা, মৌরি আর জিরার দশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহকে ঠিকঠাক দিয়ে থাকেন; কিন্তু আপনারা মুসা (আ.) এর শরীয়তের অনেক বেশি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে বাদ দিয়েছেন। যেমন সুবিচার, দয়া এবং সততা। আপনাদের উচিত আগে এইগুলো পালন করা এবং অন্য বিধানগুলোকেও বাদ না দেওয়া। আপনারা নিজেরা অন্ধ অথচ অন্যদের পথ দেখান। একটা ছোট মাছিও আপনার ছাঁকেন অথচ উট গিলে ফেলেন।

ভণ্ড আলেম ও ফরিসিরা, ঘৃণ্য আপনারা। আপনারা খাওয়ার পাত্রের বাইরের দিকটা পরিষ্কার করে থাকেন, কিন্তু পাত্রের ভিতরে আছে কেবল সেই নোংরা জিনিস যা মানুষের উপর জুলুম আর স্বার্থপরতা দ্বারা আপনারা লাভ করেছেন। অন্ধ ফরিসিরা, আগে পাত্রের ভিতরের ময়লাগুলো পরিষ্কার করুন, তাহলে বাইরের দিকটাও পরিষ্কার হবে।

ভণ্ড আলেম ও ফরিসিরা, কী ভয়াবহ আপনারা! আপনারা সাদা ঝকঝকে রং করা কবরের মতো, যার বাইরে থেকে দেখতে খুবই সুন্দর কিন্তু তার ভেতরে আছে মরা মানুষের হাড়-গোড় ও পঁচা গলা লাশ। ঠিক সেইভাবে, বাইরে আপনারা লোকদের চোখে ধার্মিক কিন্তু ভিতরে মোনফেকী আর পাপে পরিপূর্ণ।

হে সাপের দল আর সাপের বংশধরেরা! কিভাবে আপনারা জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবেন?⁽¹⁾

শেষ পর্যন্ত এই ধর্মনেতারাই রোমান গভর্নর পন্টিয়াস পিলাতের কাছে মিথ্যা অভিযোগ পেশ করে ঈসাকে (আ.) ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে।

একইভাবে শেষ নবী মোহাম্মদ (সা.) কেও বহুবার হত্যার চেষ্টা করেছে এই ধর্মজীবী শ্রেণি। **কোরাইশ বংশের লোকেরা ছিল কাবার মোতোয়াল্লী। তাদের আসল ব্যবসাই ছিল ধর্মব্যবসা।** আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন দেব দেবীর উপাসকেরা এই পবিত্র তীর্থকেন্দ্রে হজ্ব করতে, তাওয়াফ করতে আসত। এটাই ছিল তাদের গোত্রের আয়ের মূল উৎস। রসুলাল্লাহ যখন তওহীদের আহ্বান জানালেন, মূর্তিপূজাকে শেরক বলে ঘোষণা করলেন তখন গোত্রপতি সেবায়েতদের মাথায় বাজ পড়ল। এই ভণ্ডামি আর সামাজিক আধিপত্য টিকিয়ে রাখার জন্য সেই কাবাকেন্দ্রিক ধর্মব্যবসায়ীরা এতগুলো বছর সত্যের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে গেছে।

---

(১). বাইবেল, নিউ টেস্টামেন্ট: ম্যাথু ২৩ : ১-৩৪

ধর্মব্যবসার নেপথ্যে দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি

যে কোনো জাতির সুদৃঢ় ঐক্য ভেঙ্গে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে কোনো বিষয় নিয়ে মতভেদ। এই মতভেদই ভাঙ্গনের প্রথম পদক্ষেপ, প্রথম সোপান। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিষয়ে একটি দল, একটি পরিবার বা একটি জাতি একমত থাকে ততক্ষণ তারা ঐক্যবদ্ধ থাকে। যখনই কোনো বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশ করা হয়, তখনই প্রথম ভাঙ্গন আরম্ভ হয়। এই জন্য আল্লাহ বলেছেন, এই দীনকে তোমরা কায়েম করো এবং এ ব্যাপারে মতভেদ করো না।(১) লক্ষ্য করুন, এখানে আল্লাহ কী সম্পর্কে মতভেদ করতে নিষেধ করছেন। **তিনি মতভেদ করতে নিষেধ করছেন দীন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে, কেননা এই বিষয়ে মতভেদ করলে উম্মাহর দ্বারা দীন প্রতিষ্ঠা করাই সম্ভব হবে না অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদী জাতির যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তাই অর্জিত হবে না।** আরও লক্ষণীয় যে এই আয়াতটি এসেছে সুরা 'শুরা'য় যার অর্থ হলো পরামর্শ সভা, আলোচনা অর্থাৎ যেখানে মতভেদের সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। এই ঐক্য যাতে না ভাঙ্গে সে জন্য আল্লাহর রসুল সদা শঙ্কিত ও জাগ্রত থেকেছেন এবং এমন কোনো কাজ যখন কাউকে করতে দেখেছেন যাতে ঐক্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে তখন ভীষণ রেগে গেছেন। একদিন দুপুরে আব্দাল্লাহ বিন আমর (রা.) রসুলাল্লাহর ঘরে যেয়ে দেখেন তাঁর মুখ মোবারক ক্রোধে লাল হয়ে আছে। কারণ তিনি দু'জন আসহাবকে কোর'আনের একটি আয়াতের অর্থ নিয়ে মতবিরোধ করতে দেখতে পেয়েছিলেন। রসুলাল্লাহ (সা.) বললেন কোর'আনের আয়াতের অর্থ নিয়ে যে কোনো রকম মতভেদ কুফর। নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ (উম্মাহ) তাদের (ওপর অবতীর্ণ) কিতাবগুলোর (আয়াতের) অর্থ নিয়ে মত বিরোধের জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে। তারপর তিনি আরও বললেন, (কোর'আনের) যে অংশ (পরিষ্কার) বোঝা যায় এবং ঐকমত্য আছে তা বলো, যেগুলো বোঝা মুশকিল সেগুলোর অর্থ আল্লাহর কাছে ছেড়ে দাও (ওগুলোর অর্থ নিয়ে মতবিরোধ করো না)।(২)

---

১. কোর'আন, সূরা শুরা ১৪

২. হাদীস, আব্দাল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে মোসলেম, মেশকাত

বিশ্বনবী রেগে লাল হয়েছিলেন কেন? কারণ তিনি পরিষ্কার বলেই দিলেন, অর্থাৎ আয়াতের অর্থ নিয়ে মতবিরোধ হয়ে জাতির ঐক্য নষ্ট হওয়া ও পরিণামে যে জন্য জাতির সৃষ্টি সেই সংগ্রামে শত্রুর কাছে পরাজয় ও পৃথিবীতে এই দীনকে প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা। এই হাদিসটিতে রসুলাল্লাহ কেবল কোর'আনের আয়াত নিয়ে মতবিরোধ করতে নিষেধ করেছেন, যদিও এই নিষেধাজ্ঞা যে কোনো মতবিরোধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ যাই হোক মতভেদের ফল একই, বিভক্তি।

রসুলাল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন, দীন সহজ, সরল (সেরাতুল মোস্তাকীম)। দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি সম্পর্কে সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী অনেক জাতিগোষ্ঠী এরূপ বাড়াবাড়ির পরিণামে নিশ্চিহ্ন হয়েছে।"(১)

শেষ নবীর উপর আল্লাহ দায়িত্ব দিলেন মানবজীবনে হেদায়াহ ও সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করার।(২) এটা এই কারণে যে, আল্লাহর দেওয়া সত্যদীন প্রতিষ্ঠা হলে পৃথিবী থেকে যাবতীয় অন্যায়-অবিচার, যুদ্ধ-রক্তপাত, হানাহানি, মারামারি এককথায় অশান্তি নির্মূল হয়ে যাবে; মানবজাতি শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো- ইবলিস আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল যে, সে মানবজাতিকে ফাসাদ (অন্যায়-অবিচার) ও সাফাকুদ্দিমাতে (রক্তপাত) পতিত করবে। এই চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে জয়ী করার জন্য রসুল তাঁর নিজ হাতে প্রশিক্ষণ দিয়ে উম্মতে মোহাম্মদী নামক একটি জাতি গঠন করলেন। অতঃপর সে জাতির জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী শিক্ষা দিলেন। জানিয়ে দিলেন তাঁর অনুপস্থিতিতে জাতির কাজ কী, কীভাবে সেটা বাস্তবায়ন করতে হবে। এভাবেই উম্মতের প্রতি দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দিয়ে তিনি তাঁর প্রভুর কাছে চলে গেলেন। তার পরের ঘটনাপ্রবাহ ইতিহাস।

উম্মতে মোহাম্মদী ডানে-বাঁয়ে না চেয়ে একাগ্র (হানিফ) লক্ষ্যে তাদের কর্তব্য চালিয়ে গেল প্রায় ৬০/৭০ বছর। এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে তদানীন্তন পৃথিবীর এক উল্লেখযোগ্য অংশে এই শেষ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করল। তারপর দুর্ভাগ্যক্রমে আরম্ভ হলো উদ্দেশ্যচ্যুতি, আকিদার বিচ্যুতি। যে কোনো কিছুরই যখন উদ্দেশ্যচ্যুতি ঘটে তখন তার আর কোনো দাম থাকে না, হোক সেটা জাতি, দল, সমিতি, প্রতিষ্ঠান এমনকি ব্যক্তি- যাই হোক। যে মুহূর্ত থেকে উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হয়ে যায় সেই মুহূর্ত থেকে যে কোনো জিনিস অর্থহীন হয়ে যায়।

মহানবীর (সা.) ৬০/৭০ বছর পর থেকে প্রধানতঃ কী কী বিকৃতি প্রবেশ করে এই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিকে নিকৃষ্টতম জাতিতে পরিণত করল তা একটা একটা করে উপস্থিত করছি। কিন্তু সর্বক্ষণ মনে রাখতে হবে যে, সমস্ত বিকৃতির মূল হলো উদ্দেশ্যচ্যুতি, লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া, আকিদা বদলে যাওয়া। যতদিন এই উম্মাহর

---

১. হাদিসঃ আহমাদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ।

২. আল কোর'আন: সুরা আল ফাতাহ-২৮, সফ-৯, তওবা-৩৩।

সামনের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ঠিক ছিল ততদিন তারা একাগ্র লক্ষ্যে (হানিফ) সামনে এগিয়ে গেছে। ছোটখাটো কোনো কিছুই তাদের দৃষ্টি ঘোরাতে পারে নি। কিন্তু যখন লক্ষ্য হারিয়ে গেল তখন চলাও থেমে গেল, চারদিকের নানা কিছু তখন চোখে পড়ল এবং তাই নিয়ে তারা মশগুল হয়ে গেলেন, মহা কর্তব্য ভুলে গেলেন এবং ফলে বিভিন্ন বিকৃতি ঢুকে তাদের ধ্বংস করে দিল।

প্রথম বিকৃতি হলো অতি বিশ্লেষণ, দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি। পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পর তাদের জাতি যার যার দীনকে নিয়ে সেটার ব্যাখ্যা, অতি ব্যাখ্যা, আরও অতি ব্যাখ্যা করতে শুরু করে। যার ফলে ঐ বিভিন্ন ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মতামত গড়ে উঠে। দীনের আসল উদ্দেশ্য, তার মর্মবাণী ভুলে যেয়ে ছোটখাটো বিভিন্ন ব্যবস্থা, ফতোয়া নিয়ে মতান্তর শুরু হয়ে যায় এবং এর ফলে বহুভাগে ভাগ হয়ে জাতিগুলোর ঐক্য নষ্ট হয়ে জাতি ধ্বংস হয়ে যায়। এর যেন পুনঃসংঘটন এই শেষ দীনেও না হয় সেজন্য আল্লাহ সাবধান করে দিলেন এই বলে যে, "তোমরা দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না এবং যে সম্প্রদায় অতীতে বিপথগামী হয়েছে এবং অনেককে বিপথগামী করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ করো না।"(১) দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করার এই নিষেধের অর্থ কী? এর মানে কি এই যে, খুব ধার্মিক হয়ো না বা দীনকে ভালোভাবে অনুসরণ কোরো না বা বেশি ভালো মুসলিম হবার চেষ্টা কোরো না? অবশ্যই তা হতে পারে না। এই বাড়াবাড়ির অর্থ, ঐ অতি বিশ্লেষণ, জীবন-বিধানের আদেশ নিষেধগুলোকে নিয়ে সেগুলোর সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ। যদি জাতির সম্মুখ থেকে তাদের লক্ষ্যস্থল, গন্তব্যস্থল, উদ্দেশ্য- অদৃশ্য না হয়ে যেত তবে তারা আগের মতই এক দেহ এক প্রাণ হয়ে তাদের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম চালিয়ে যেতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তা হয় নি। লক্ষ্য তারা ভুলে গেলেন এবং লক্ষ্য ভুলে যাওয়ার ফলেই ঐ সংগ্রামের কর্মশক্তি মোড় ঘুরে অন্য কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ল। যে জীবন-বিধানকে সমস্ত পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তাঁর শেষ নবীকে (সা.) পাঠিয়েছিলেন এবং যে দায়িত্ব তিনি তাঁর উম্মাহর উপর অর্পণ করে চলে গিয়েছিলেন, উম্মাহও তা উপলব্ধি করে সমস্ত কিছুর মায়া ত্যাগ করে আটলান্টিকের তীর থেকে ৬০/৭০ বছরের মধ্যে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল, পরবর্তীতে সেই সত্য, ন্যায়, সুবিচার, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছেড়ে দিয়ে ঐ জাতি ঐ বিধানগুলোর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আরম্ভ করে দিল।

আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষনবী (সা.) পর্যন্ত আল্লাহ যে দীন মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন, স্থান, কাল ভেদে সেগুলোর নিয়ম-কানুনের মধ্যে প্রভেদ থাকলেও সর্বক্ষণ ভিত্তি থেকেছে একটি মাত্র। সেটা হচ্ছে একেশ্বরবাদ (Monotheism), তওহীদ, একমাত্র প্রভু, একমাত্র বিধাতা (বিধানদাতা) আল্লাহ। যার আদেশ

---

১. আল কোর'আন: সুরা আন নিসা ১৭১, সুরা আল মায়েদা ৭৭।

নির্দেশ, হুকুম, বিধি-বিধান ছাড়া অন্য কারো আদেশ, নির্দেশ, বিধি-বিধান কিছুই না মানা। একেই আল্লাহ কোর'আনে বলছেন দীনুল কাইয়্যেমা। আল্লাহ মানুষের কাছে এইটুকুই মাত্র চান। কারণ তিনি জানেন যে, মানুষ যদি সমষ্টিগতভাবে তিনি ছাড়া অন্য কারো তৈরি বিধান না মানে, শুধু তারই বিধান মানে তবে শয়তান তার ঘোষিত উদ্দেশ্য অর্থাৎ মানুষকে দিয়ে অশান্তি, অন্যায় আর রক্তপাত অর্জনে ব্যর্থ হবে এবং মানুষ সুবিচারে, শান্তিতে (ইসলামে) পৃথিবীতে বসবাস করতে পারবে- অর্থাৎ আল্লাহ যা চান। কত সহজ! কাইয়্যেমা শব্দটা এসেছে কায়েম থেকে যার অর্থ চিরন্তন, শাশ্বত, সনাতন। আল্লাহ এই দীনুল কাইয়্যেমার কথা বলে বলছেন- এর বেশি তো আমি আদেশ করি নি।(১) 'এর বেশি তো আমি আদেশ করি নি' তিনি বলছেন এই জন্য যে, তিনি জানেন যে, ঐটুকু করলেই অর্থাৎ তাঁর বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান মানুষ না মানলেই মানবজাতির মধ্যে পূর্ণশান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সামান্য দাবিটুকুই তিনি মানুষের কাছে আদম থেকে আজ পর্যন্ত করে আসছেন। পূর্ববর্তী বিকৃত জীবন-ব্যবস্থাগুলোতেও আল্লাহর দাবি ছিল ঐ সহজ সরল দাবি- দীনুল কাইয়্যেমা, তওহীদ।

অতি বিশ্লেষণ করে দীনের প্রাণশক্তি বিনষ্ট করে দেওয়ার কাজটা আজকের নতুন নয়, শুধু আমাদের ধর্মীয় পণ্ডিত আলেম-মাওলানারাই যে এই কাজ করেছেন তা নয়। **পূর্ববর্তী দীনগুলোতেও অতি-ধার্মিকরা গজিয়েছেন ও পাণ্ডিত্য জাহির করে তাদের দীনগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।** এ ব্যাপারে আল্লাহ কোর'আনে একটি উদাহরণ দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন তাঁর নবী মুসার (আ.) জীবনী থেকে যেখানে আল্লাহ বনী ইসরাইলদের একটি গরু কোর'বানি করতে আদেশ দিলেন। মুসা (আ.) যখন এই কোরবানির আদেশ বনী ইসরাইলদের জানিয়ে দিলেন তখন যদি তারা মোটামুটি ভালো একটি গরু এনে কোরবানি করে দিত তাহলে তাতেই কাজ হয়ে যেত। কারণ কোরবানির গরুটা কেমন হবে সে সম্বন্ধে আল্লাহ কোনো শর্ত দেন নি। কিন্তু আল্লাহ কোর'আনে বলছেন- বনী ইসরাইল তা করে নি। তারা মুসার (আ.) মাধ্যমে আল্লাহকে প্রশ্ন করতে লাগল- গরুটার বয়স কত হবে, গায়ের রং কী হবে, সেটা জমি চাষের জন্য শিক্ষিত কিনা, জমিতে পানি দেয়ার জন্য শিক্ষিত কিনা, ওটার গায়ে কোনো খুঁত থাকতে পারবে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি।(২) তারা প্রশ্ন করে যেতে লাগল আর আল্লাহ তাদের প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলেন। তারপর যখন প্রশ্ন করার মতো আর কিছুই রইল না তখন স্বভাবতই ঠিক অমন একটি গরু পাওয়া দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। একটা সহজ সরল আদেশ- "একটা গরু কোরবানি কর" এটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এমন কঠিন করে ফেলা হলো যে, অমন গরু আর পাওয়া যায় না। এই জাতির মহাপণ্ডিতরাও

---

১. আল কোর'আন- সুরা আল-বাইয়েনাহ্ ৫।

২. আল কোর'আন- সুরা আল-বাকারা ৬৭-৭১।

বিশ্বনবীর (সা.) ওফাতের ৬০/৭০ বছর পর ঠিক ঐ কাজটিই মহা ধুমধামের সাথে আরম্ভ করলেন। দু'টি মাত্র আদেশ- আমাকে ছাড়া কাউকে মানবে না, আমার দেয়া জীবন-বিধান ছাড়া আর কোনো বিধান মানবে না, আর এই জীবন-বিধানকে সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করবে। সহজ, সরল দু'টি আদেশ। বিশ্বনবীর (সা.) উম্মাহ ইস্পাতের মতো কঠিন ঐক্য নিয়ে ঐ কাজ করতে আরব থেকে বের হয়ে অবিশ্বাস্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। পূর্ববর্তী দীনের পণ্ডিতদের মতো এ উম্মাহর পণ্ডিতরাও একে ধ্বংস করে দিলেন।

এখানে একটা কথা পরিষ্কার করা দরকার। আমি ফিকাহ বা ফকিহদের বিরুদ্ধে বলছি না। কারণ কোর'আন ও হাদিস থেকে জীবন বিধানের নির্দেশগুলো একত্র ও বিন্যাস করলে যা দাঁড়ায় তাই ফিকাহ- অর্থাৎ ফিকাহ ছাড়া কোনো মুসলিমের জীবনব্যবস্থা অনুসরণ অসম্ভব। আমার বক্তব্য ঐ ফিকাহর অতি বিশ্লেষণ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ যা আল্লাহ ও তাঁর রসুল (সা.) কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন। **আমাদের ফকিহরা যদি কোর'আন-হাদিসের মৌলিক আদেশ নিষেধগুলোকে সুন্দরভাবে শ্রেণি বিন্যাস করেই ক্ষান্ত হতেন এবং লিখতেন যে এই-ই যথেষ্ট- এরপর আর অতিরিক্ত বিশ্লেষণে যেও না, কারণ আল্লাহ বলেছেন দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না এবং রসুলাল্লাহও (সা.) নিষেধ করেছেন, তাহলে তাদের কাজ হতো অতি সুন্দর। ইসলামকে প্রকৃতভাবে সেবা করা হতো এবং আল্লাহর কাছ থেকে তারা পেতেন প্রচুর পুরস্কার।** কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে তারা তা করেন নি। তারা আজীবন কঠিন পরিশ্রম করে আল্লাহর আদেশ-নিষেধগুলো ও বিশ্বনবীর (সা.) কাজ ও কথাগুলোকে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ করতে করতে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা পূর্ণভাবে পালন করা প্রায় অসম্ভব এবং কেউ চেষ্টা করলে তার জীবনে অন্য আর কোনো কাজ করা সম্ভব হবে না, এ দীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের তো প্রশ্নই আসে না। কারণ ফকিহরা তাদের ক্ষুরধার প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যেকে হাজার হাজার মাসলা-মাসায়েল সৃষ্টি করেছেন। প্রধান প্রধান গণের এক এক জনের সিদ্ধান্তের সংখ্যা কয়েক লক্ষ। জাতি ঐ মাসলা-মাসায়েলের মাকড়সার জালে জড়িয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে, স্থবির হয়ে গেছে।

সেরাতুল মোস্তাকীমের সহজতার, সরলতার মহাগুরুত্ব উপলব্ধি করে রসুলাল্লাহ (সা.) এক হাদিসে বললেন- দীন সহজ, সরল (সেরাতুল মোস্তাকীম), একে নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করবে তারা পরাজিত হবে। অন্য হাদিসে বললেন, জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে।(১) এই সাবধানবাণীতেও আশ্বস্ত না হতে পেরে বিশ্বনবী (সা.) আরও ভয়ংকর শাস্তির কথা শোনালেন। বললেন- কোর'আনের কোনো আয়াতের অর্থ নিয়ে বিতর্ক কুফর। এবং কোনো অর্থ নিয়ে মতান্তর উপস্থিত হলে আমাদেরকে কী করতে হবে তারও নির্দেশ তিনি আমাদের দিচ্ছেন। বলছেন, কোনো মতান্তর উপস্থিত হলে তা আল্লাহর

---

১. হাদিসঃ আবু হোরায়রা (রা.) থেকে মুসলিম।

উপর ছেড়ে দাও।[১] অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে যখনই মতান্তর উদ্ভব হবে তখনই চুপ হয়ে যাবে, কোনো তর্ক-বিতর্ক করবে না। অর্থাৎ বিতর্কে যেয়ে কুফরি করবে না, এবং যে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই সেই সেরাতুল মোস্তাকীম, দীনুল কাইয়্যেমাকে আঁকড়ে ধরে থাক, এখানে লক্ষ্য করার একটা বিষয় আছে, দীনের ব্যাপার নিয়ে বিতর্ককে আল্লাহর রসুল (সা.) কোন পর্যায়ের গুনাহ, পাপ বলে আখ্যায়িত করছেন। চুরি নয়, হত্যা নয়, ব্যভিচার নয়, বলছেন- কুফর। যার চেয়ে বড় আর গোনাহ নেই, শুধু তাই নয় যা একজনকে এই দীন থেকেই বহিষ্কৃত করে দেয়। এতবড় শাস্তি কেন? শেষ নবীর (সা.) হাদিস থেকেই এর উত্তর পাওয়া যাবে। তিনি বলছেন- তোমরা কি জান, ইসলামকে কিসে ধ্বংস করবে? এই প্রশ্ন করে তিনি নিজেই জবাব দিচ্ছেন- শিক্ষিতদের ভুল, মোনাফেকদের বিতর্ক এবং নেতাদের ভুল ফতোয়া। যে কাজ ইসলামকেই ধ্বংস করে দেয় সে কাজের চেয়ে বড় গোনাহ আর কী হতে পারে! তাই বিশ্বনবী (সা.) এই কাজকে কুফ্‌রি বলেছেন।

এই জাতির মহা দুর্ভাগ্য। আল্লাহর ও তাঁর রসুলের (সা.) এতসব কঠোর সতর্কবাণী এই উম্মাহর পণ্ডিতদের কিছুই মনে রইল না। তারা সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে কোর'আন-হাদিসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে এক বিরাট ফিকাহ শাস্ত্র গড়ে তুললেন। **এদের মনীষার, প্রতিভার, অধ্যবসায়ের কথা চিন্তা করলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে, কিন্তু তাদের ঐ কাজের ফলে এই উম্মাহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্বংস হয়ে গেল। শত্রুর কাছে পরাজিত হয়ে গেল।**

ফিকাহর যে অতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার পক্ষে একটি যুক্তি আছে এবং সে যুক্তি আমি সম্পূর্ণ স্বীকার করি। সেটা হচ্ছে ইসলামের আইন-কানুনের বিচারালয়ে ব্যবহার। অর্থাৎ বিচারালয়ে এই আইনের সূক্ষ্ম প্রয়োগ যাতে কোনো নিরাপরাধ শাস্তি না পায়। **অনৈসলামিক যেসব আইন বর্তমানে পৃথিবীতে চালু আছে, অর্থাৎ মানুষ-রচিত আইনগুলো, এগুলোও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেই বিচারালয়গুলোতে বিচার করা হয়- উদ্দেশ্য সেই একই- সুবিচার। কিন্তু সে জন্য কোনো দেশেই জ্ঞানের অন্যান্য সমস্ত শাখাকে অপ্রয়োজনীয় ঘোষণা করে সেই দেশের সংবিধানের এবং আইনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণকে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয় নি।** শুধু যারা আইনজ্ঞ হতে চান, আইনজীবী হতে চান তারা স্ব-ইচ্ছায় ঐ বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করেন, ডিগ্রী নেন এবং তারপর আদালতে যোগ দেন। অর্থাৎ চিকিৎসা, প্রকৌশল, স্থাপত্য, শিক্ষা, সাংবাদিকতা ইত্যাদির মতো আইনকেও একটি বিশেষ (Specialised) জ্ঞান হিসাবে শিক্ষা করেন। কিন্তু আমাদের ধর্মীয় পণ্ডিতরা তা না করে জাতির মধ্যে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করে দিলেন যে আইনজ্ঞ হওয়াই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, জ্ঞানের অন্যান্য শাখা শিক্ষা করার কোনো প্রয়োজন এ জাতির নেই। এই কাজের আবশ্যম্ভাবী পরিণতি যা হবার তাই হলো, জাতি জ্ঞানের অন্যান্য শাখাসমূহে যে বিস্ময়কর জ্ঞানচর্চা করে

---

১. আল কোর'আন: সুরা নিসা ৫৯, হাদিস: মুসলিম, মেশকাত।

পৃথিবীর শিক্ষকের আসন লাভ করেছিল তা ছেড়ে দিয়ে একটি মূর্খ, অশিক্ষিত জাতিতে পরিণত হলো। উদাহরণরূপে বলা যায় যে, আজকের কোনো রাষ্ট্রে যদি শিক্ষানীতি এই করা হয় যে, সেই রাষ্ট্রের সংবিধান ও ঐ সংবিধান নিসৃত আইন-কানুন ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই একমাত্র শিক্ষার বিষয়বস্তু হবে, বর্তমানের মাদ্রাসা শিক্ষার মতো, তবে কী হবে? নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তাহলে বিদ্যালয়গুলোতে নিচু ও প্রাথমিক শ্রেণি থেকেই ঐ বিষয় একমাত্র পাঠ্যবিষয় করা হবে। দু'এক প্রজন্মের মধ্যেই ঐ রাষ্ট্রের লোকজন শুধু তাদের দেশের সংবিধান ও আইন-কানুনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছুই জানবে না, অন্যান্য সব বিষয়ে অজ্ঞ হয়ে যাবে। জাতির যা ভাগ্য হওয়া উচিত তাই হলো- অন্য জাতির কাছে পরাজিত হয়ে যে সংবিধান ও আইন-কানুন নিয়ে এত বিশ্লেষণ করা, সেই আইন-কানুন বাদ দিয়ে বিজয়ী জাতির অর্থাৎ ব্রিটিশ খ্রিষ্টানদের আইন-কানুন গ্রহণ করা হলো। নিজেদের আইন-কানুন সংবিধান শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোনো রকমে টিকে রইল। যে বিচারক (কাজী) পাঁচশত বছর আগে আদালতে রায় (ফতোয়া) দিতেন, তখন তারা শাসক ছিলেন আর আজ সেই রায়ের বই (ফতোয়ার কেতাব) পড়ে পড়ে মুফতি হওয়ার মধ্যে কী তাৎপর্য রয়েছে তা বুঝে আসে না। তিনশত বছর আগে থেকেই তো এরা অন্য জাতির গোলাম। ব্রিটিশের আইন মোতাবেক রায় (ফতোয়া) দেওয়া হচ্ছে, এখানে এদের ফতোয়ার কী মূল্য? যে আইন শিক্ষাকেই একমাত্র শিক্ষণীয় বলে ঘোষণা করা হলো, মুসলিম দুনিয়াতে আজ সেই আইনে বিচার হয় না, বিচার হয় পাশ্চাত্যের মানুষের তৈরি, গায়রুল্লাহর আইনে, দণ্ড হয় পাশ্চাত্যের দণ্ডবিধি মোতাবেক অর্থনীতি পরিচালিত হয় পাশ্চাত্যের সুদভিত্তিক অর্থনীতি মোতাবেক। অথচ এ সবই ফিকাহ শাস্ত্রের আওতাধীন। তবুও এদের মাদ্রাসাগুলোতে অন্ধের মতো এগুলো পড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে, শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। যে আইনের প্রয়োগই নেই সেই আইনই শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। কী নিষ্ঠুর পরিহাস! অতি বড় সুন্দরী না পায় বর, অতি বড় ঘরনী না পায় ঘর। তাই আল্লাহ ও তাঁর রসুল (সা.) বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার জন্য। কাউকে বাড়াবাড়ি করতে দেখলেই রাগে বিশ্বনবীর (সা.) পবিত্র মুখ লাল হয়ে যেত। কারণ তিনি জানতেন যে, অতি বড় সুন্দরী ও অতি বড় ঘরনীর মতো অতি বড় মুসলিম না পায় দুনিয়া না পায় জান্নাত।

খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ফলে মাসলা-মাসায়েলের জটিল জালে আটকা পড়ে সমস্ত জাতিটাই মাকড়সার জালে আটকা পড়া মাছির মতো অসহায়, স্থবির হয়ে গেল। ঐ স্থবিরতার অবশ্যম্ভাবী ফল হয়েছে শত্রুর ঘৃণিত গোলামি ও বর্তমান অবস্থা; যেখানে অজ্ঞানতায়, অশিক্ষায়, কুশিক্ষায় ইসলামের আগের জাহেলিয়াতের অবস্থাকেও ছাড়িয়ে গেছে। **এই জাতির অধিকাংশ আলেম সাহেব আজ কুয়োর ব্যাঙ। দুনিয়ার খবর যারা রাখেন তাদের চোখে এরা অবজ্ঞার পাত্র, হাসির খোরাক। আসমানের মতো বিরাট উদাত্ত দীনকে এরা তাদের লম্বা কোর্তার পকেটে পুরে মিলাদ পড়ে, বাড়ি বাড়ি দাওয়াত**

খেয়ে আর সুর করে ওয়াজ করে বেড়ান। তবু যদি তাদের ওয়াজের মধ্যে অন্তত কিছু সার কথা থাকত! তাও নেই, কারণ দীনের মর্মকথা, এর উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া এ সবের কিছুই তাদের জানা নেই। আসল দিক অর্থাৎ জাতীয় জীবনের দিকটাকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে ব্যক্তি দিকটার সামান্য যে বাহ্যিক অংশকে এরা আঁকড়ে ধরে আছেন তা পর্যন্ত ভুল। তুচ্ছ মাসলা-মাসায়েল নিয়ে সীমাহীন তর্কাতর্কি বাদানুবাদ করে করে এরা এই জাতির ঐক্য নষ্ট করে দিয়েছেন, যে ঐক্য ছাড়া একটা জাতি ধ্বংস হয়ে যায়, এমন কি দুর্বল শত্রুর হাতেও পরাজিত হয়ে যায়। আর তাই গিয়েছিলও। কিন্তু তাতেও বোধোদয় হয় নি, অসীম অজ্ঞতায় তারা আজও ঐ খুঁটিনাটি মাসলা নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে ব্যস্ত। এই ঘৃণিত কাজ এমন পর্যায়ে গেছেন যে, সুরা ফাতেহার শেষ শব্দটির উচ্চারণ দোয়াল্লীন হবে, না যোয়াল্লীন হবে এই নিয়ে এরা বহু বছর ধরে তর্ক-বিতর্ক করে আসছেন, বছরের পর বছর বাহাস করছেন, বই লিখেছেন, এমন কি মারামারি করে প্রাণে মারা গেছেন। অথচ এটা একটা বিতর্কের বিষয়ই নয়। পৃথিবীর সব জায়গার লোক সব অক্ষর উচ্চারণ করতে পারে না, কিন্তু কোর'আন সবাইকে পড়তে হয়।

আল্লাহর রসুল (সা.) বারবার নিষেধ করে গেছেন দীনের অতি বিশ্লেষণ করতে। বহু হাদিসে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু আমাদের ওলামা, মাশায়েখ, ওয়ায়েজরা তাদের ওয়াজে, উপদেশে ওগুলো উল্লেখ করেন না, কারণ ওগুলো তাদের বিরুদ্ধে চলে যায়। মতভেদের সর্বপ্রধান উৎস স্বভাবতই কোর'আনের আয়াতসমূহ অর্থাৎ আয়াতের অর্থ। হাদিসে উল্লেখ আছে- একদিন বিশ্বনবী (সা.) দুইজন সাহাবাকে কোর'আনের একটি আয়াতের অর্থ নিয়ে তর্ক করতে দেখে রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন। রিপুজয়ী, নফসবিজয়ী সেই সিদ্ধ পুরুষ, মহা বিপদে যিনি নির্ভয়, প্রশান্ত, মাথায় পাহাড় ভেঙ্গে পড়লেও যিনি অটল, অসহনীয় অত্যাচারে যিনি নিষ্কম্প, চরম শত্রুকে যিনি পরম স্নেহে ক্ষমা করেন তিনি যখন রেগে লাল হন তখন অবশ্যই বুঝতে হবে ব্যাপার সাধারণ নয়। আমরা পাই- সেই ইনসানে কামেল আয়াতের অর্থ নিয়ে তর্ক শুনে রেগে শুধু লাল-ই হন নি, বলেছিলেন কোর'আনের আয়াতের অর্থ নিয়ে বাদানুবাদ কুফর। কী সাংঘাতিক কথা! কুফর, একেবারে ইসলাম থেকে বহিষ্কার, যার মাফ নেই। আর একবার পাই তাকে রাগে লাল অবস্থায় যখন একজন সাহাবা তাঁকে (সা.) একটু খুঁটিয়ে উট হারিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত মাসলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমাদের একথা নিশ্চিতভাবে বুঝতে হবে যে, মহানবী (সা.) সাধারণ ব্যাপারে অত রেগে যান নি। যে ব্যাপারে তিনি দেখতে পেয়েছেন যে, এটা একেবারে উম্মাহর জীবন-মরণের প্রশ্ন, তাঁর সারা জীবনের সাধনার সাফল্য ব্যর্থতার প্রশ্ন, ভবিষ্যতে তাঁর সৃষ্ট জাতির ভাগ্যের প্রশ্ন, শুধু তখনই অত রাগান্বিত হয়েছেন।

একটা বিরাট বাড়িকে যদি বিবর্ধক কাচ দিয়ে দেখেন তবে দেয়ালকে বিরাট পাহাড়ের মতো দেখবেন, দেয়ালের অতি ছোট্ট ফাটলকে অনেক বড় আকারে দেখবেন,

বালিকণাগুলোকেও দেখবেন অনেক বড়, ফলে ঘরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বুঝতে পারবেন না। বাড়িটা সম্পর্কে আপনি আসলে অজ্ঞই থেকে যাবেন। আজ দীনকে, জীবন-ব্যবস্থাকে বিবর্ধক কাঁচ দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে দেখতে যেয়ে সমগ্র দীন সম্বন্ধে এই যে অবিশ্বাস্য অন্ধত্ব সৃষ্টি হলো, এই অন্ধত্বের জন্যই এই কথিত আলেম শ্রেণিটি জাতীয় জীবনে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেন না। পাশ্চাত্যদের চাপিয়ে দেওয়া সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ইত্যাদি মেনে নিয়ে খুঁটিনাটি মাসলা-মাসায়েল নিয়েই ব্যস্ত।

আজ এই জাতি যেটা নিজেকে উম্মতে মোহাম্মদী বলে মনে করে, তার দুই প্রভু, দুই বিধাতা, দুই ইলাহ। এরা এক বিধাতার, ইলাহের ইবাদত করে প্রচুর নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, দাড়ি-টুপি, কুলুখ, দোয়া-দরুদ, তাহাজ্জুদ, লম্বা কোর্তা, অপ্রয়োজনীয় ওয়াজ-চিৎকার করে যিকর করে, মেয়েদের বাক্সে ভরে, আর অন্য ইলাহের ইবাদত করে তাদের তৈরি বিচার-ব্যবস্থায় বিচার করে, তাদের তৈরি দণ্ডবিধি অনুযায়ী শাস্তি ও পুরস্কার দিয়ে, তাদের তৈরি তন্ত্র-মন্ত্র অনুযায়ী রাজনৈতিক ও সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করে। এর চেয়ে বড় শেরক সম্ভব নয়, এর চেয়ে বড় বেদাতও সম্ভব নয়।

আল্লাহর প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্বের প্রকৃত দরকার জাতীয় জীবনে, ব্যক্তিগত জীবনে নয়। ব্যভিচার ও চুরি ব্যক্তিগত জীবনের অপরাধ-গোনাহ; শয়তানের প্ররোচনার কাছে হেরে যেয়েই মানুষ ঐ অপরাধ করে। কিন্তু জাতীয় জীবনে আল্লাহকে বা তাঁর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা রিপুর কাছে পরাজয় নয়, চিন্তা ভাবনা করেই তা করা হয়। আল্লাহ অসীম ক্ষমাশীল, অসীম তাঁর অনুকম্পা তাই রিপুর কাছে পরাস্ত হয়ে অন্যায়, গোনাহ করে ফেলে তারপর অকপটে মাফ চাইলে তিনি মাফ করবেন।(১) কিন্তু তাঁর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে তাঁর দেয়া জাতীয় জীবনব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে অন্যের তৈরি, গায়রুল্লাহর তৈরি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তিনি মাফ করবেন না, এটা তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন। কারণ এটা রিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাস্ত হয়ে করা হয় নি, অন্যের প্রভাবে অন্যের শিক্ষায় ভেবেচিন্তে করা হয়েছে- প্রকৃত শেরক, প্রকৃত কুফর। বর্তমানের এই দীনের ধারক বাহকদের ধর্মকর্ম দেখলে আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। এক ইরাকী হজ্বে আসবার আগে খলিফা ওমরের (রা.) ছেলে আব্দাল্লাহর (রা.) সঙ্গে দেখা করে হজ্বের সময় মাছি মারলে কী করতে হবে সে সম্বন্ধে ফতোয়া চাইলেন। আব্দাল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বললেন, "কী আশ্চর্য! যে ইরাকিরা আল্লাহর রসুলের (সা.) নয়নের মনি হুসাইনকে (রা.) হত্যা করেছে তারা মাছি মারার কাফফারার ফতোয়া জিজ্ঞাসা করছে।"(২) বিকৃত আকিদার ফলে আজ মুসলিম জগতের অবস্থা ঐ ইরাকির মতই।

---

১. আল কোর'আন আন-নিসা ৪৮।

২. হাদিসঃ ইবনে আবি না'ম থেকে বোখারি, মুসলিম, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া।

উৎসব ও অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক ধর্মব্যবসা

ধর্ম থেকে ত্যাগের শিক্ষাগুলো বিদায় নিয়েছে বহু আগে। সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে জীবন ও সম্পদ দুটোই ত্যাগ করা লাগে। তাই জেহাদ পরিত্যাগ করা হয়েছে বহু আগেই। বিকল্প হিসাবে প্রচার করা হয়েছে, আত্মার বিরুদ্ধে জেহাদই বড় জেহাদ। সুতরাং জীবন-সম্পদ আর ত্যাগ করার দরকার পড়ছে না। **আনুষ্ঠানিকতা, আনন্দ-উপভোগের ক্ষেত্রগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ করে বাণিজ্যিক রূপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।** যেমন দুটো ঈদ। ৬০/৭০ টাকা ফেতরা দিয়েই তারা সমাজের দরিদ্র মানুষের প্রতি তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করেন আর নিজেরা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে আনন্দ উপভোগ করেন। রমজান মাস মানে সংযমের মাস নয়, বরং রং বেরঙের বাহারী ইফতার আয়োজনের মাস। এই মাসে খতম তারাবি পড়িয়ে হাফেজ সাহেবরা ভালো রোজগার করেন। ঈদুল আজহায় কোরবানি অর্থাৎ ত্যাগের নামে শুরু হয় বিত্ত প্রদর্শন আর গোশত খাওয়ার মহোৎসব। এগুলো ছাড়াও শবে বরাত, শবে মেরাজ ইত্যাদি দিবসগুলোও ধর্মীয় দিক থেকে অতি তাৎপর্যপূর্ণ বলে উপস্থাপন করা হয় এবং এই দিবসগুলোকে ঘিরে ওয়াজ মাহফিল, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি বিবিধ কর্মসূচিকে ইবাদত হিসাবে উপস্থাপন করে ধর্মব্যবসার পথ সুগম করা হয়।

বর্তমানে খতম তারাবির ব্যাপক প্রচলন ঘটানো হয়েছে যার অন্যতম কারণ বাণিজ্যিক। এত বড় কথা কেন বলছি? কারণ প্রথমত আল্লাহর রসুল কখনও খতম তারাবি করেন নি, এটার নামও কোনোদিন শোনেন নি, হাদিসগ্রন্থে তারাবি শব্দটিই নেই এটা সকল আলেমই এক মত। তথাপি একে 'উত্তম বেদাত' হিসাবে সওমের অংশ হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছে। কেন তা বিচার করার জন্য যে কারো সত্যনিষ্ঠ বিবেকই যথেষ্ট হবে। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি, আয়াত গোপন করা ও এর বিনিময় গ্রহণ করাকে আল্লাহ কী প্রকারে হারাম করেছেন এবং এমন কারো অনুসরণ করার আদেশ করেছেন যিনি বিনিময় গ্রহণ করেন না এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত। এবার আমরা দেখব কোর'আন খতম ও খতম তারাবির বিনিময়গ্রহণ সম্পর্কে হাদিস ও ফতোয়ার গ্রন্থগুলোতে কী সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়।

বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে রসুলাল্লাহর (সা.) সিদ্ধান্ত

১. বিশিষ্ট সাহাবি আবদুর রহমান ইবনে শিবল (রা.) বলেন, আমি রসুলাল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা কোর'আন পড় তবে তাতে বাড়াবাড়ি করো না এবং তার প্রতি বিরূপ হয়ো না। কোর'আনের বিনিময় ভক্ষণ করো না এবং এর দ্বারা সম্পদ কামনা করো না।'[১]

জীবনের প্রতিটি বিষয়ের মতো কোর'আন পড়ার মধ্যেও রসুলাল্লাহ পরিমিতিবোধ বজায় রাখতে বলেছেন। কারণ দীর্ঘ সময় কোর'আন পাঠ করলে পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ের মধ্যেই বিরক্তিভাব বা ক্লান্তি বা অমনোযোগ চলে আসতে পারে যা কোর'আনের জন্য মর্যাদাহানিকর। তাই তিনি এই বাড়াবাড়িটা করতে নিষেধ করেছেন। পাশাপাশি কোর'আন পাঠের বিনিময় ভক্ষণ করতে, এমনকি মনে মনে সম্পদ কামনা করতেও নিষেধ করেছেন।

২. রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে কেউ কোর'আন পড়ে সে যেন তা দিয়ে আল্লাহর কাছে চায়। এরপর এমন কিছু মানুষ আসবে যারা কোর'আন পড়ে তার বিনিময় মানুষের কাছে চাইবে।[২]

৩. অর্থের বিনিময়ে কোর'আন খতমের যে ধারা আমাদের সমাজে চালু হয়েছে সে বিষয়ে রসুলাল্লাহর একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, একদিন আমরা একদল লোক এক স্থানে সমবেত ছিলাম। আমাদের মধ্যে আরব, অনারব, কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ সকল শ্রেণির লোকই ছিল। এ অবস্থায় নবী করিম (সা.) আমাদের মধ্যে আগমন করে বললেন, "তোমরা সৌভাগ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছ। তোমরা আল্লাহর কেতাব তেলাওয়াত করে থাক। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসুল বর্তমান রয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে মানুষের নিকট এইরূপ এক যুগ আসবে যখন তীরের ফলক বা দণ্ড যেরূপ সরল ও সোজা করা হয়, লোকেরা কোর'আন তেলাওয়াতকে ঠিক সেইরূপ সরল ও সোজা করবে। তারা দ্রুত তেলাওয়াত করে নিজেদের পারিশ্রমিক আদায় করবে এবং এর জন্য তাদের বিলম্ব সহ্য হবে না।[৩]

বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে আসহাবে রসুলগণ ও তাবেয়ীনদের সিদ্ধান্ত

১. রসুলাল্লাহর সাহাবিরা তাই কখনোই কোর'আন পাঠ বা শিক্ষাদানের বিনিময় গ্রহণ করতেন না, একে আগুনের মতো ভয় করতেন। তারা সবসময় আশঙ্কায় থাকতেন যে কোনোভাবে ইসলামের কাজের বিনিময়ে সম্পদ গ্রহণ করে ফেলেন কিনা। কারণ তারা ইসলামের যাবতীয় কাজ করতেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

---

[১] হাদিস: মুসনাদে আহমদ ৩/৪২৮; মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৫/২৪০; কিতাবুত তারাবীহ।

[২] হাদিস: তিরমিযি/২৯১৭

[৩] হাদিস: মুসনাদে আহমদ, তাফসির ইবনে কাসীর।

পার্থিব জীবনযাপনের চাহিদা মেটাতে তারা হালাল পথে পরিশ্রম করে রোজগার করতেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। আব্দাল্লাহ ইবনে মা'কাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এক রমজানে লোকদের নিয়ে তারাবি পড়ালেন। এরপর ঈদের দিন উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তাঁর কাছে এক জোড়া কাপড় এবং ৫০০ দিরহাম পাঠালেন। তখন তিনি কাপড় জোড়া এবং দিরহামগুলো এই বলে ফেরত দিলেন, আমরা কোর'আনের বিনিময় গ্রহণ করি না।(১)

২. তাবেয়ী যাযান (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি কোর'আন পড়ে মানুষ থেকে এর বিনিময় গ্রহণ করে, সে যখন হাশরের মাঠে উঠবে তখন তার চেহারায় কোনো গোশত থাকবে না, শুধু হাড্ডি থাকবে।(২)

বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে ফকিহ ও ইমামদের সিদ্ধান্ত

এবার দেখা যাক ইসলামের বিশেষজ্ঞ ও ইমামগণ এই ব্যাপারে কী ফায়সালা দিয়েছেন। পূর্ববর্তী আলেম-ওলামাগণ এ বিষয়ে একমত যে, খতমে তারাবির বিনিময় দেওয়া-নেওয়া উভয়ই নাজায়েজ ও হারাম। হাদিয়া হিসেবে দিলেও জায়েজ হবে না।

১. হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, বিনিময় লেনদেন হয় এমন খতম তারাবি শরিয়তপরিপন্থী। এরূপ খতমের দ্বারা সওয়াবের অংশীদার হওয়া যাবে না বরং গোনাহের কারণ হবে।(৩)

২. দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠানটি উপমহাদেশে কোর'আন হেফজ করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। তাদের ফতোয়ার একটি গ্রহণযোগ্যতা আলেম সমাজে রয়েছে। এই দারুল উলুম কর্তৃক প্রদত্ত ফতোয়াতেও আমরা দেখি খতম তারাবির বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ না-জায়েজ। হযরত মুফতি আজিজুর রহমান (রহ.) বলেন, বিনিময় গ্রহণ করে কোর'আন শরিফ তেলাওয়াত করা জায়েজ নেই। যাদের নিয়তে দেওয়া-নেওয়া আছে, তাও বিনিময়ের হুকুমে হবে। এমতাবস্থায় শুধু তারাবি আদায় করাই ভালো। বিনিময়ের কোর'আন তেলাওয়াত না শোনা উত্তম। কিয়ামুল লাইলের সওয়াব শুধু তারাবি পড়লেই অর্জন হয়ে যাবে।(৪)

৩. তারাবিতে কোর'আন পড়ার বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ নেই। দানকারী এবং গ্রহণকারী উভয়েই গোনাহগার হবে। যদি বিনিময়বিহীন কোর'আন শোনানোর

---

১. মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৫/২৩৭, হাদিসঃ ৭৮২১

২. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদিসঃ ৭৮২৪

৩. এমদাদুল ফতোয়া ১/৪৮।

৪. ফতোওয়া দারুল উলুম ৪/২৪৬

মতো হাফেজ পাওয়া না যায়, তবে ছোট ছোট সুরা দিয়ে তারাবি পড়ে নেওয়াই উত্তম।(১)

৪. দেওবন্দি আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারি হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.) স্বয়ং বলেছেন, **তারাবিতে যে পবিত্র কোর'আন পড়ে এবং যে শোনে তাদের মধ্যে অর্থের বিনিময় হারাম।** (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া- ৩৯২) আমাদের দেশের অধিকাংশ কোর'আনে হাফেজগণই এই দারুল উলুম দেওবন্দের ভাবধারায় পরিচালিত কওমী মাদ্রাসার ছাত্র। তারা এই ফতোয়াগুলোর কতটুকু মূল্যায়ন করছেন?

৫. আহলে হাদিস মতাদর্শের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব মাওলানা আব্দুল্লাহ অমৃতসরী লিখেছেন, **বিনিময়ের মাধ্যমে তারাবিতে পবিত্র কোর'আন তিলাওয়াত করা বা বিনিময় নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ হারাম। বরং এরূপ লোকের পেছনে তারাবিও হয় না।**(২)

৬. দারুল ইফতাহ ও দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া রয়েছে - যে হাফেজ সাহেব টাকার লোভে কোর'আন মজিদ শোনান তা শোনার চেয়ে যে সুরা তারাবি আদায় করে তার মুক্তাদি হওয়া ভাল। যদি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোর'আন শোনানো হয় তাহলে ইমামের সওয়াব হবে না, মুক্তাদিরও সওয়াব হবে না।(৩)

৭. বিনিময় দিয়ে কোর'আন খতম শুনে তারাবি আদায় করার চেয়ে সুরা তারাবি আদায় করাকেই অনেক আলেম আমলের দিক থেকে উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। শায়েখ মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.) বলেছেন, "ছোট ছোট সুরা দিয়ে তারাবি পড়ে নিন। **বিনিময় দিয়ে কোর'আন শুনবেন না। কারণ কোর'আন শোনানোর মাধ্যমে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ নেই।**(৪)

৮. বিনিময় নিয়ে তারাবি নামাজে ইমামতকারী ইমামের ব্যাপারে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী (র.) বলেন, আমি বিনিময় নিয়ে নামাজ পড়ানোকে মাকরুহ মনে করি এবং আমার ভয় হয়, ওই সব লোকের নামাজ আবার পড়তে হবে কি না, যারা এমন ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করেন। এরপর তিনি বলেন, আমার মত হলো, বিনিময় গ্রহণ করা যাবে না।(৫)

---

১. ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া ৭/১৭১

২. ফতোয়ায়ে আহলে হাদিস ২/৩০২

৩. দারুল ইফতাহ ও দারুল উলুম দেওবন্দ

৪. জাওয়াহেরুল ফিকহ ১/৩৮২

৫. ফতোয়ায়ে নজিরিয়া ১/৬৪২

৯. হযরত খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) বলেন, বিনিময় দিয়ে পবিত্র কোর'আন শোনা জায়েজ নয়। দানকারী এবং গ্রহণকারী উভয় গোনাহগার হবে।(১)

১০. মুফতি কেফায়াতুল্লাহ (রহ.) বলেন, তারাবিতে পবিত্র কোর'আন শোনানোর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ নেই।(২)

১১. খেদমতের নামে নগদ টাকা বা কাপড়চোপড় ইত্যাদি দেওয়াও বিনিময়ের মধ্যে শামিল। বরং তা বিনিময় ধার্য করা থেকেও জঘন্য। কারণ তাতে দুটি গোনাহ একত্রিত হয়। একটি কোর'আনের বিনিময় গ্রহণের গোনাহ। দ্বিতীয়টি হলো, যে বিনিময় হচ্ছে তা না জানার গোনাহ।(৩)

১২. বিশিষ্ট বেরলভি মুফতি আমজাদ আলী কাদেরী আজমী এক ফতোয়ায় লেখেন, বর্তমানে অধিক প্রচলন দেখা যায়, হাফেজ সাহেবকে বিনিময় দিয়ে তারাবি পড়া হয়- যা জায়েজ নেই। দানকারী ও গ্রহণকারী উভয়ই গোনাহগার হয়। এটুকু নেব বা এটুকু দেবে- এটিই শুধু বিনিময় নয়। বরং যদি জানা থাকে যে এখানে কিছু পাওয়া যায়, যদিও তা নির্দিষ্ট নয়, তা নাজায়েজ। কারণ জানা থাকাও শর্তকৃতের মতো।(৪)

১৩. লা-মাজহাবিদের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী লেখেন, ইমাম আহদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর কাছে বিনিময় নিয়ে তারাবি নামাজে ইমামতকারী ইমামের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, সেরূপ ইমামের পেছনে কে বা কারা নামাজ আদায় করবে? (৫)

এই নিবন্ধে আমরা কোর'আন, হাদিস ও প্রসিদ্ধ আলেমদের ফতোয়ার গ্রন্থ থেকে কিছু দলিল তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এ সমস্ত দলিল ও যুক্তিপ্রমাণের আলোকে যেন মুসলিম উম্মাহ সঠিকভাবে চিন্তা করার পথ খুঁজে পায় সেটাই এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য। **একটি প্রাণঘাতী ভুলের চর্চা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে বলে সেটাকে অনন্তকাল চালিয়ে যেতে হবে এমন ধারণা থেকে আমাদের সবার বেরিয়ে আসা উচিত।** ধর্মব্যবসা ধর্মের ধ্বংস ডেকে আনে, এই সরল কথাটি সকলেই জানেন ও বোঝেন। এখন প্রয়োজন ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ অবস্থান। তাহলেই আমরা আবার আমাদের হারানো গৌরবের দিন ফিরে পেতে পারি।

---

১. ফতোয়ায়ে খলিলিয়া ১/৪৮

২. কেফায়াতুল মুফতি ৩/২৬৫

৩. আহসানুল ফতোওয়া ৩/৫১৪

৪. বেরলভি সম্প্রদায়ের ফতোয়াগ্রন্থবাহারে শরিয়ত ৪/৬৯২

৫. লা-মাজহাবি সম্প্রদায়ের ফতোয়া

ধর্মজীবিকার বিরুদ্ধে দিকে দিকে জাগছে স্পন্দন

২০১৮ এর শুরুতেই তাবলিগ জামায়াতের সর্ববৃহৎ সম্মেলন এস্তেমায় ভারতের উত্তর প্রদেশ থেকে তাবলিগ জামায়াতের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব মওলানা সাদ কান্ধলভী -যিনি এই জামায়াতটি প্রতিষ্ঠাতা মওলানা ইলিয়াস সাহেবের বংশধর, তাঁর এস্তেমায় যোগদান নিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত হয়। দীর্ঘদিন থেকে ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ নামক বৃহৎ বিদ্যাপিঠের আলেম ওলামাদের সঙ্গে মওলানা সাদের মতানৈক্য চলে আসছিল। বাংলাদেশেও দেওবন্দ ফেরকার মাদ্রাসাগুলোর যারা কর্ণধার তারা অনেকে তাবলিগ জামায়াতের সঙ্গেও যুক্ত। এই ফেরকা বা গোষ্ঠীর লোকেরা মাওলানা সাদের এস্তেমায় যোগদানের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন এবং তিনি ঢাকা বিমানবন্দরে এসে নামলে বিমানবন্দর সড়ক অবরোধ করে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এতে বিমানবন্দর সড়কসহ বিভিন্ন সংযোগ সড়ক বন্ধ হয়ে গেলে রাজধানীতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। গণমাধ্যমের ভাষ্যমতে মওলানা সাদের বিরোধীরা মূলত কট্টরপন্থি হেফাজতে ইসলামের সমর্থক। তাদের দাবি, এই ভারতীয় শীর্ষ মওলানা "কোর'আন ও সুন্নাহ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য" করেছেন।

ধর্মানুভূতিতে আঘাত, বিতর্কিত মন্তব্য, কোর'আন সুন্নাহর অবমাননা নিয়ে আমাদের দেশে নয় কেবল গোটা মুসলিম বিশ্বেই হুজুগে আন্দোলন হয়ে থাকে। কারো কোনো মন্তব্যকে নিজেদের মতো করে উপস্থাপন করে ধর্মবিশ্বাসী (কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণাহীন) জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় আবেগকে চাগিয়ে তুলে এই বিক্ষোভ আন্দোলনগুলো করা হয়। মওলানা সাদের যে উক্তিগুলোকে সামনে এনে তার বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ করা হলো এবং তাকে এস্তেমায় অংশগ্রহণ থেকে জোরপূর্বক বিরত রাখা হলো সেই উক্তিগুলোর একটি হচ্ছে - **"পারিশ্রমিক নিয়ে দীন শেখানো দীন বিক্রির নামান্তর। কোর'আনে কারীম শিখিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণকারীর আগে ব্যভিচারীরা/পতিতারা জান্নাতে যাবে।"**

তার অন্যান্য উক্তিগুলো নিয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক বিধায় আমাদের আলোচনা এই উক্তিটির মধ্যেই সীমিত রাখছি। তাবলিগ জামায়াতের সদস্যরা মসজিদে মসজিদে ঘুরে তাদের মতবাদ প্রচার করে থাকেন এবং

মাদ্রাসা পাশ করা পেশাদার ইমামের পেছনেই নামাজ পড়ে থাকেন। সুতরাং ইসলামের খেদমতকারী হওয়ার দাবিদার এই দুটো শাখার মধ্যে মওলানা সাদের এ মন্তব্যটি দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। মাদ্রাসা পাশ করা লোকেদের জীবিকা হচ্ছে কোর'আন হাদীস শিক্ষা দেওয়া, মসজিদে ইমামতি করা ইত্যাদি। আর মওলানা সাদ সেই জীবিকাটিকে দীন বিক্রি বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং যে আলেমরা এই কাজ করছেন তাদেরকে ব্যভিচারী/পতিতারও নিকৃষ্ট এটা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, তাদের আগে ব্যভিচারী/পতিতারা জান্নাতে যাবে। তার এই বক্তব্যের মধ্যে আমাদের একটি আপত্তির জায়গা রয়েছে সেটা হলো, তার মতে ধর্মজীবীরা পতিতাদের পরে জান্নাতে যাবে। আল্লাহ কিন্তু সেটা বলেন না, তিনি বলেছেন, যারা আমার নাজেল করা আয়াতসমূহ গোপন করে এবং তার বিনিময়ে তুচ্ছ পার্থিব মূল্য গ্রহণ করে তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া কিছুই পুরে না। এবং আল্লাহ হাশরের দিন তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব (সুরা বাকারা ১৭৪)। সুতরাং ধর্মজীবীদের জান্নাতে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না, পতিতাদের আগেও না, পরেও না। কোর'আনে আল্লাহ সুস্পষ্টভাবেই বলে দিয়েছেন দীনের বিনিময় গ্রহণকারীদের পরিণতি হবে জাহান্নামের আগুন। তাহলে তাদের জান্নাতের প্রশ্ন ওঠে কীভাবে?

যাহোক, কোর'আন শিক্ষা দিয়ে অর্থগ্রহণ করাকে যে আল্লাহ হারাম করেছেন সেটার পক্ষে আমরা এই গোটা বইয়ে যথেষ্ট দলিল প্রমাণ দিয়েছি যা আল্লাহর আনুগত্যে আগ্রহী এবং যুক্তিবোধসম্পন্ন যে কারো জন্য যথেষ্ট হবে। কেবল মওলানা সাদই নন, আরো অনেক আলেম ওলামাই ইদানীং এই ধর্মজীবিকার বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন। ৫ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে banglanews24.com এর ইসলাম বিভাগে মুফতি আবুল হাসান শামসাবাদীর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে যার শিরোনাম **"ওয়াজের জন্য চুক্তি করে টাকা নেওয়া জায়েজ নেই"**। মওলানা সাদের বক্তব্যের সঙ্গে এই প্রবন্ধের বক্তব্য খুবই সম্পূরক বিধায় এখানে প্রবন্ধের চুম্বক অংশগুলো হুবহু তুলে ধরছি।

মুফতি আবুল হাসান শামসাবাদী লিখেছেন, "ওয়াজ হচ্ছে সাময়িক দীনী দাওয়াত ও নসিহতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। দীনী প্রয়োজনে কাউকে কখনও দীনের দাওয়াত দিয়ে কিংবা নসিহত করে এজন্য তার থেকে বিনিময় দাবি করা বিধেয় নয়। তাই ওয়াজ করার জন্য চুক্তি করে টাকা নেওয়া অথবা টাকা রোজগারের উদ্দেশ্যে ওয়াজ করা নাজায়েজ।

কোর'আনে কারিমে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, 'তারা সেই লোক যাদেরকে আল্লাহতায়ালা পথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব, আপনি তাদের পথ অনুসরণ

করুন। আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো পারিশ্রমিক চাই না। এটা তো সারা বিশ্বের জন্য উপদেশবাণী।'(১)

বস্তুত মানুষকে ওয়াজ-নসিহত করা মানুষকে হেদায়েত বাণী শোনানোর অন্তর্ভুক্ত। এটা মানুষকে হেদায়েতের আকর কোর'আনে কারিম তেলাওয়াত শোনানোর ন্যায়; যা মানুষের হেদায়েতের ওসিলা হবে। আর হাদিস শরিফে মানুষের থেকে বিনিময় লাভের উদ্দেশ্যে তাদেরকে কোর'আন শোনানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

এ সম্পর্কে হাদিসে শরিফে ইরশাদ হয়েছে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে শিবল (রা.) হতে বর্ণিত, রসুলাল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'তোমরা কোর'আন পড়ো এবং তার ওপর আমল করো। আর তাতে সীমালংঘন করো না, তার ব্যাপারে শৈথিল্য করো না, তার বিনিময় খেয়ো না এবং তাকে নিয়ে রিয়া করো না।'(২)

তেমনি অপর হাদিসে এ বিষয়ে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হয়েছে, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি জনৈক পাঠকারীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন- যে কোর'আন পড়ছিলো। অতঃপর সে (মানুষের নিকট) চাইলো। তখন তিনি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়লেন। অতঃপর তাকে বললেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি কোর'আন পড়ে, তার উচিত আল্লাহর কাছে তার বিনিময় চাওয়া। বস্তুত এমন কিছু দল আসবে যারা কোর'আন পড়বে; যার বিনিময় মানুষের নিকট চাবে (তাদের একাজ অবাঞ্ছিত)।'(৩)

অপর হাদিসে এরূপ লোকদেরকে কিছু না দিতে নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'অচিরেই মানুষের ওপর এমন কাল আসবে; যে সময় কোর'আন শোনানোর বিনিময় চাওয়া হবে। সুতরাং যখন তোমাদের কাছে তারা চাইবে, তখন তোমরা তাদেরকে দেবে না।'(৪)

এতো গেল মওলানা সাদ ও মুফতি শাহরানপুরির কথা। এমন শত শত আলেম ওলামা অর্থের বিনিময়ে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের বিরুদ্ধে ইদানিং সোচ্চার হচ্ছেন। এর বিপরীতে পাল্টা মত দিচ্ছেন এমন আলেমও অগণিত। অনলাইনে এ বিষয়গুলো নিয়ে ফতোয়া-পাল্টা ফতোয়ার বন্যা বয়ে যাচ্ছে। তাদের মূল

---

১. সুরা আনআম: ৯০

২. মুসনাদে আহমাদ: ১৫৫৬৮, সুনানে বায়হাকি: ২৬২৪, মুজামে তাবরানি আওসাত: ২৫৭৪

৩. জামে তিরমিজি: ২৯১৭, মুসনাদে আহমাদ: ১৯৯৫৮

৪. আত তাওজিহ লি-শরহিল জামিইস সহিহ: ১৭৪ পৃ.

বক্তব্য হলো, চুক্তি করে টাকা নেওয়া যাবে না, কেউ খুশি হয়ে দিলে নেওয়া যাবে, আলেম ওলামাদের সংসার খরচ নির্বাহ করা জনগণের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে ইত্যাদি। ২০১৭ সনে সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজের চুক্তিমাফিক টাকা লেনদেন নিয়ে, অগ্রিম টাকা নিয়েও ওয়াজে না যাওয়া নিয়ে আয়োজক কমিটির সঙ্গে বিখ্যাত কয়েকজন ওয়াজকারীর বিবাদের ঘটনা ঘটেছে যা নিয়ে আমাদের গণমাধ্যমগুলোতেও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

১১ জুন ২০১৪ তারিখে দৈনিক কালেরকণ্ঠে "পবিত্র কোর'আন খতমের বিনিময়ে হাদিয়া দেওয়া-নেওয়া হারাম" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেখানেও এ প্রসঙ্গে কোর'আন, হাদিস, ফতোয়ার গ্রন্থাদি থেকে প্রচুর দলিল ও প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছিল যেগুলো এ গ্রন্থের পূর্ববর্তী **"উৎসব ও অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক ধর্মব্যবসা"** অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০১৭ তে কিশোরগঞ্জে কোর'আন খতমের বিনিময়ে বা খতম তারাবি পড়িয়ে টাকা গ্রহণের বিরুদ্ধে বেশ কিছু আলেম একটি হ্যান্ডবিল প্রচার করেছেন। তারা সবাইকে উৎসাহিত করছেন হ্যান্ডবিলটি যত বেশি সম্ভব ফটোকপি করে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে তাদের এই সাহসী পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। গত দুই যুগ ধরে হেযবুত তওহীদ বলে আসছে যে ধর্মের কোনো কাজ করেই অর্থগ্রহণ বৈধ নয়, যৌক্তিকও নয়। সব ধর্ম বিকৃত হয়েছে ধর্মব্যবসার দরুন। সব নবী-রসুল এর বিরুদ্ধে রীতিমত লড়াই করে গেছেন। তবু আমাদের সমাজে টাকা ছাড়া ধর্মের চাকা অচল।

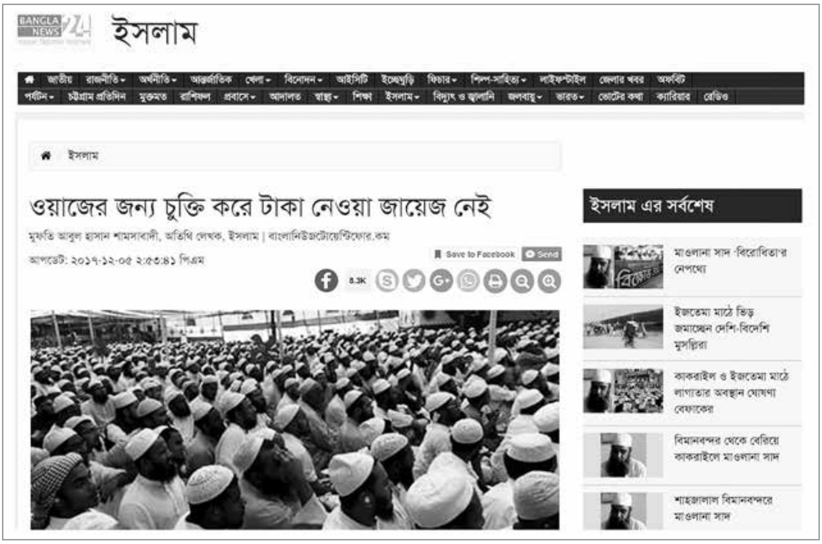
BANGLA NEWS 24
ইসলাম
জাতীয়
রাজনীতি
অর্থনীতি
আন্তর্জাতিক
খেলা
বিনোদন
আইসিটি
ইচ্ছেঘুড়ি
ফিচার
শিল্প-সাহিত্য
লাইফস্টাইল
জেলার খবর
অফবিট
পর্যটন
চট্টগ্রাম প্রতিদিন
মুক্তমত
রাশিফল
প্রবাসে
আদালত
স্বাস্থ্য
শিক্ষা
ইসলাম
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি
জলবায়ু
ভারত
ভোটের কথা
ক্যারিয়ার
রেডিও
ইসলাম
Save to Facebook
Send
8.3K

ওয়াজের জন্য চুক্তি করে টাকা নেওয়া জায়েজ নেই

মুফতি আবুল হাসান শামসাবাদী, অতিথি লেখক, ইসলাম | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

আপডেট: ২০১৭-১২-০৫ ২:৫৩:৪১ পিএম

ইসলাম এর সর্বশেষ

মাওলানা সাদ 'বিরোধিতা'র নেপথ্যে

ইজতেমা মাঠে ভিড় জমাচ্ছেন দেশি-বিদেশি মুসল্লিরা

কাকরাইল ও ইজতেমা মাঠে লাগাতার অবস্থান ঘোষণা বেফাকের

বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে কাকরাইলে মাওলানা সাদ

শাহজালাল বিমানবন্দরে মাওলানা সাদ

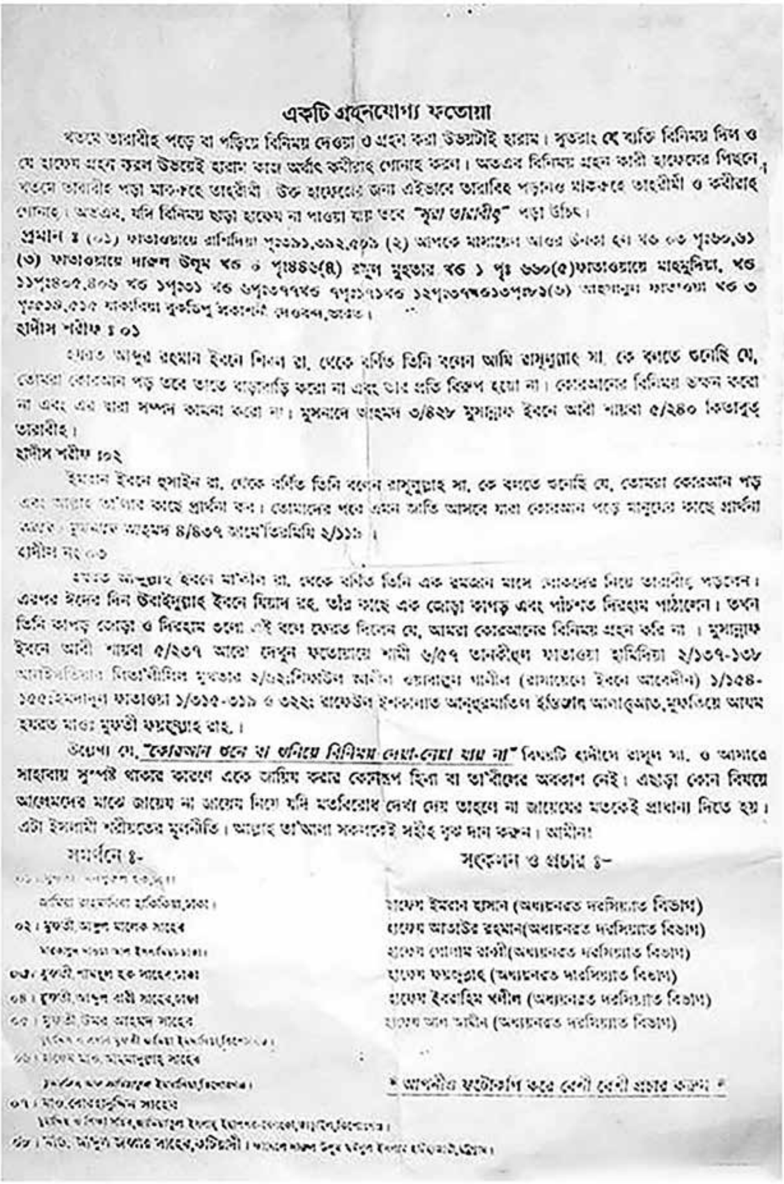

একটি গ্রহণযোগ্য ফতোয়া

খতমে তারাবীহ পড়ে বা পড়িয়ে বিনিময় দেওয়া ও গ্রহণ করা উভয়টাই হারাম। সুতরাং যে ব্যক্তি বিনিময় দিল ও যে হাফেয গ্রহণ করল উভয়েই হারাম কাজ অর্থাৎ কবীরাহ গোনাহ করল। অতএব বিনিময় গ্রহণ কারী হাফেযের পিছনে খতমে তারাবীহ পড়া মাকরূহে তাহরীমী। উক্ত হাফেযের জন্য এইভাবে তারাবিহ পড়ানও মাকরূহে তাহরীমী ও কবীরাহ গোনাহ। অতএব, যদি বিনিময় ছাড়া হাফেয না পাওয়া যায় তবে "সূরা তারাবীহ" পড়া উচিৎ।

প্রমান ঃ (০১) ফাতাওয়ায়ে রাশিদিয়া পৃঃ৩৯১,৩৯২,৫৫৯ (২) আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল খন্ড ০৩ পৃঃ৬০,৬১ (৩) ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম খন্ড ৪ পৃঃ৪৪৬(৪) রদ্দুল মুহতার খন্ড ১ পৃঃ ৬৬০(৫)ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া, খন্ড ১১পৃঃ৪০৭,৪০৬ খন্ড ১৭পৃঃ৩১ খন্ড ৬পৃঃ৩৭৭খন্ড ৭পৃঃ১৭১খন্ড ১২পৃঃ৩৭৯১৩পৃঃ৮১(৬) আহসানুল ফাতাওয়া খন্ড ৩ পৃঃ৫১৪,৫১৫ [illegible] প্রকাশনী দেওবন্দ,ভারত।

হাদীস শরীফ ঃ ০১

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে শিবল রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা কোরআন পড় তবে তাতে বাড়াবাড়ি করো না এবং তার প্রতি বিরূপ হয়ো না। কোরআনের বিনিময় ভক্ষন করো না এবং এর দ্বারা সম্পদ কামনা করো না। মুসনাদে আহমদ ৩/৪২৮ মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৫/২৪০ কিতাবুত তারাবীহ।

হাদীস শরীফ ঃ০২

ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা কোরআন পড় এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা কর। তোমাদের পরে এমন জাতি আসবে যারা কোরআন পড়ে মানুষের কাছে প্রার্থনা করবে। মুসনাদে আহমদ ৪/৪৩৭ জামে'তিরমিযি ২/১১৯।

হাদীস নং ০৩

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মা'কাল রা. থেকে বর্ণিত তিনি এক রমজান মাসে লোকদের নিয়ে তারাবীহ পড়তেন। এরপর ঈদের দিন উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ রহ. তাঁর কাছে এক জোড়া কাপড় এবং পাঁচশত দিরহাম পাঠালেন। তখন তিনি কাপড় জোড়া ও দিরহাম গুলো এই বলে ফেরত দিলেন যে, আমরা কোরআনের বিনিময় গ্রহন করি না। মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৫/২৩৭ আরো দেখুন ফতোয়ায়ে শামী ৬/৫৭ তানকীহুল ফাতাওয়া হামিদিয়া ২/১৩৭-১৩৮ [illegible] ২/৫২:শিফাউল আলীল ওয়াবাল্লুল গালীল (রাসায়েলে ইবনে আবেদীন) ১/১৫৪-১৫৫:ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৩১৫-৩১৯ ও ৩২২: রাফেউল ইশকালাত আনহুরমাতিল ইস্তিজার আলাত্তাআত,মুফতিয়ে আযম হযরত মাওঃ মুফতী ফয়জুল্লাহ রাহ.।

উল্লেখ্য যে, "*কোরআন পড়ে বা শুনিয়ে বিনিময় লেনা-দেনা যায় না*" বিষয়টি হাদীসে রাসূল সা. ও আসারে সাহাবায় সুস্পষ্ট থাকার কারণে একে অস্বীকার করার কোনরূপ হিলা বা তা'বীলের অবকাশ নেই। এছাড়া কোন বিষয়ে আলেমদের মাঝে জায়েয না জায়েয নিয়ে যদি মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে না জায়েযের মতকেই প্রাধান্য দিতে হয়। এটা ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি। আল্লাহ তা'আলা সকলকেই সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন!

সমর্থনে ঃ-

০১। মুফতী [illegible]
[illegible] রহমানিয়া [illegible],ঢাকা।
০২। মুফতী আব্দুল মালেক সাহেব
মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া,ঢাকা।
০৩। মুফতী মাহফুজুল হক সাহেব,ঢাকা
০৪। মুফতী আব্দুল বাকী সাহেব,ঢাকা
০৫। মুফতী উমর আহমদ সাহেব
[illegible]
০৬। হাফেয মাও. মাহমুদুল্লাহ সাহেব
[illegible]
০৭। মাও. [illegible] সাহেব
[illegible]
০৮। মাও. আব্দুল [illegible] সাহেব, [illegible]

সংকলন ও প্রচার ঃ-

হাফেয ইমরান হাসান (অধ্যয়নরত দরসিয়াত বিভাগ)
হাফেয আতাউর রহমান(অধ্যয়নরত দরসিয়াত বিভাগ)
হাফেয গোলাম রাব্বী(অধ্যয়নরত দরসিয়াত বিভাগ)
হাফেয ফয়জুল্লাহ (অধ্যয়নরত দরসিয়াত বিভাগ)
হাফেয ইব্রাহিম খলীল (অধ্যয়নরত দরসিয়াত বিভাগ)
হাফেয আল আমীন (অধ্যয়নরত দরসিয়াত বিভাগ)

* আপনীও ফটোকপি করে বেশী বেশী প্রচার করুন *

ধর্মব্যবসায়ী ও ইসলামের কথিত বিশেষজ্ঞদের কয়েকটি বড় ব্যর্থতা

এটা দৃশ্যমান বাস্তবতা যে আমাদের আলেমরা ওয়াজ করছেন, ধর্ম উপদেশ দিচ্ছেন, মসজিদে ইমামতি করছেন, মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করছেন, বিভিন্ন সমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছেন, গণমাধ্যমে বহু ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। এসব থেকে মনে হচ্ছে যেন দীনের অগ্রগতি সাধনে আলেমদের অনেক অনেক অবদান, অনেক কিছু করছেন আলেমরা। কিন্তু বাস্তবে তাদের কাজের ফলে সমাজে কী ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সেটার একটি বিচার করা প্রয়োজন আছে। যে কোনো উদ্যোগেরই সাফল্য আর ব্যর্থতার হিসাব মিলাতে হয়।

১. ইসলামকে যুগোপযোগী ও সার্বজনীন দীন হিসাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থতা:

আমাদের আলেম সাহেবদের বড় ব্যর্থতা হলো ইসলামকে বর্তমান যুগের উপযোগী হিসাবে উপস্থাপন করতে না পারা। তারা হাজার বছর আগের রচনা করা মাসলা মাসায়েল আর ফতোয়াগুলোকে দিয়ে আধুনিক দুনিয়া চালাতে চান। ইসলামকে তারা সর্বাধুনিক বলেন মুখে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্রভেদে এর পরিবর্তনশীলতাকে অস্বীকার করেন এবং ক্ষিপ্ত হয়ে যান।

ইসলামের প্রসঙ্গ উঠলেই তারা প্রাচীন ফিকাহ্ আর ফতোয়ার কেতাব নিয়ে বসেন। পাঁচশ বছর আগের খোতবা এখনো মসজিদে পড়ে শোনান। এসব ফতোয়ার বিপরীতে যুক্তি, বিবেকের দাবি দূরে থাক কোর'আনকে মানতেও অনেকে নারাজ। আকাশের যত তারা ফতোয়ার তত ধারা। সুতরাং ইসলাম তাদের কুক্ষিগত থাকতে বাধ্য, জনগণ কোনোদিন ইসলাম বুঝতে সক্ষম হোক এটা তারা হতে দেবেন না।

আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে রসুলাল্লাহর (সা.) উপর যে কেতাব নাজিল হয়েছিল সেই কেতাব কোর'আন হচ্ছে এমন কিছু মূলনীতির সংকলন যেগুলো শাশ্বত ও চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোর'আনের একটি প্রতিশব্দ হচ্ছে জেকের। এর অর্থ হচ্ছে স্মরণ রাখা। কী স্মরণ রাখবে? আল্লাহর

আদেশ-নিষেধগুলো বাস্তব জীবনে মনে রেখে পথ চলবে। ন্যায়-অন্যায়ের এই মানদণ্ড কোর'আন ঠিক করে দিয়েছে বিধায় কোর'আনের আরেকটি নাম হচ্ছে আল-ফোরকান অর্থাৎ সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। আল্লাহর আদেশ নিষেধের সমষ্টিই হলো তাঁর হুকুম। এই হুকুম মান্য করার অঙ্গীকার করেই মো'মেন হতে হয়, এটাই তওহীদের ঘোষণা - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা নেই। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ মানা আর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকাই হবে তাকওয়া (সাবধানে পথ চলা)। এই তাকওয়া যারা করবে তারাই মুত্তাকি, মুত্তাকিদের জন্য আল্লাহ জান্নাত নির্ধারিত করে রেখেছেন।(১) যিনি যত বেশি তাকওয়া অবলম্বন করবেন তিনি জান্নাতের ততই উচ্চস্তরে অবস্থান করবেন। এটাই হচ্ছে মর্যাদার মানদণ্ড। এ কথাটিই আল্লাহ বলেছেন, "হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, মর্যাদাবান যে সর্বাধিক মুত্তাকি। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।"(২)। বিদায় হজ্বের ভাষণে আল্লাহর এ কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন রসুলাল্লাহ। তিনি বলেছেন, হে মানুষ! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু এক, তোমাদের পিতা (আদম) এক। তোমাদের প্রত্যেকেই আদমের সন্তান. আর আদমের সৃষ্টি মাটি হতে। সাবধান! অনারবের উপর আরবের কিংবা আরবের উপর অনারবের, কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের কিংবা শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। যার মধ্যে তাকওয়া আছে সে-ই শ্রেষ্ঠ। অথচ আজ প্রচলিত ইসলামের মধ্যে লেবাসকেই পরজেহগারি ও তাকওয়ার মানদণ্ড বলে ধার্য করা হয়েছে। **আরবীয়রা জন্মগতভাবে পাক্কা মুসলমান, মাদ্রাসায় পড়লে পাক্কা মো'মেন বান্দা বলে মনে করা হচ্ছে।** আর আল্লাহর সমস্ত হুকুম অমান্য করে শুধু মুখে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" - উচ্চারণ করাকেই মো'মেন-মুসলিম হওয়ার পদ্ধতি বলে সাব্যস্ত করে নেওয়া হয়েছে। এগুলোই হচ্ছে জাহেলিয়াতের যুগের ন্যায় বর্ণবাদী ধ্যানধারণা।

আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা আমাকে স্মরণ রাখলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণে রাখব।"(৩)। প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহ কীভাবে স্মরণে রাখবেন? মানুষ যখন আল্লাহর আদেশ নিষেধ মোতাবেক জীবনের সিদ্ধান্তগুলো নেবে তখনই আল্লাহর আল্লাহর সাহায্য আসবে অর্থাৎ মানবজীবন থেকে সকল অন্যায়-অবিচার দূর হয়ে ন্যায়-সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর রহমত ও বরকত বিরাজ করবে। এই আদেশ-নিষেধগুলো রসুলাল্লাহর (সা.) মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির

---

১. সুরা সোয়াদ ৪৯-৫০

২. আল কোর'আন, সুরা হুজরাত ১৩

৩. আল কোর'আন, সুরা বাকারা ১৫২

জন্য এসেছে বলেই তাঁর উপাধি আল্লাহ দিয়েছেন রহমাতাল্লিল আলামিন, বিশ্বজাহানের জন্য রহমত।(১) অথচ আজকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম, বিধান প্রত্যাখ্যান করে গোল হয়ে বসে পাড়া মহল্লা কাঁপিয়ে 'আল্লাহু আল্লাহু' যপ করাকেই জেকের বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

যাহোক, কথা হচ্ছিল কোর'আনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়মনির্ভর অনুশাসন প্রসঙ্গে। যেমন কোর'আনে ঐক্যবদ্ধ থাকার কথা বলা হয়েছে। ঐক্য মানেই শক্তি, এ কথাটি লক্ষ বছর আগেও সত্য ছিল, এখনও সত্য। কোর'আনে দীনের মূলনীতিগুলো এমন যেগুলো কেয়ামত পর্যন্তই অপরিবর্তনীয়। এ জন্যই এই দীনের নাম আল্লাহ দিয়েছেন দীনুল কাইয়্যেমাহ অর্থাৎ শাশ্বত ও সনাতন, চিরন্তন ও প্রতিষ্ঠিত জীবনব্যবস্থা।(২) এই সব মূলনীতির পরিবর্তন করলে বিপর্যয় ঘটতে বাধ্য। মানবজীবনে আজ এটাই ঘটেছে, আমাদের সামগ্রিক জীবনে যে বিপর্যয় নেমে এসেছে তার মূল কারণ প্রাকৃতিক সত্যগুলোকে অমান্য করে নিজেরা নিজেদের প্রবৃত্তি মোতাবেক জীবনব্যবস্থা তৈরি করা। এই প্রবৃত্তির অনুসরণকেই আল্লাহ বহু আয়াতে হাওয়াউন বলে উল্লেখ করেছেন। যারা হাওয়াউন করবে অর্থাৎ নিজেরা বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লাহর হুকুম প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত নীতিমালা ও হুকুম জীবনে প্রয়োগ করবে তাদেরকে আল্লাহ (১) তারা কুকুরের ন্যায়,(৩) (২) জালেম ও পথভ্রষ্ট,(৪) (৩) অভিভাবকহীন,(৫) (৪) ফাসেক,(৬) (৫) জাহান্নামী।(৭) খেয়াল করুন এই হাওয়াউন কত সাংঘাতিক অপরাধ! এর পরিণাম একেবারে ইসলাম থেকে বহির্গত হয়ে যাওয়া। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের বিজ্ঞ আলেমসমাজের মধ্যে কোনো আলোচনা নেই।

কোর'আনের পরিভাষাগুলোকে নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে করতে সেগুলোর মূল তাৎপর্যই তারা দুর্বোধ্যতার অন্ধকারে হারিয়ে ফেলেছেন যা এখন সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার বাইরেই চলে গেছে। সেগুলোকে চলমান সময়ের উপযোগী করে, এ যুগের মানুষের চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও যৌক্তিকরূপে উপস্থাপন করতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন বলেই ইসলাম সেই শ্রেণিটির মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে আছে। **সাধারণ মানুষ এখন ইসলাম সম্পর্কে কথা বলতে গেলেই বলেন, "আমরা ভাই ইসলাম সম্পর্কে কিছু বুঝি না। ইসলাম খুব কঠিন বিষয়,**

---

১. আল কোর'আন, সুরা আম্বিয়া ১০৭

২. আল কোর'আন, সুরা বাইয়্যেনাহ ৫

৩. সুরা আরাফ ১৭৬

৪. সুরা কাসাস ৫০

৫. সুরা বাকারা ১২০

৬. সুরা মায়েদা ৪৯

৭. সুরা নাযিয়াত ৪০

জটিল বিষয়। এ সম্পর্কে আলেমরাই ভালো জানেন।” ইসলামের আরো কয়েকটি পরিভাষা নিয়ে পরবর্তী একটি অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব।

যে কথা বলছিলাম, রসুলাল্লাহ (সা.) সে সময়ের আরবদের জন্য উপযোগী করে, তাদের জীবনের সাথে মিলিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল একটি দীন, ইসলাম শিক্ষা দিয়েছেন। আরবীয়রা আগে থেকে যে পোশাক পরতো রসুল তাদেরকে ভিন্ন কোনো পোশাক পরিধানের নির্দেশ দেন নি। তিনি কেবল অশ্লীলতাকে দূর করে পোশাকের মধ্যে শালীনতা আনয়ন করেছেন। আবার অনারব কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তাকেও আরবীয় পোশাক পরতে বাধ্য করেন নি। কেননা ইসলামে পুরুষের পোশাকের নীতিমালা হচ্ছে সতর ঢাকা আর সেটা হচ্ছে নাভি থেকে হাঁটু অবধি। আপনি যে কোনো পোশাক দিয়ে যদি এটুকু আবৃত রাখেন ইসলাম তাতে কোনো বিধিনিষেধ দেয় না। রসুল নিজেও আরবের পোশাক ও খাদ্যে অভ্যস্ত ছিলেন। এ কথাগুলোই হাদিসে এসেছে।

এখন সমস্যা হচ্ছে আমাদের আলেম সাহেবরা সেই আরবীয় প্রেক্ষাপটকেই ইসলাম বানিয়ে নিয়েছেন। তাদের কাছে আরবি ইসলামের ভাষা, খেজুর খাওয়া সুন্নত, দাড়ি রাখা, আরবীয় পোশাক, চেক রুমাল, পাগড়ি পরা সুন্নত। তারা এটা বুঝতে নারাজ যে, আল্লাহর রসুল অন্য দেশে আসলে তিনি সে দেশের ভাষায়ই কথা বলতেন, সে দেশের খাদ্যই খেতেন। তারা সেই আরবীয় সংস্কৃতিগুলোকে ইসলাম মনে করে সেগুলোকে মুসলিমদের উপর চাপানোর জন্য মরিয়া। কেউ উত্তম মুসলিম হতে গেলে প্রথমেই তাকে দাড়ি, টুপি, লেবাস ইত্যাদির শর্ত পূরণ করতে হবে। শার্ট প্যান্ট টি শার্ট জিন্স ইত্যাদি পরে যেন কোনভাবেই ভালো মুসলিম হওয়া যাবে না, ইসলামের কথা বলা যাবে না। তাদের সবাই যে এমন তা কিন্তু নয়। কিছু কিছু আলেম এই অচলায়তন থেকে বের হতে সক্ষম হয়েছেন। একটি উদাহরণ দিই। হাফেজ মাহমুদুল হাসান তার “ইবাদতের নামে প্রচলিত বিদ’আতসমূহ” গ্রন্থে আরবীয় ধাচের পোশাককে সুন্নতি লেবাস বলাকে গর্হিত অপরাধ বলে রায় দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: “ইসলামে সুন্নতি পোশাক বলতে বিশেষ ছাঁট বা ডিজাইন এবং বিশেষ সাইজের লম্বা/খাটো জামাকে বুঝানো এবং বোঝা দীনের মধ্যে একটি বেদাত বা সংযোজন। কারণ, ইসলামে পোশাকের ব্যাপারে যে মূলনীতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে তা হলো-

১. লজ্জাস্থানকে আবৃত করে রাখবে।

২. সৌন্দর্যবোধ, ভদ্রতা, শালীনতা, রুচি এবং সুস্থতার পরিচায়ক হবে।

৩. কুরুচিপূর্ণ এবং নির্লজ্জতা প্রকাশকারী হবে না। সাথে সাথে বাহুল্য খরচ, অহংকার ও দম্ভ প্রকাশক হতে পারবে না।

৪. পুরুষদের পোশাক মহিলাদের পোশাকের সাথে আর মহিলাদের পোশাক পুরুষদের পোশাকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারবে না। যে কোনো পোষাকে উপরোক্ত শর্তাবলী বিদ্যমান থাকলে সেটি কোর'আন-হাদিস মোতাবেক পোশাক বলে বিবেচিত হবে।

অতএব, বিশেষ ধরনের পোশাক যেমন- টাখনু পর্যন্ত লম্বা জামা, পায়জামা বা লুঙ্গীর উপর পরিহিত আরবীয় জোব্বা জাতীয় জামাকে সুন্নতি লেবাস বলে চালিয়ে দেয়া একটি বড় বেদাত।(১)

১৪০০ বছরে মানুষের রুচি অভিরুচিতে বিবর্তন সাধিত হবে এটা খুব স্বাভাবিক ও সময়ের বৈশিষ্ট্য। এই পরিবর্তনকে অস্বীকার করে কোনো জীবনব্যবস্থাই টিকে থাকতে পারে না। এই দীর্ঘ সময়ে যোগাযোগব্যবস্থা, প্রযুক্তি, বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে যার মূলে মুসলিম বিজ্ঞানীদেরও অনেক অবদান ছিল। এই যে বিবর্তিত সময় উপস্থিত হয়েছে, এই গতিশীল যুগেও যুক্তি ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিচারিক ইত্যাদি যাবতীয় সমস্যার সমাধান যে ইসলাম করতে পারে, ইসলাম সারা দুনিয়াকে আরব বানাতে চায় না এইভাবে ইসলামটাকে উপস্থাপন করতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। তারা এখনও সেই পুরনো যুগের সমাধানগুলো দিয়ে এ যুগের সমস্যাকে মোকাবেলা করতে উৎসুক। এক হাজার বছর আগের সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে সমস্যার যে সমাধান ইমাম গাজ্জালী (রা.) বা ইমাম আবু হানিফারা (রা.) দিয়ে গেছেন সেই ওখান থেকে সরে আসাকে তারা ইসলাম ত্যাগ করার মতো গর্হিত অপরাধ জ্ঞান করেন। তারা এটা বুঝতে অক্ষম যে, আল্লাহর রসুলের হাতে গড়া উম্মতে মোহাম্মদীর পরবর্তী যুগের ফেরকা মাজহাবের আলেম ওলামাদের অতি বিশ্লেষণের ফসল হিসাবে যে জটিল, দুর্বোধ্য ইসলামটি দাঁড়িয়ে গেছে সেটা সেই যুগে হয়তো জোর করে চালানো গেছে, কিন্তু এই যুগে তা বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে বাধ্য।

যুগের সাথে খাপ খাচ্ছে না বলে মানুষ তা গণহারে প্রত্যাখ্যান করছে, তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ছে জোর করার - অথচ দীনের মূলনীতির একটি হচ্ছে - দীনের মধ্যে কোনো জবরদস্তি নেই।(২) তারা বলছেন নারীদের ঘরে থাকতে হবে, নারী নেতৃত্ব হারাম, ছেলেদের দাড়ি রাখতে হবে, আরবীয় লেবাস পরতে হবে, নাচ-গান-ছবি আঁকা, ভাস্কর্য তৈরি সব হারাম। কোর'আন এগুলোর একটাকেও প্রত্যক্ষভাবে হারাম করে নি, কিন্তু ফতোয়া দিয়ে সবই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমন বহু উদাহরণ দেওয়া যাবে।

---

১. "ইবাদতের নামে প্রচলিত বিদ'আতসমূহ" - হাফেজ মাহমুদুল হাসান

২. আল কোর'আন: সুরা বাকারা ২৫৬

আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত ইসলাম থেকে সরে যাওয়ার পর থেকে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে দীনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মাসলা মাসায়েল বের করে তা দিয়ে পূর্ণ যে জটিল দুর্বোধ্য দীনটি দাঁড়িয়েছে সেটাকেই ইসলাম বলে মনে করা হচ্ছে। **সেই বিকৃত ইসলামটা কতটুকু অন্ধত্ব ও কূপমণ্ডুকতায় আচ্ছন্ন, গোড়ামিতে পূর্ণ, তার চিন্তাচেতনার গতিপ্রকৃতি কী - এর বাস্তব নিদর্শন হচ্ছে জঙ্গিবাদী ইসলাম যাদের কার্যকলাপ বিশ্বজুড়ে প্রবল ইসলামভীতির** (Islamophobia) **সৃষ্টি করেছে**। প্রকৃত ইসলাম তো অন্য জাতিগোষ্ঠীর দ্বারা এমন ঘৃণিত হয় নি? প্রকৃত ইসলাম যে এমন ছিল না, এ সরল কথাটি বোঝার জন্য যে মানবিক হৃদয় লাগে সেটার কবর তারা বহু বছর আগেই রচনা করেছেন। তাদের হৃদয়ে মোহর, চোখে পর্দা, কানে তালা।

২. মানুষের আত্মার উপর তাদের উপদেশ প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ:

আলেমদের আরেকটি বড় ব্যর্থতা হলো যে তারা ওয়াজ করে ইসলামের পথে চলার উপদেশ মানুষকে দেন এবং এটাই তাদের মূল কাজ বলে বিবেচিত হয়। সামাজিক অপরাধ, নিরাপত্তাহীনতা, অবিচার, বৈষম্য, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি আমাদের সমাজের বাস্তব সমস্যা। **ইসলামে যে জিনিসগুলোকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয় যেমন সুদ, ঘুষ, রাহাজানি, দুর্নীতি, ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার, গুম-খুন, অন্যের হক নষ্ট করা ইত্যাদি তালিকা করলে অন্তত দশটা অপরাধকে নির্দিষ্ট করে তারা যদি সেগুলোর বিরুদ্ধে প্রথামাফিক ওয়াজ নসিহত করতে থাকেন তাহলে কি সমাজ থেকে ঐ অপরাধগুলো দূর হবে বা সামান্যও হ্রাস পাবে? পাবে না**। তার প্রমাণ আজ থেকে দশ বছর আগের তুলনায় দেশে মাদ্রাসা ও মসজিদের সংখ্যা অর্থাৎ আলেমের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের ওয়াজ নসিহতও বেড়েছে আর যে অপরাধগুলো বললাম সেগুলোর মাত্রাও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, তারা মানুষের মন থেকে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস করতে, মানুষের আত্মাকে বিশুদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এর কারণ একজন অন্যায়কারী আরেক অন্যায়কারীকে অন্যায় করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। **একজন পেশাদার রাজনীতিবিদ যখন তার বক্তৃতায় মানুষকে দেশমাতৃকার জন্য ত্যাগ স্বীকার করার আহ্বান করেন তাতে মানুষ কতটা অনুপ্রাণিত হয়?** অনেকে বলেন, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আলেম সাহেবদের জুম্মার খোতবায় বয়ান করা উচিত, তাদের বিরাট দায় রয়েছে। কিন্তু ধর্মজীবী আলেমসমাজ জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে চাইলে তা গ্রহণযোগ্যতা পায় না। কারণ জঙ্গিবাদীরা ঈমানী চেতনা দ্বারা আত্মোৎসর্গীকৃত (যদিও সেটা ভুল পথ) পক্ষান্তরে ধর্মজীবী দরবারী আলেমরা টাকার বিনিময়ে ওয়াজ করেন। তাদের ওয়াজের কোনো তাসির (প্রভাব) মানুষের উপর পড়ে না, জনতা কেবল ওয়াজ শোনার সওয়াবটারই প্রত্যাশী (যদিও এতে কোনো ফায়দা হয় না।) কোনো দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তা যদি ঘুষের বিরুদ্ধে

উপদেশ দেয় তার ফল যতটুকু হবে, লেবাসধারী ধর্মব্যবসায়ীরা বা ধর্ম থেকে পার্থিব স্বার্থ হাসিলকারীরা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বা কোনো সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে ওয়াজ করলে ততটাই ফলপ্রদ হবে। আল্লাহ যদি তাদের প্রশ্ন করেন, "তোমরা কি লোকদেরকে সৎ কাজে আদেশ করছ এবং তোমাদের নিজেদের সম্বন্ধে বিস্মৃত হচ্ছ? অথচ তোমরা গ্রন্থ পাঠ কর; তাহলে কি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করছ না?"(১) তারা এর কী জবাব দেবেন? অথবা যদি বলেন, "তোমরা এমন কথা কেন বলো যা তোমারা নিজেরা করো না। তোমরা নিজেরা যা করো না তা অপরকে করতে বলা আল্লাহর ক্রোধ উদ্রেক করে।"(২) তাদের ক্রিয়াকলাপ যে আল্লাহর ক্রোধ উদ্রেক করছে তা দুনিয়াজোড়া তাদের লাঞ্ছনা ও হীনতার জীবনের দিকে তাকালে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

৩. জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আদর্শিক মোকাবেলায় ব্যর্থতা:

জঙ্গিবাদ ইসলাম নয়, এটি আসলে সাম্রাজ্যবাদীদের পাতানো একটি ফাঁদ। এর ফলে মুসলিমদেরই ক্ষতি হয়েছে, তাদেরই দেশ ধ্বংস হয়েছে। সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটা হয়েছে তা হলো, ব্যর্থ হয়ে যাওয়া গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, পুঁজিবাদের পর বিকল্প জীবনদর্শন হিসাবে ইসলামের জনপ্রিয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটায় ইসলামের কথা বলারও অবস্থা নেই। তাদের অন্ধত্ব আর বর্বর মনোবৃত্তি দেখে বহু মুসলিম ইসলামের প্রতিই বীতশ্রদ্ধ ও ভীত হয়ে গেছেন। এই জঙ্গিবাদ যে আসলে ইসলামের অপব্যাখ্যা সেটা যুক্তিপূর্ণভাবে আমাদের আলেমসমাজ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এক আলেম জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ফতোয়ার বই লেখেন এবং নিজ ফতোয়ার পক্ষে অপরাপর আলেমদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন, অন্যদিকে হাজার হাজার আলেম তার বিরোধিতা করেন। এত দ্বিধা কেন তাদের? উল্টো তাদের একটি বিরাট সংখ্যা জঙ্গিবাদের বিস্তারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখছেন।

৪. ইসলামের সমালোচকদের জবাব দিতে না পারা:

ইসলামবিদ্বেষী ও সমালোচকগণ ইসলামের ত্রুটি সন্ধান করবে, বিদ্বেষ প্রচার করবে সেটা অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। কিন্তু সেই সমালোচনাগুলোর যুক্তিসঙ্গত উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব ছিল আলেম সমাজের, যেহেতু তারা নিজেদের ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া বলে মনে করেন এবং প্রচারও করেন। **রসুলাল্লাহ (সা.) যখন ছিলেন তখন ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ কোনো অপপ্রচার বা অভিযোগ আরোপ করলে আল্লাহ আয়াত নাজিল করে বা রসুল নিজে সেগুলোর খণ্ডন করতেন, জবাব দিতেন। পরবর্তীতে এ দায়িত্ব এসে বর্তায় যারা দীনের ধ্বজাধারী তাদের উপর। কিন্তু আমাদের**

---

১. আল কোর'আন: সুরা বাকারা ৪৪

২. আল কোর'আন, সুরা সফ ২-৩

আলেমগণ ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিকদের কোনো অভিযোগের জবাব দিতে পারেন না। কারণ নাস্তিকরা কোর'আন হাদিস আর ইতিহাস থেকে তাদের বক্তব্যের পক্ষে এমন সব দলিল উপস্থাপন করে যেগুলোকে আলেম সাহেবরা অস্বীকারও করতে পারেন না, আবার তাদের অপব্যাখ্যার বিপরীতে সঠিক ও যৌক্তিক কোনো ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করতে পারেন না। যুক্তিশীল মানুষ যারা পারিবারিকভাবে মুসলিম তারাও একপাক্ষিক অপব্যাখ্যাকেই সঠিক মনে করে বিভ্রান্ত হন। এক্ষেত্রে আলেমদের যেটা করণীয় ছিল তা হচ্ছে:

(১) ইসলামবিদ্বেষীদের প্রতিটি প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে যুক্তি, ঐতিহাসিক তথ্য, ইসলামের দলিল তুলে ধরে তাদের বক্তব্যের অসারতা প্রতিপন্ন করা।

(২) রসুলাল্লাহর নীতি মোতাবেক, আল্লাহর হুকুম মোতাবেক ইসলাম-বিদ্বেষীদের উপেক্ষা করা।

(৩) উপেক্ষা করে নিশ্চুপ বসে না থেকে দ্রুত গোটা জাতিকে তওহীদের ভিত্তিতে ইস্পাতকঠিন ঐক্যবদ্ধ করা। মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির সামনে ইসলামবিদ্বেষীরা আর মিথ্যাচার চালাতে পারত না। যার প্রমাণ রসুলাল্লাহর জীবন। **প্রাথমিক যুগে তাঁদেরকে বহু গালিগালাজ ও অপবাদ সহ্য করে যেতে হলেও একটা সময়ে তাঁরা শক্তিশালী জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তখন সকল অপপ্রচার হাওয়ায় উবে গেছে।** এটাই হলো ইসলামের নীতি।

কিন্তু আলেম সাহেবরা যুক্তি দিয়ে সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে মুসলিমদেরকে আশ্বস্ত করতে পারছেন না, ইসলামবিদ্বেষীদের ব্যাখ্যাকেও ভ্রান্ত প্রমাণ করতে পারছেন না এবং নিজেদের কায়েম করে রাখা ফেরকা-মাজহাবের বিভক্তিকে ভুলে ঐক্যবদ্ধও হতে পারছেন না। তারা অক্ষম আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করছেন। তারা ইসলামবিদ্বেষীদের উপর গজব কামনা করছেন, তাদেরকে চাপাতি দিয়ে হত্যা করার পক্ষে ফতোয়া দিচ্ছেন। তাদের ফতোয়ার প্রভাবে ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ দাঙ্গাবাজিতে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। এমন একটি দাঙ্গাময় পরিস্থিতিই তো সাম্রাজ্যবাদীদের কাম্য। অর্থাৎ তারা আদর্শিকভাবে ইসলামবিদ্বেষীদের মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

৫. পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতাকে দাজ্জাল হিসাবে চিনতে ব্যর্থতা:

রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, আখেরি যামানায় বিরাট এক ঘোড়ায় চড়ে এক চক্ষুবিশিষ্ট দানব আবির্ভূত হবে যে সমগ্র পৃথিবীতে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করবে। তিনি একে আদম (আ.) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা, সবচেয়ে বড় বিপদ বলে উল্লেখ করেছেন। এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী হাদিস, যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করেছেন যে, ইহুদি-খ্রিষ্টান বস্তুতান্ত্রিক ধর্মহীন 'সভ্যতা'-ই হচ্ছে দাজ্জাল। এখন

আখেরি যুগ আর সেই দাজ্জাল এসে গেছে আজ প্রায় পাঁচশ’ বছর আগেই। তার পদতলে পড়ে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, মানবজাতি অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশায় দিনাতিপাত করছে। **কিন্তু মানবজাতির সবচেয়ে বড় শত্রু এই দাজ্জালকে চিনতে পারছেন না আমাদের আলেম সমাজ। তারা স্থবির হয়ে অপেক্ষা করে আছেন এমন এক দৈত্য-দানবের যার বাহনের দুই পা পৃথিবীর দুই প্রান্তে** থাকবে। শত্রুকে না চিনতে পারাই পরাজয়ের সবচেয়ে বড় কারণ হয়, কারণ তারা বোঝে না যে তারা কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি বিনা যুদ্ধেই পরাজিত হয়। দাজ্জালকে চিনতে আলেম সমাজের ব্যর্থতার দরুন মানবজাতি ও মুসলিমরাও তাদের প্রকৃত শত্রুকে চিনতে পারছে না, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে না, উল্টো দাজ্জালের পায়ে সেজদায় পড়ে আছে। বস্তুবাদী, ভোগবাদী, আল্লাহহীন এই সভ্যতা যে শয়তানী দাজ্জালীয় সভ্যতা তা না চেনার কারণে সবাই তাকে ভালোবাসে, বন্ধু, রক্ষক, অভিভাবক মনে করে তাকে অনুসরণ করছে।

মাননীয় এমামুয্‌যামান কর্তৃক লিখিত “দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিষ্টান ‘সভ্যতা’!” বইটি এবং বই অনুসারে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রটি যখন মানুষ পড়ে ও দেখে তখন স্বভাবতই তাদের প্রতিষ্ঠিত ধারণার জগতে একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অভ্যাসবশত তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দ্বারস্থ হয় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বসে থাকা আলেম-ওলামাদের কাছে। মানুষ যখনই দাজ্জাল বিষয়ে কোনো আলেমের কাছে যায়, তখনই তারা বলে দেন যে, ‘না, দাজ্জাল এখনো আসে নি।’ তাদের অনেকে এমামুয্‌যমানকে গালি দিয়ে বলেন, ‘এই লোক যা বলছে তা ঠিক নয়। দাজ্জাল আরো অনেক পরে আসবে। তার বাহনের দুই পা বিশ্বের দুই প্রান্তে থাকবে। আপনারা এ বই পড়বেন না, এ বই ধরবেন না, পড়লে ঈমান চলে যাবে, কাফের হয়ে যাবেন ইত্যাদি।’

ব্যাস! তাদের এক কথাতেই সব শেষ। দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদিসগুলো তো গত ১৪০০ বছর ধরেই মানুষ জানে। **এমামুয্‌যামান এ প্রসঙ্গে নতুন কী লিখলেন তা বোঝার জন্য মানুষকে যে চিন্তা করতে হবে, সেই চিন্তার দরজা এই কথিত আলেমরা এক কথায় বন্ধ করে দেন। ফলে মানুষ আর দাজ্জাল সম্পর্কে রসুলাল্লাহর কথাগুলোকে বর্তমানের সঙ্গে মেলানোর চিন্তাও করে না।** কিন্তু অন্ধ হলেই প্রলয় বন্ধ থাকে না। দাজ্জাল যথাসময়ে এসে ঠিকই সমগ্র মানবজাতিকে পদদলিত করে চলেছে। আমরা মানবতার এই মহাশত্রুকে চিনতে পেরে মানুষের কাছে সে সংবাদ পৌঁছে দিচ্ছি। কিন্তু আলেমরা বেহুঁশ জাতির হুশ ফিরতে দিচ্ছেন না। কারণ তাদের অহঙ্কার যে, ইসলামের কথা বলার অধিকার তো কেবল তাদেরই আছে, আর এমামুয্‌যামান তো মাদ্রাসাতেই পড়েন নি।

৬. নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হতে না পারা:

সমাজে এত অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি কিন্তু সেগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের আলেম সমাজ ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন না। তাদের সংখ্যাটি বিরাট যা নিয়ে তাদের অহংকার আর হুঙ্কারের সীমা নেই। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া এক লক্ষ আলেম সই-স্বাক্ষর করেছেন। কিন্তু হতাশাজনক বিষয় হচ্ছে দেশে যে পঁচিশ হাজার কওমী মাদ্রাসা আছে,(১) সেখানকার আলেমরা এতে স্বাক্ষর করেন নি। হেফাজতে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামের আলেমরা স্বাক্ষর করেন নি, সরকারের লেজুড়বৃত্তিকারী ইসলামিক দলগুলোও তাতে স্বাক্ষর করে নি এমন কি খোদ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক নিজেই তাতে স্বাক্ষর করেন নি। উল্টোদিকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন জঙ্গিবাদের উত্থান রোধকল্পে সরকারের নির্দেশে যখন জুমার খোতবা তৈরি করে মসজিদগুলোতে পাঠিয়েছে, সেই খোতবা প্রত্যাখ্যান করেছেন কওমী মাদ্রাসার অধিকাংশ আলেম। তারা কেবল নিজেদেরকেই হক্কানি আলেম বলে মনে করেন, অন্যদেরকে গোনেন না। সরকার সব ইসলামী দলকে আহ্বান করেছে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কিন্তু ধর্মীয় দলগুলো সাড়া দিচ্ছেন না। **সরকারও উপায়ন্তর না পেয়ে রাষ্ট্রের বিপুল অর্থ এক শ্রেণির আলেমের পেছনে খরচ করে যায় যেন তারা এই ব্যাপারে কিছু বলেন, জনসচেতনতা সৃষ্টি করেন।**

ধর্মভিত্তিক দলগুলোর অনাগ্রহের কারণ তারা অনেকেই সরকারের বিরুদ্ধে এবং সরকার বেকায়দায় পড়লে তারা একপ্রকার সুখ অনুভব করেন। এই সঙ্কট যে সরকারের একার নয়, দেশ ধ্বংস হলে তাদের ধর্মব্যবসার আস্তানাগুলোও ধ্বংস হয়ে যাবে, ইরাক সিরিয়ায় ইমাম সাহেবরা এখন উদ্বাস্তু, তাদের টাকা দেওয়ার মুসল্লি নাই এই পরিণতিগুলো তারা ভাবছেন না। মোদ্দা কথা, তারা জঙ্গিবাদের মতো এমন ভয়াবহ বিভ্রান্তির বিরুদ্ধেও ঐক্যবদ্ধ হতে পারছেন না।

সুতরাং এটা সুনিশ্চিত যে আলেমগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোনো একটি জাতীয় সঙ্কটও মোকাবেলা করতে পারবেন না, জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারা তো বহু দূরের কথা। এটা তাদের একটা বড় ব্যর্থতা। **তারা যেটা পারেন সেটা হচ্ছে, হঠাৎ করে অনর্থক অপ্রয়োজনীয় কোনো ইস্যু পেলে চিৎকার করে ফতোয়াবাজি করতে, মানুষকে উত্তেজিত করে দিতে, কারো উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করার প্ররোচনা দিতে। এটা করার জন্য তারা অনেক মিথ্যা গুজব রটনা করতে পারেন, এটা তাদের একটি বড় যোগ্যতা।** কোনো জায়গায় শান্তি স্থাপনে তারা ভূমিকা রাখতে না পারলেও অস্থিরতা সৃষ্টিতে অতিশয় দক্ষ। কিন্তু সেই উত্তেজনাও সাময়িক, দুই কি তিনদিন থাকে এই প্রভাব। এর মধ্যেই বহু নির্মম ঘটনার সাক্ষী হয় মানুষ, সমাজ আচ্ছন্ন হয় বিদ্বেষের বিষবাষ্পে। এটা করে তারা জনগণকে বুঝাতে চাচ্ছেন যে আমরা ধর্মের কর্তৃপক্ষ, আমাদের অবস্থানকে শক্ত করো, দৃঢ় করো, অর্থ দাও। জনগণও ভাবছে যে এরা না থাকলে ধর্মই থাকত না,

---

১. দৈনিক সমকাল, ১৭ এপ্রিল, ২০১৭

মসজিদে নামাজ হতো না, আজান হতো না, জানাজা হতো না। তাই ধর্মের 'রক্ষক' হিসাবে তারা দাঁড়িয়ে আছেন।

পাকিস্তান আমলে একবার আহমদিয়া জামায়াতকে অনেক আলেম কাফের ফতোয়া দিয়ে দাঙ্গা সৃষ্টি করেছিল। বিষয়টি আদালতে গড়ালে বিচারপতি মুনির ও কায়ানীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ইসলাম, মুসলিম ও কাফেরের সংজ্ঞা বের করার জন্য। এই বিখ্যাত মুনির কমিশন পাকিস্তানের হাজার হাজার আলেমের কাছ থেকে ইসলাম, মুসলিম ও কাফেরের সংজ্ঞা জানতে চান এবং তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন। তাদের বক্তব্য শোনার পরে মুনির কমিশনের সদস্যদ্বয় দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'এসব বিবরণের পর এ কথা বলা বাহুল্য যে কোনও দু'জন আলেমও এই মৌলিক বিষয়ে একমত নন। তবে তারা একটি বিষয়ে সম্ভবত একমত যে ইসলামের কোনো বিষয়েই তারা একমত হবেন না। আমরা যদি নিজেরা ইসলাম ও মুসলমানের সংজ্ঞা নির্ধারণ করি তাহলে এদের সবার মতে আমরা ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত হয়ে পড়ব। আর এদের একজনের সংজ্ঞা যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে সেই একজন আলেমের দৃষ্টিতে আমরা মুসলমান থাকব ঠিকই অন্য সকলের দৃষ্টিতে আমরা কাফের হয়ে যাব।(১)

ইসলামিক বিশেষজ্ঞদের একটি সফলতার কথাও এক্ষেত্রে বলতে হয়। তাদের মধ্যে কিছু আছেন যারা ভিন্ন ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে আরবি ফার্সি উর্দূ ভাষায় লেখা ইসলামের বিভিন্ন কেতাবের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইসলামের প্রকৃত আকিদা না থাকায় সেই বইগুলো থেকে জাতি উপকৃত হতে পারছে না। তাদের সেই কেতাবগুলো মূলত দীনের বিভিন্ন মাজহাবের মতাদর্শের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও ব্যক্তিগত জীবনের নানারূপ মাসলা মাসায়েলে পরিপূর্ণ। পাশাপাশি যে দীনের অর্থাৎ ইসলামের দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি দুনিয়ার কোথাও প্রতিষ্ঠিতই নেই সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় ভরপুর। যে লেখা পড়ে মানুষ আল্লাহর রাস্তায় মানবতার কল্যাণে জীবন-সম্পদ উৎসর্গকারী মো'মেন হয় না, মানুষ জীবনের সঠিক লক্ষ্য খুঁজে পায় না, জাতি ঐক্যবদ্ধ হয় না সেই সব লেখা তো উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন অসার সময়ক্ষেপণমাত্র।

ধরুন একটি জাতির সমস্ত লোক শত শত পণ্ডিতের লেখা ইসলামি সাহিত্য পড়ল, কোর'আন সম্পূর্ণ মুখস্থ করল, প্রতিটি লাইনের তাফসির জানলো, বাজারে থাকা সকল আরবি রের বই আয়ত্ত করল, প্রতিটি সহিহ হাদিস মুখস্থ করল, নিখুঁত আরবীয় লেবাস ধারণ করল, বহু রকমের ফরদ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব আমল করে যেতে লাগল কিন্তু তারা আল্লাহর হুকুমের পরিবর্তে ব্রিটিশ খ্রিষ্টানদের তৈরি হুকুম-বিধান মেনে চলল, ফলে তারা সর্বপ্রকার অশান্তিতে নিমজ্জিত হলো। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো না অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে ইসলামের আগমন, নবীর আগমন, কেতাব নাজেল হওয়া, উম্মার গঠন সেই উদ্দেশ্যই যখন তাদেরকে দিয়ে অর্জিত হলো না তখন এমন একটি জাতি কি আল্লাহর

---

১. মুনির কমিশন রিপোর্ট পৃ: ২১৫

দৃষ্টিতে মো’মেন, মুসলিম থাকে? নবী কি তাদেরকে উম্মত বলে স্বীকার করবেন? তাদের এত জ্ঞান, এত আমলের দুই পয়সাও মূল্য থাকল কী? আলেমদের কষ্ট করে আরবি-উর্দু-ফারসি থেকে বঙ্গানুবাদ করে কেতাবের পাহাড় তৈরি করার কোনো অর্থ আছে কি? চিন্তাশীলদের প্রতি এ প্রশ্নটি রেখে চলমান প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

৭. বাস্তব সমস্যার বাস্তব সমাধান দিতে ব্যর্থ হওয়া

যে ইসলাম আজ নানা প্রকার রূপ নিয়ে আমাদের ১৬০ কোটি মুসলমানের দ্বারা চর্চিত হচ্ছে তা কোনোভাবেই বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা চেতনার যুগের উপযোগী নয়। ফলে ইসলাম এ যুগের চাহিদা ও যাবতীয় সমস্যার সমাধানরূপে মানবজাতির দ্বারা বিবেচিত হতে পারছে না। ইসলামের যারা ধারক বাহক আলেমসমাজ তারাও যুক্তির যুগে অন্ধবিশ্বাসকেই ধর্মের ভিত্তি বানিয়ে রেখেছেন।

মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানুষ, উত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল (সা.) অক্লান্ত পরিশ্রম, কঠোর অধ্যবসায়, ত্যাগ, কোরবানি, তুলনাহীন প্রেরণা দিয়ে এই উম্মতে মোহাম্মদী জাতিটিকে কেন গঠন করেছিলেন তা এখন এ জাতির অজানা। তাদের স্মৃতি ও অবদান ম্লান হতে হতে জাতির চোখের সামনে থেকে অদৃশ্যই হয়ে গেছে। প্রখর রৌদ্রে জ্বলে পুড়ে টকটকে লাল পোশাক যেমন ফিকে হয়ে যায় তেমনিভাবে ইসলামের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে গেছে, তার গৌরবগাঁথার ইতিহাস সকলেই বিস্মৃত হয়ে গেছে। শত শত বছর থেকে জাতি মার খেতে খেতে হীনম্মন্যতায় আপ্লুত, তাদের দৃষ্টি ও শির অবনত।

আমরা কোর’আনের একটি আয়াত উল্লেখ করে জাতি সৃষ্টির কারণটি তুলে ধরছি। আল্লাহ বলছেন, “তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে এ জন্য যে তোমরা মানুষকে ন্যায়ের আদেশ করবে এবং অন্যায় থেকে ফেরাবে।”(১) সুতরাং যতদিন পৃথিবীতে অন্যায় অবিচার থাকবে ততদিন মুসলিম জাতির দায়িত্ব থাকবে সেই অন্যায়কে নিবারণ করা এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা। অতীতে যত নবী রসুল অবতার এসেছেন তাদের সবারই জাতি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল এটিই, দুষ্টের দমন-শিষ্টের লালন (আমরু বিল মা’রুফ ওয়া নেহি আনিল মুনকার)। **বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলো কোনো কাল্পনিক বিষয় দিয়ে সমাধান করা যায় না। এজন্য বাস্তব সমাধান প্রয়োজন পড়ে। ইসলাম ছিল সেই জায়গায়।**

আল্লাহর রসুলের তিরোধানের ৬০/৭০ বছর পর মুসলিম জাতি উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়ার দরুন তাদের সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম রূপ নেয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে। মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর জিম্মাদার খলিফা হয়ে যান ভোগবিলাসে, সুরা, নারীতে মত্ত সম্রাট, সুলতান, কেসরা, কায়সার।

---

(১) সুরা ইমরানের ১১০ নম্বর আয়াতে

আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ দীনকে প্রতিষ্ঠা করো, মতভেদ করো না।(১) ফকীহ, মোফাসসির, মোহাদ্দিসগণ আল্লাহর এই সরাসরি হুকুমকে পাশ কাটিয়ে কোর'আন সুন্নাহর উপর ইজতেহাদ করে, ইজমা, কিয়াস করে হাজার হাজার মাসলা মাসায়েল উদ্ভাবন করতে লাগলেন। এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের তারতম্যের দরুন উম্মাহ বিভিন্ন ফকীহ, ইমামদের মতাদর্শকে অনুসরণ করে হানাফি, হাম্বলি, মালেকী, শাফেয়ী, শিয়া, সুন্নী, দেওবন্দী, সালাফি ইত্যাদি শত শত ফেরকা মাজহাবে মতভেদ করে ভাগ হয়ে গেল।

অন্যদিকে পারস্য থেকে প্রবেশ করা ও পূর্বতন ধর্মের বিকৃত সুফিবাদের প্রভাবে মানবজাতির জীবন থেকে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মানসিকতা সম্পূর্ণ ত্যাগ করে সংগ্রামবিমুখ, অন্তর্মুখী, ঘরমুখী পরহেজগার, সুফি-সাধক, দরবেশ ও বুজুর্গে পরিণত হলো। তাদের উদ্ভাবিত মারেফতি তরিকার অনুসরণ করতে গিয়ে জাতি কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া এমন শত শত তরিকায় বিভক্ত হয়ে গেল। ফলে একদেহ একপ্রাণ হয়ে, এক নেতার নেতৃত্বে এই জাতি পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে গিয়ে সেখানকার অসহায় মানুষকে রক্ষা করার প্রেরণা, লক্ষ্য (আকিদা), সাহস ও সামর্থ্য সবই হারিয়ে ফেলল।

যে কোনো জাতির অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। সেই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে পশ্চাৎপদ বানিয়ে রাখলে একটি জাতি কোনোদিন সম্মুখে অগ্রণী হতে পারে না। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যে সমাজে নারীদের কোনো মর্যাদাই ছিল না, কন্যাশিশুদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো, যাদেরকে ভোগ্যপণ্যের মতো ব্যবহার করা হতো সেই নারীদেকে আল্লাহর রসুল মানুষের মর্যাদা দিলেন, তাদেরকে প্রতিটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এমন কি নেতৃত্বের অধিকার দিলেন, তাদেরকে দুর্ধর্ষ যোদ্ধায় পরিণত করলেন। **সেই অসমসাহসী নারীদেরকে আলেম ও সুফিবাদীরা আবার বিকৃত ও ভুয়া মাসলা-মাসায়েলের বেড়াজালে আবদ্ধ করে অন্তপুরবাসিনী করে জনবিচ্ছিন্ন, গৃহবন্দী, বুদ্ধিহীন, শিক্ষাহীন, পশ্চাৎপদ করে দিল। এভাবে 'পরহেজগার' পুরুষ ও রমণী বানাতে গিয়ে দীনের অতিবিশ্লেষণকারী পণ্ডিতরা ও ভারসাম্যহীন সুফিবাদীরা উভয়কেই অন্তর্মুখী, অন্যায়ের সামনে নতশির, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ক্লিব বানিয়ে ফেলল।** যার নিশ্চিত পরিণামরূপে জাতি শত্রুর আক্রমণের সামনে অক্ষম ও স্থবির হয়ে পরাজিত গোলামে পরিণত হলো।

মধ্যযুগের বর্বর ইউরোপে মানুষ যখন যাজকতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের যাঁতাকলে পড়ে মুক্তির জন্য ত্রাহিসুরে চিৎকার করেছে, তখন সময়ের দাবি পূরণ করতে জন্ম নিয়েছে ইউরোপীয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (প্রকৃতপক্ষে ধর্মহীনতাবাদ) যা বিবর্তনের মাধ্যমে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল মানুষের তৈরি করে নেওয়া পুঁজিবাদী গণতন্ত্র মানুষকে শান্তি দিতে পারছে না। কয়েকশ' বছর যেতেই আবারো মানুষ পাগল হয়ে উঠল উপনিবেশবাদ ও পুঁজিবাদের শোষণ বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য।

---

১. আল কোর'আন, সুরা শুরা ১৩

সময়ের দাবিতে জন্ম নিল সাম্যবাদ। লক্ষ কোটি মানুষ পাগলপারা হয়ে, হাজার হাজার মানুষ জীবন দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু তারাও মুক্তি পায় নি। সমাজতন্ত্র এক শতাব্দীও টিকল না, চরম ফ্যাসিস্ট রূপ নিয়ে আবারও মানুষকে অশান্তির দাবানলে নিক্ষেপ করল। মানুষ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল এবং আবার পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের দিকেই ফিরে গেল। এখন তো চলছে ফ্যাসিবাদী গণতন্ত্র বা স্বৈরতান্ত্রিক গণতন্ত্র। যেসব দেশে এখনও নামেমাত্র সমাজতন্ত্র আছে তারা বাস্তবে ঘোর পুঁজিবাদী।

ইসলামেরই অঙ্গীকার ছিল তা মানবজাতির জীবন থেকে সকল অন্যায় অশান্তি দূর করবে। তখন যদি মুসলিমরা আল্লাহর রসুলের (সা.) রেখে যাওয়া সেই সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে যেখানে মানবতা ভূলুণ্ঠিত সেখানে যেত তবে ঐ নিপীড়িত মানুষগুলো হয়তো আর মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি গ্রহণ করে অশান্তির আগুনে জ্বলত না, তারা প্রকৃতই মুক্তির পথটি পেয়ে যেত। সেই ইসলাম এখন কেবলই আখেরাতে জাহান্নামের মুক্তির পথ দেখাতে উদগ্রীব। কোন আমলে কত সওয়াব এর গবেষণাতেই ধার্মিকেরা ব্যস্ত। বাজার ভর্তি সওয়াবের বই দিয়ে। **যে ইসলাম খোদ মুসলমানকেই দুনিয়াতে শান্তি দিতে পারল না, সেটা আখেরাতে কী করে জান্নাত দেবে - এ প্রশ্ন করা হলে প্রশ্নকারীর কপালে জুটবে কাফের, মুরতাদ, খ্রিষ্টান ফতোয়া।** আদর্শিক সংকটের সময়গুলোতে ইসলামকে মানবজাতির মুক্তির জন্য উপযোগী আদর্শ হিসাবে প্রাণময়, গ্রহণযোগ্য ও আধুনিক রূপে উপস্থাপন করার দায়িত্ব ছিল উম্মাহর আলেম সমাজের। কারণ তারা নিজেদেরকে ধর্মের কর্তৃপক্ষ বলে মনে করেন এবং প্রচার করেন কিন্তু সেটা করতে তারা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিলেন বলেই মানুষকে নতুন নতুন জীবনব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হয়েছে। তারা ইসলামটাকে শুধু ব্যক্তিগত সওয়াবের ধর্মে পরিণত করে গিয়ে মসজিদে খানকায় ঢুকেছেন এবং সেখানে বসে ধর্ম বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করছেন, মানুষকেও মসজিদ-মাদ্রাসাকেন্দ্রিক বানিয়ে রেখেছেন।

দিন পাল্টাচ্ছে। চিন্তা চেতনার অগ্রগতি ও প্রগতির যুগে মানুষ আর সওয়াবের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে না। কারণ সওয়াব তাদেরকে বাস্তব সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারছে না। আমরা ইতিহাসে দেখি ১৪০০ বছর আগে আল্লাহ রসুল যে দীন নিয়ে আসেন তখন কিন্তু মক্কার অর্থাৎ আরবেরা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, পশ্চাৎপদ, দরিদ্র জাতি ছিল। আল্লাহর রসুল তাদের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করেছিলেন। তাদের ঘরে খাবার ছিল না। তিনি তাদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত করলেন। তাদের সমাজে নিরাপত্তা ছিল না, তিনি অকল্পনীয় নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিশ্বের দরবারে তাদের কোনও সম্মান ছিল না, তাদেরকে সম্মানিত জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না, তিনি তাদেরকে ভাই বানিয়ে দিয়েছেন। দাসব্যবসার যুগে তিনি বেলালকে (রা.) ক্বাবার উর্ধ্বে উঠিয়েছিলেন, মুক্তদাস যায়েদকে (রা.) পুত্র বানিয়েছিলেন এবং বহু সামরিক অভিযানের সেনাপতি করেছিলেন।(১)

---

১. সিরাতে ইবনে ইসহাক

ইসলামপূর্ব যুগে নারীদের কোনো মর্যাদা ছিল না, মেয়ে সন্তানকে জীবিত কবর দিত অনেকেই, সেই নারীদেরকে ইসলাম সামষ্টিক জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে সম্মানজনক অবস্থান ও ন্যায়সঙ্গত মর্যাদার আসন দান করেছে।

অর্থাৎ ইসলাম ঐ সমাজের বাস্তব সমস্যার বাস্তব সমাধান দিয়েছিল বলেই তা ঐ সময়ের মানুষের জীবনে ও মননে গৃহীত হয়েছিল। যেখানেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানেই মানুষ শান্তি, নিরাপত্তা, স্বচ্ছলতা, প্রগতি ও ন্যায়বিচার লাভ করেছিল। জাতি যেন আধ্যাত্মিক দিক থেকেও বলিষ্ঠ থাকে সেজন্য প্রতিটি ব্যক্তিগত কল্যাণময় কাজের বিপরীতে সওয়াবের ধারণাও প্রত্যেকের মনে বিরাজ করত। **পেটে যখন খাবার থাকে না তখন পূর্ণিমার চাঁদকেও রুটি বলে ভ্রম হয়। সমাজে যখন নিরাপত্তা থাকে না তখন ধর্মকে মানুষের কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়।** তখন নিজেকে রক্ষা, নিজের সম্পদ রক্ষা, দেশ রক্ষাই প্রধান ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। দুঃখ, দুর্দশায় হতাশাগ্রস্ত মানুষকে সওয়াবের ওয়াজ আকৃষ্ট করে না। দোয়া-দরুদ, যিকির-আসকারের ওয়াজ তাদের হৃদয়ে কোনো আবেদন সৃষ্টি করে না। তথাপি সমাজের মধ্যে বিরাজকারী বিরাট একটি শ্রেণি যারা ধর্মকে জীবিকার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করছেন তারা ধর্মকে ব্যক্তিগত উপাসনার ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে জিইয়ে রাখতে মরিয়া। এটা করার জন্য তারা সওয়াব ছাড়া অন্য কিছুর ভরসা, বিশেষ করে পার্থিব শান্তির ভরসা তারা মানুষকে দিতে পারছেন না। এটাই হলো আলেমদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

মহাসত্য হচ্ছে, শেষ দীন ইসলাম, যা বিশ্বের সমস্ত মানবজাতির মধ্যে একটা বিপ্লব সৃষ্টি করে দেয়ার মতো আদর্শ, মানুষকে মুক্তি দেওয়ার মতো একমাত্র দর্শন তা কস্মিনকালেও বসে বসে সওয়াব কামাইয়ের জন্য আসে নি। আলেমদের ব্যর্থতার দরুন পকেটে হীরার খণ্ড থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরতে বাধ্য হচ্ছে মুসলিমরা।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যে কোনো চেতনার সঙ্গেই মানুষের হৃদয়ের যোগ থাকে। আর হৃদয় নিয়ে ব্যবসা করা হলে চেতনার বিলোপ ঘটে, মানবসমাজে আদর্শিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। ধর্মব্যবসা এজন্য সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে, ধর্মবিশ্বাসী মানুষ ধর্মবিশ্বাস দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা যা কিছু করে তার সঙ্গে তার ইহকাল ও পরকাল দুটোই জড়িত থাকে। কেউ যদি তাদের ধর্মবিশ্বাসকে বিপথে চালিত করে তাহলে সে কেবল দুনিয়াই হারাবে না, আখেরাতেও জাহান্নামে যাবে। আর ধর্মবিশ্বাসকে ব্যবহার করে বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী ও জঙ্গিবাদীরা দুনিয়ায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি তৈরি করে ফেলেছে। এ অবস্থায় দেশ ও ধর্ম উভয়কেই রক্ষা করতে হলে সবার আগে প্রয়োজন আমাদের এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষগুলোকে সচেতন করা যেন তারা কারো প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে এ দেশটির উপরে যেন জঙ্গিবাদী, ধর্মান্ধ ইমেজ বসাতে না দেয়।

যেভাবে চাপাতি ব্যবহার হচ্ছে, বিদেশি হত্যা চলছে তাতে বিশ্বের বুকে আমরা তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে উগ্রবাদী বলে চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছি। ইসলামকে আরো

বেশি টার্গেট করা হচ্ছে। **আমাদের জনগণের নিস্পৃহতা আর স্বার্থকেন্দ্রিকতার সুযোগ নিয়ে ইসলামের নামে গঠিত বিপথগামী বিভিন্ন দল এদেশের বুকে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে এবং এদেশটিকে ধর্মান্ধ রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বের বুকে পরিচিত করে তোলার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে মরিয়া।** যদিও তারা দাবি করছে তারা ইসলামের জন্য করছে, ইসলামসম্মত পদ্ধতিতেই করছে কিন্তু আমরা শতবার প্রমাণ করে দিয়েছি যে সেটা ইসলাম নয়। তাদের তরিকাও ইসলামসম্মত নয়, রসুলাল্লাহর দেখানো পথে নয়। ওপথে তারা নিজেরা জীবন দিয়েও আল্লাহকে পাবে না, সমস্ত মানবজাতিকে হত্যা করেও দীন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। কারণ তারা আল্লাহর সাহায্য পাবে না আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সত্যদীন প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব নয়। যেটা আল্লাহর দীন নয় সেটা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ সাহায্য করেন না। গত কয়েক শতাব্দীতে বহু ইসলামি সংগঠনের হাজার হাজার কর্মী জীবন দিয়েছেন, অকল্পনীয় ত্যাগস্বীকার করেছেন কিন্তু ফলাফল সবারই জানা, কোথাও তারা শান্তি আনতে পারেন নি। তাদের প্রচেষ্টার কমতি ছিল না, কিন্তু তারা যেটা নিয়ে দাঁড়িয়েছেন সেটা আল্লাহর ইসলামই নয়, তাই আল্লাহর সাহায্য আসে নি। আর তাদের তরিকাও ভুল। এ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু হ্যাঁ, এমন কোনো পরিস্থিতি (Circumstance) যদি কোনো ভূখণ্ডে সৃষ্টি হয় যে তারা জোর করে হোক বা যেভাবেই হোক শাসনক্ষমতায় গেল (যেমন আফগানিস্তানে তালেবান, সিরিয়া-ইরাকের কিছু অংশে আইএস গিয়েছে) তবু সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে না, সেটা হবে অন্য কিছু। সেটা দেখে মানুষ আরো ইসলামবিমুখ হবে, বীতশ্রদ্ধ হবে। অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত শান্তি আসবে না।

এ তো গেল ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী কিন্তু বিপথগামী অতি ক্ষুদ্র একটি অংশের কথা, কিন্তু বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের বড় ব্যর্থতা হলো আমরা সমাজের যাবতীয় অন্যায়কে পাশ কাটিয়ে, মুখ বুজে সহ্য করে কোনোমতে নিজে খেয়ে পরে বেঁচে থাকাকেই যথেষ্ট মনে করছি। এদিকে আমাদের দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে যাক ওটা রক্ষা করবে সরকার, আমাদের ধর্ম ধ্বংস হয়ে যাবে যাক - ওটা রক্ষা করবে আলেমরা, এমন বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে বসে আছি। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা ধর্ম সম্পর্কে জানব না, জান্নাতে যাওয়ার পথ আমাদেরকে আলেমরাই দেখাবেন। আমাদের এই স্থবিরতা, চিন্তার জড়ত্ব, আত্মকেন্দ্রিকতাই আমাদের সব সর্বনাশের কারণ। এখন অন্যের সমালোচনা বাদ দিয়ে আত্মসমালোচনা করতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে কোথায় আমরা পথ হারিয়েছি। তা না হলে সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র, ধর্মব্যবসায়ী ও জঙ্গিবাদীদের সম্মিলিত কাজের ফলে যে ভয়াবহ তাণ্ডব ধেয়ে আসছে তাতে করে আমাদের ধর্মও ধ্বংস হবে, দেশও ধ্বংস হবে।

ধর্মব্যবসার পুরোহিত ভোগবাদী আরব রাজতন্ত্র

দেহ-আত্মার সমন্বয়ে যেমন মানুষ, তেমনি দুনিয়া ও পরকালের ভারসাম্যপূর্ণ দীন হচ্ছে ইসলাম। এই ভারসাম্য যতদিন অটুট ছিল ততদিন মুসলিমরা না ছিল ভোগবাদী, আর না বৈরাগ্যবাদী। তাদের জীবন ছিল ভারসাম্যপূর্ণ। এরপর দীনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে জাতির মধ্যে দুইটি শ্রেণির জন্ম হয়, যার একটি ভাগ সম্পূর্ণভাবে বিকৃত সুফিবাদের অনুসরণ করে দুনিয়া ছেড়ে দিয়ে শুধু আত্মা নিয়ে ঘষামাজা করতে লাগল, অপরটি জীবন থেকে তাসাউফের লেশমাত্রও ছুঁড়ে ফেলে ভোগ-বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিল। মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলো ঐ ভোগবাদী ভাগটির উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

আল্লাহর রসুল আরবদেশে জন্ম নিয়েছিলেন কিন্তু তিনি আরব-অনারব সকলের নবী ছিলেন, বিশ্বের সকল মানুষের নবী তিনি।(১) তিনি আরবকেন্দ্রিক ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে যান নি। তিনি বিদায় হজ্বের ভাষণে এই দীনের নীতিগুলো সুস্পষ্টভাবে বলে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে তিনি এও বলেছিলেন যে, আরবদের উপর অনারবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, অনারবদের উপর আরবদেরও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কিন্তু আল্লাহর রসুল বিদায় নেওয়ার কিছুদিন না যেতেই আরবরা এই কথাটি ভুলে গেল। **তারা আবারো পূর্বের সেই জাহেলিয়াতের মূল্যবোধ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ফিরিয়ে নিয়ে এল। তারা আবার দাসত্বপ্রথা চালু করল, যে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আল্লাহর রসুল আমৃত্যু লড়াই করে গেছেন। তাদের এই কাজের পরিণামে মুসলিম বংশজাত, মুসলিম নামধারী রাজা-বাদশাহ, আমীর-ওমরাহগণ আবারও পুরোদমে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলন করেছিল যার কলঙ্ক স্বভাবতই ইসলামের উপর বর্তেছে।** এভাবে আরবরা বহুভাবে ইসলামকে কলঙ্কিত করেছে। তবুও যেহেতু তারা ছিল শাসকের আসনে, মানুষ তাদেরকে অনুসরণ করেছে। শাসকের ভাষাকে বরণ করেছে, শাসকের পোশাক-আশাক, খাওয়া-দাওয়া, রুচি-অভিরুচি সবই মানুষ অনুকরণ করেছে। যেগুলো ভালো সেগুলোও যেমন নিয়েছে, যেগুলো খারাপ সেগুলোও বাদ দেয় নি। সমস্যা হয়েছে যেটা, পরবর্তী সময়ে আরবরাই ইসলামের প্রতিভূ হিসাবে দাঁড়িয়ে

---

১. আল কোর'আন, সুরা আরাফ ১৫৮

গেছে। আরবের ভাষা হয়ে গেছে ইসলামের ভাষা, আরবের খাদ্য খেজুর হয়ে গেছে ‘সুন্নতি খাবার’, আরবীয় জোব্বা হয়ে গেছে ইসলামের ‘লেবাস’, আরব্য মুসলিম শাসকদের দাড়ি হয়ে গেছে ইসলামের ‘অপরিহার্য’ বিষয়। আল্লাহর রসুল আরব-অনারবের ঊর্ধ্বে ছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে মুফতি মুফাসসিরগণ মাসলা-মাসায়েল আবিষ্কার করে ইসলামের সার্বজনীন চরিত্র পাল্টে দিয়ে তাতে আরবের গন্ধ লাগিয়ে দেন।

আর আরবের লোকেরা এটাকে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের সূচক হিসাবে দাঁড় করিয়ে ফেলল। **আজও বাকি পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান মনে করেন, আরবে যেটা চলে সেটাই ইসলামের নমুনা** (Model)। **মক্কা-মদীনার ইমাম সাহেব, মুফতি সাহেব যেটা বলেছেন সেটা কোনোভাবেই ভ্রান্ত হতে পারে না।** আরবদের অনুকরণে আমাদের দেশের আলেম সাহেবরা ওয়াজ মাহফিলে, বড় বড় অনুষ্ঠানে আরবীয় অভিজাত শ্রেণির ব্যবহৃত ‘আবায়া’ পরে বসে থাকেন, মাথায় বাঁধেন পাগড়ি, ঘাড়ে চেক রুমাল। মানুষ মনে করে তারাই মূর্তিমান ইসলাম (Idol) বা ইসলামের প্রতীক (Icon)।

মুসলমানেরা আরবদেশকে নবীজীর জন্মস্থান হিসাবে অপরিসীম শ্রদ্ধা করে এবং করবে এটাই স্বাভাবিক, এটা যৌক্তিক। কিন্তু আরবদেরকে ইসলামের মানদণ্ড ‘Head of religion’ মনে করা একটি বিরাট পথভ্রষ্টতা। ইসলামের মানদণ্ড হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসুল। এই মানদণ্ডে আরব অনারব সবাইকে উত্তীর্ণ হয়েই মুসলিম হতে হবে। বর্তমানে আরবে রাজতন্ত্র চলছে অথচ আল্লাহর রসুল তো রাজতন্ত্র নিষিদ্ধ করে গেছেন। রসুলাল্লাহ (সা.) নিজেও মালিক (রাজা) বা সুলতান উপাধি ধারণ করেন নি, তাঁর পরবর্তী খলিফারাও তা করেন নি। খলিফাদেরকে ‘আমীরুল মো’মেনীন’ বা মো’মেনদের নেতা বলা হতো। **তারা রাজা-বাদশাহ ছিলেন না, অন্যান্য মো’মেনগণ যে জীবনযাপন করতেন, আমীরুল মো’মেনীনগণও সেই একই মানের জীবনযাপন করতেন। তাদের কোনো দেহরক্ষীও ছিল না। কিন্তু আজ আরব রাজপুত্রদের দেহরক্ষীদের দাবড়ানিতে হজ্ব করতে আসা অর্ধ লক্ষ হাজী পদদলিত হয়ে মারা যায়।** মুসলিমদের মধ্যে যে দুঃখজনক বিভক্তি বিরাজ করছে তার মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আরবদের মিথ্যা ধার্মিকতার মোড়ক (False theological cover)। মুসলিমদের গোটা ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেয়।

মুসলিমদের দুটো পবিত্র স্থান মক্কা ও মদীনা আরবদেশে অবস্থিত, তার মানে এই নয় যে ওদুটো আরবের সম্পত্তি। আল্লাহর রসুল আরব বলে আলাদা দেশ রেখে যান নি, তাঁর মিশন ছিল সমগ্র পৃথিবীকে এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ছায়াতলে নিয়ে আসা। ভৌগোলিক বিভক্তি, জাতিগত বিভক্তি, ধর্মীয় বিভক্তি এক কথায় মানুষে মানুষে যে কোনো প্রকার বিভক্তি ইসলামে কেবল নিষিদ্ধই

নয়, একেবারে কুফর। আরবের মুসলমানেরা গরিব দেশের মুসলমানদের সাথে ক্রীতদাসের মতো আচরণ করে, মহিলা গৃহকর্মীদের সর্বপ্রকার নির্যাতন করে। অথচ আল্লাহ বলেছেন, মো'মেনরা ভাই ভাই। ইসলাম আসার আগে আরবদের মূল বাণিজ্যই ছিল হজ্ব। আর বর্তমানে তারা একে একেবারে পর্যটন শিল্পে রূপ দিয়েছে। মক্কা-মদীনা এখন ফাইভ স্টার, সেভেন স্টার হোটেল দিয়ে পূর্ণ। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা এজেন্টদের মাধ্যমে, বিভিন্ন দলের মাধ্যমে হাজি সংগ্রহ করা হয়।

বাকি মুসলিম দুনিয়ার রাজনৈতিক নেতারাও নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য ঘন ঘন হজ্ব-ওমরা পালন করেন আর দেশ চালান ব্রিটিশদের তৈরি আইন-কানুন আর জীবনবিধান দিয়ে। মাঝে মধ্যে তারা আরব থেকে দু একজন 'শায়েখ' ভাড়া এনে নিজেদের মুসলমানিত্বকে সত্যায়ন করিয়ে নেন। আরব বাদশাহরাও কাবার পুরোনো গেলাফ উপহার দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের ধন্য করে দেন। কেউ এ প্রশ্ন তোলেন না যে, যখন মুসলিম বিশ্বের বহু দেশ, সোমালিয়া, ইয়েমেন দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত, সাড়ে ছয় কোটি মুসলমান উদ্বাস্তু শিবিরে অনাহারে দিন যাপন করছে, তখন নিজেরা বহুমূল্য লেবাস ধারণ করে নিজেদেরকে ইসলামের ধারক-বাহক প্রমাণ করা ইবাদত, নাকি নিরন্ন, বস্ত্রহীন মানুষকে অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয় দেওয়া ইবাদত?

আরব রাজতন্ত্র বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ইসলামের নামে, বিভিন্ন জঙ্গিবাদী দল, আমলের দাওয়াত প্রদানকারী দলের নামে বিকৃত ওয়াহাবী/সালাফি মতবাদের প্রসার ঘটিয়েছে সে সম্পর্কে সচেতন মানুষমাত্রই অবগত আছেন। তারাই আফগান-রাশিয়া যুদ্ধের সময় সারা পৃথিবী থেকে মুসলিমদের আফগানের মাটিতে সমবেত করেছিল এবং আরব ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠীর দ্বারা জঙ্গিবাদের দীক্ষায় দীক্ষিত করে তুলেছিল। **মুসলিম তরুণ-যুবকরা জেহাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সেখানে ছুটে গিয়েছিল কিন্তু সেখানে তারা জীবন দিয়ে আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করেছে। ইসলামের চার আনাও উপকার হয় নি। উল্টো জঙ্গিবাদের মতো এক জঘন্য মিথ্যা মতবাদের ভুত মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাঁধে চেপে বসেছে।** এখন সেই ভুত তাড়ানোর নামে 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' করে মুসলমান জনগোষ্ঠীকেই নির্মূল করে দেওয়ার পাঁয়তারা করছে পশ্চিমা পরাশক্তিধর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো। শিয়া-সুন্নী বিরোধকে কেন্দ্র করে এখন দুনিয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে। ইরাক, ইরান, সিরিয়া, আফগানিস্তান, লেবানন, লিবিয়া, ফিলিস্তিন, কুয়েত প্রতিটি দেশে গত দশকগুলোতে যে যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের প্রাণ গেছে, সেই রক্তের দাগ যেমন পাশ্চাত্যের পরাশক্তিগুলোর হাতে লেগে আছে, তেমনি লেগে আছে আরবের সেই ইসলামের ধ্বজাধারীদের হাতেও। তারা আজ পর্যন্ত একজন

মুসলিম উদ্বাস্তুকেও তাদের দেশে আশ্রয় দেয় নি। উল্টো এসব যুদ্ধে তারা মার্কিনদের থেকে হাজার হাজার বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র কিনে সেগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করেছে। এসবই তারা করছে কেবল নিজেদের পার্থিব ভোগবিলাস আর সিংহাসন টিকিয়ে রাখার লোভে।

এই সেদিনও মুসলিম জনগোষ্ঠীর এই অংশটি অত্যন্ত ভুখা-নাঙ্গা জীবনযাপন করত। শুকনো মরুভূমিতে উপার্জনের বড় একটা ক্ষেত্র ছিল না তাদের। অনেকেই কেবল দূর-দূরান্ত থেকে আগত হাজীদের পানি পান করিয়ে সংসার চালাত। ভারতবর্ষের বহু অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তি আরবে গিয়ে কূপ খনন, সরাইখানা নির্মাণ ইত্যাদি করে দিতেন। **সেই আরবে গত শতাব্দীতে হঠাৎ ভূগর্ভস্থ তেলসম্পদের সন্ধান মেলার পর রাতারাতি জীবনমানে পরিবর্তন আসে। তারা এখন সম্পদ খরচ করার জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না।** অঢেল সম্পদের একটা অংশ ব্যয় করছে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে দেশের রাস্তাঘাট, পুল, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, বিরাট বিরাট প্রাসাদ, হোটেল, ফ্লাইওয়ে ইত্যাদি তৈরি করে। অঢেল টাকা ব্যয় করে এগুলো এমনভাবে তৈরি করছে যে, ইউরোপের, আমেরিকার মানুষরাও দেখে আশ্চর্য হচ্ছে, হিংসা করছে। অগণিত রাজকীয় প্রাসাদ, হোটেল, সমস্ত ইমারত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (Air Conditioned)। শাদ্দাদ আল্লাহর সঙ্গে নাকি পাল্লা দিয়ে জান্নাত বানিয়েছিল। সে আজ কবর থেকে উঠে এসে এদের শহর, নগর, পথঘাট, হোটেল আর প্রাসাদগুলো দেখলে বলবে- আমি আর কি বানিয়েছিলাম! সম্পদের অন্যভাগ তারা ব্যয় করছে অবিশ্বাস্য বিলাসিতায়, স্থূল জীবন উপভোগে, ইউরোপে, আমেরিকায়, জাপানে। দৈহিক ভোগে এরা কি পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করে তা আমাদের মতো গরীব দেশগুলোর মুসলিমরা ধারণাও করতে পারবে না, লক্ষ লক্ষ ডলার তাদের কাছে কিছু নয়। তাদের ঐ অঢেল সম্পদের একটা মোটা ভাগ চলে যায় ঐ ইউরোপ, আমেরিকায়, জাপান ইত্যাদি দেশের কাছে, বিলাসিতার সামগ্রীর দাম হিসাবে। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি গাড়িগুলো কেনে এরাই। **শুধু তাই নয়, রোলস, মার্সিডিস, আলফা-রোমিও, সিট্রন, ক্যাডিলাক ইত্যাদি গাড়ি শুধু কিনেই তারা খুশি নয়, এই গাড়িগুলোর বাম্পার লাইনিং ইত্যাদি তারা খাঁটি সোনা দিয়ে মুড়ে দেয়। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে ইউরোপের দেশে দেশে তাদের বিলাসবহুল প্রাসাদ তৈরি করে রাখা আছে অবকাশ যাপনের জন্য যে প্রাসাদগুলোতে কম করে হলেও শতাধিক কামরাই থাকে এবং কামরাগুলো ইউরোপের দামি দামি আসবাবপত্র দিয়ে সজ্জিত রাখা হয়।** এদের বাদশাহ, প্রিন্সরা সেখানে বেড়াতে গিয়ে দুই হাতে টাকা উড়িয়েও শেষ করতে পারে না। ব্যক্তিগত বিহারের জন্য পাবলিক সমুদ্রসৈকত ভাড়া করে নেওয়ারও নজির আছে। নিজের ও পরিবারের ব্যবহারের জন্য

তাদের যে বিমানগুলো আছে সেগুলোর এক একটির দাম কয়েকশ' কোটি টাকা। এভাবে এদের বিলাসিতার বীভৎসতার সম্বন্ধে লিখতে গেলে আলাদা বই হয়ে যাবে। এদের মধ্যে তাসাওয়াফের কিছুমাত্র প্রভাবও থাকলে এরা এমন কদর্য বিলাসিতায় নিজেদের ডুবিয়ে দিতে পারতেন না। নিজেদের অতি উৎকৃষ্ট মুসলিম বলে মনে করলেও এবং তা প্রচার করলেও আসলে ইউরোপ, আমেরিকার বস্তুতান্ত্রিকদের (Materialist) সাথে তাদের কার্যতঃ কোনো তফাৎ নেই। এরা এই উম্মাহর কেন্দ্র কাবা এবং নেতার (সা.) রওযা মোবারকের হেফাযতকারী হলেও এই উম্মাহর জন্য তাদের মনে কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই। তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, নিজেদের ঘৃণ্য বিলাসিতার সামগ্রী কিনতে তাদের বিপুল সম্পদ চলে যায় ইউরোপ, আমেরিকা আর জাপানে। তারপরও যে বিরাট সম্পদ তাদের থেকে যায় তা বিনিয়োগ করেন সেই ইউরোপ, আমেরিকা ইত্যাদির ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে, শিল্পে। টাকা জমা রাখেন ঐসব দেশের ব্যাংকেই যা থেকে লাভবান হয় ঐসব অমুসলিম দেশ ও জাতিগুলোই। ইসলাম ও মুসলিম জাতির প্রতি তাদের কিছুমাত্র ভালোবাসা যদি থাকতো তবে ঐ বিরাট সম্পদ তারা অমুসলিম দেশগুলোতে বিনিয়োগ না করে গরীব মুসলিম ভৌগোলিক রাষ্ট্রগুলোতে বিনিয়োগ করতেন। এতে অন্তত পার্থিব দিক দিয়ে এই হতভাগ্য জাতির কিছু অংশ উপকৃত হতে পারত।

তাদের শিয়া-সুন্নি বিরোধের জের ধরে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য আজ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। একটার পর একটা মুসলিমপ্রধান দেশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা ধ্বংস হচ্ছে, যুদ্ধাক্রান্ত মুসলমানদের থাকবার জায়গা নেই, খাদ্য নেই, চিকিৎসা নেই, আড়াই কেজি চাউলের বিনিময়ে সন্তান বেচে দেওয়ার ঘটনাও ঘটছে। অভাবে পড়ে নারী দেহব্যবসায় লিপ্ত হয় এটাই প্রচলন, কিন্তু হতভাগা মুসলমানদের দুর্গতি কত অচিন্তনীয় যে, ইরাক-সিরিয়ার উদ্বাস্তু পুরুষরা পর্যন্ত দেহব্যবসায় লিপ্ত হতে বাধ্য হচ্ছে। **কিন্তু পরিহাসের বিষয় হচ্ছে, জাতির এই দুঃখ-দুর্দশা দেখে খ্রিষ্টান ইউরোপের কোনো কোনো দেশ মুসলমানদের জন্য দেশের সীমান্ত উন্মুক্ত করে দিলেও একটা ধনী আরব বাদশাহ বা আমির তাদের মুসলিম ভাই-বোনের জন্য দেশের সীমান্ত খুলে দেওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারল না।** তারা নিজেরা যে প্রাসাদ, অট্টালিকায় বিলাসী জীবনযাপন করেন সেগুলোতে আশ্রয় নাই বা দেয়া হলো, অন্তত আলিশান মসজিদের দরজাটাও খুলে দিতে পারল না। কেউ একজন বলতে পারল না যে, 'ওহে মুসলমান ভাইয়েরা, তোমরা আমাদের ভাই, আমরা বেঁচে থাকতে তোমাদের সুরক্ষার অভাব হবে কেন? যতদিন তোমরা নিজেদের দেশে বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ না পাচ্ছো ততদিন আমাদের সঙ্গেই থাকবে।' এমন একটা শান্তনার বাণীও উচ্চারণ করতে ব্যর্থ হলেও সীমান্তে কড়াকড়ি আরোপের ব্যাপারটি

তারা কেউই ভুলে গেলেন না, যার ফলে একজন উদ্বাস্তু মুসলমানও এইসব ধনী দেশে মাথা গোঁজার ঠাঁই না পেয়ে নৌকাযোগে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে পানিতে ডুবে মরতে লাগল। জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কেবল ২০১৪ থেকে ২০১৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে পানিতে ডুবে প্রাণ হারিয়েছে দশ হাজার মুসলিম শরণার্থী। এই বেদনাদায়ক অধ্যায় পত্র-পত্রিকায়, টিভিতে, ইন্টারনেটে সবাই দেখে চলেছেন, ইসলামের ধ্বজাধারী আরবরা আমাদের চাইতে আরও কাছ থেকে দেখছে, কিন্তু তাদের সুরক্ষায় একটা আঙ্গুলও তুলছে না কারণ পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ভোগবাদের চাইতে তারা আরও বড় ভোগবাদী, আরও বড় স্বার্থপর হয়ে পড়েছে। তাদের এই ভোঁতা চরিত্রে তাই ইসলামের কোনো শিক্ষাই প্রতিফলিত হয় না। জাতি ধ্বংস হলেও তারা নির্বিকার থাকতে পারেন, নির্লজ্জভাবে নিজেদের মুসলিম পরিচয় নিয়ে গর্ববোধ করতে পারেন। আল্লাহ যে কোর'আনে বহুবার বলে দিলেন, মো'মেনরা কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর আর নিজেদের মধ্যে হবে সহানুভূতিশীল এরা হয়েছে ঠিক তার উল্টো, অর্থাৎ নিজেরা নিজেরা শত্রুভাবাপন্ন আর যারা ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে দুনিয়া থেকে মুছে দিতে চায় সেই পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি ভক্তিতে গদগদ। উদাহরণস্বরূপ সাম্প্রতিক সৌদি-কাতার বিরোধের ব্যাপারটিই ধরুন।

সৌদি আরবের সাথে কাতারের মনোমালিন্য হয়, যথারীতি সেই মনোমালিন্য শত্রুতার পর্যায়ে গিয়ে পোঁছে এবং কাতারের বিরুদ্ধে সৌদি আরবসহ কয়েকটি আরব রাষ্ট্র কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিকসহ সমস্ত রকম সম্পর্কচ্ছেদ করে দেশটিতে অবরোধ আরোপ করে। **হাস্যকর ব্যাপার হচ্ছে বিরোধের মূলে থাকা এই দুই দেশই খাঁটি মুসলিম দাবীদার এবং এদের মধ্যে একটি দেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সবচাইতে বড় একক অস্ত্রচুক্তি রয়েছে, আর অন্য দেশটির সাথেও সম্প্রতি ১২ বিলিয়ন ডলারের সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।** অর্থাৎ উভয় দেশই সাম্রাজ্যবাদীদের গোলামীতে আর নিজেরা নিজেরা কোন্দলে লিপ্ত থেকে কোর'আনের হুকুম অমান্য করেছে, অথচ নিজেদেরকে মনে করছে পৃথিবীর সবচাইতে ভালো মুসলিম।

আমাদের দেশের ধর্মভীরু মুসলমানরা ঐসব দেশের নাম শুনলে 'নবীর দেশ'- এ কথা চিন্তা করে বিগলিত হয়ে পড়ে। আরবদের সামনে শ্রদ্ধা আর ভক্তিতে নুইয়ে পড়ে কারণ তারা নবীজীর মাতৃভাষা আরবিতে কথা বলে, নবীজী যে মাটিতে চলাফেরা করেছেন সেখানে চলাফেরা করে। কিন্তু ঐ আরবরা কি আমাদের এই সেন্টিমেন্টের কোনো তোয়াক্কা করে? কখনই করে না। অনেক উদাহরণ দেয়া যায় যাতে বোঝা যায় আমরা আরবদেরকে ভাই মনে করলেও তারা আমাদেরকে তেমনটা মনে করে না। অতি দরিদ্র মুসলিম দেশগুলোর

জন্য তারা মাঝে মাঝে খয়রাত প্রেরণ করেন যখন কোনো দেশে বন্যা, ঝড় বা প্লাবনের মতো প্রাকৃতিক কারণে মহা ক্ষতি হয়। **কিন্তু এইসব দেশগুলোর মানুষকে তারা ডাকেন মিসকিন বলে।** এই মিসকিনদের সম্পর্কে আরবরা কী পরিমাণ ঘৃণা লালন করে তার সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ দিচ্ছি পত্রিকার পাতা থেকে। সম্প্রতি সৌদি আরবের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান রিয়াদে এক অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের মুসলমানদের 'ধর্মান্তরিত মুসলমান' বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, 'ভারত ও বাংলাদেশের মুসলমানরা ধর্মান্তর করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।' একইসাথে সৌদি আরবের মুসলমানরাই যে একমাত্র প্রকৃত মুসলমান সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি আরও বলেন, ভারতের মতো দেশের হিন্দুদের মধ্যে ধর্মান্তরিত হয়ে যারা মুসলমান হয়েছে তারাই পাকিস্তানে থাকে। পাকিস্তানি মুসলিমরা আরবদের দাস এবং সারা জীবন তারা আরবদের দাস হয়েই থাকবে।(১)

এই হচ্ছে অনারবদের সম্পর্কে আরবদের ধারণা। তাদের এই অহংকারী মনোভাব কিন্তু আজকের নতুন নয়, ইসলামের পূর্বেও ছিল। ইসলামপূর্ব যুগের কোরাইশী আভিজাত্য ও অহংকারের কথা কে না জানে? ইসলাম কিছু সময়ের জন্য সেই বংশীয় কৌলিন্যের নিচে চাপা পড়ে পিষ্ট হতে থাকা বেলাল, যায়েদদেরকে টেনে তুলে ক্বাবার উপর উঠিয়ে মুক্তির আযান শোনায়, কোরায়েশী আভিজাত্যের মূলোৎপাটন করে। কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হতে পারল না জাতির আকিদা বদলে যাবার কারণে। **লক্ষ্য হারিয়ে যাবার পর উম্মাহর মধ্যে যে বিকৃতিগুলো আসতে লাগল তার মধ্যে অন্যতম ছিল এই বংশীয় অহংবোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা। ইসলামের সাম্যবাদী আদর্শ ভুলে যাওয়া হলো এবং গোত্রীয় কৌলিন্যকে টেনে তোলা হলো জাহেলিয়াতের কবর খুঁড়ে।** তারপর যখন এই শ্রেণিটির হাতেই অতি মূল্যবান তেলসম্পদের মালিকানা এল, তারা আক্ষরিক অর্থেই নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ (আশরাফ), আর অন্যান্য মুসলিমদেরকে নিকৃষ্ট (আতরাফ) ভাবতে লাগল। আল্লাহর রসুল যে বিদায় হজ্বের ভাষণে বারবার করে বলে গেলেন আরবের উপর অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, যেমন নেই অনারবের উপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব- ওসব কথা তাদের মনে রইল না, রইলেও ওসব কথার কোনো গুরুত্ব তারা দেয় না। তারা আরব, সবার শ্রেষ্ঠ এই অহংকারে স্ফীত হয়ে অন্যকে অনুকম্পার পাত্র মনে করছে। অবশ্য এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে এড়াতে পারছে না। ইসলাম দীনে ফিতরাত, প্রাকৃতিক আইন, নিয়মের ধর্ম, সেই নিয়ম মোতাবেকই বিপুল সম্পদ ও আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রে বলীয়ান পঁয়তাল্লিশ কোটি আরবের পেটের হালুয়া বের হয়ে যাচ্ছে দুই কোটির ক্ষুদ্র ইসরাইলীদের

---

১. তথ্যসূত্র: ১২ ও ১৩ জুনের যথাক্রমে দৈনিক যুগান্তর ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের অনলাইন সংস্করণ

লাথি খেতে খেতে। তবুও তারা অহংকারী, কারণ বাকি অনারব 'মুসলিমদের' মতো তাদেরও অপমানবোধ লোপ পেয়েছে।

সৌদি আরবের যে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভারতবর্ষের মুসলমানদেরকে ক্রীতদাস ও ধর্মান্তরিত বলে কটাক্ষ করলেন, তিনি হয়ত আরবের ইতিহাস পড়ে দেখেন নি। পড়লে বুঝতে পারতেন আল্লাহর রসুল যখন আরবদের মধ্যে আসলেন, তখন দুনিয়ার সবচাইতে বর্বর, অসভ্য, পশ্চাৎপদ, কূপমণ্ডূক জাতি ছিল আরবরা। বাকি পৃথিবীর দৃষ্টিতে তারা ছিল ভিখিরির জাত, অবজ্ঞার পাত্র, ঘৃণার বস্তু। এই কারণে আরবের আশেপাশের দেশগুলোর দখলদারিত্ব নিয়ে রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য কাড়াকাড়ি করলেও আরবের ব্যাপারে তাদের কোনো রুচি ছিল না। কারণ তারা জানত এদেরকে শাসন করে ফায়দা নেই। এরা নিজেরাই খেতে পায় না। যারা সিরাত ও হাদিসগ্রন্থগুলো পড়েছেন তাদেরকে বলে দিতে হবে না আরবদের সামাজিক জীবন কেমন ছিল। তারা খেতে জানত না, পায়খানা-পেশাব করতে জানত না, দাঁত মাজতে জানত না। চুল, নখকাটা, ওযু, গোসল, খাদ্যগ্রহণ, স্ত্রী-সহবাস এমন কিছু বাদ ছিল না যে ব্যাপারে আল্লাহর রসুলকে কথা বলতে হয় নি। তাদেরকে 'সভ্যতা' শেখাতে রসুলাল্লাহকে কতই না গলদঘর্ম হতে হয়েছে! অপরদিকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে শুধু একবার চোখ বুলালেও বিস্মিত হতে হয় এখানকার হাজার হাজার বছরের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দেখে।

বহু নবী-রসুল, মুনী-ঋষি-অবতারদের মিলনমেলা এই ভারতবর্ষকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'মহামানবের সাগরতীর'। সেই মহামানবদের শিক্ষা আংশিক হলেও বৈদিক ধর্মগ্রন্থগুলোতে এখনও সংরক্ষিত আছে। আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করি বিভিন্ন পুরানে আখেরী নবীর নাম পর্যন্ত উল্লেখ রয়েছে, তাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত আছে। এ থেকেই বোঝা যায় আল্লাহ পৃথিবীর অন্যান্য জনপদের মতো সদাসমৃদ্ধ ভারতবর্ষেও অনেক নবী-রসুল প্রেরণ করেছেন যাদের শিক্ষা বর্তমানে অনেকাংশেই বিকৃত হয়ে গেছে। অপরদিকে আরবদের অতীত কী? সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাঁর রসুলকে বলেন, তাদের মধ্যে আমি কোনো কিতাব দেই নি যা তারা অধ্যয়ন করবে এবং আপনার পূর্বে তাদের কাছে কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করি নি।(১) অন্যত্র আল্লাহ আরবদের চরিত্র ও সহজাত প্রবণতার বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে যে, 'কুফরি এবং মুনাফেকিতে আরবরা খুব বেশি পাকাপোক্ত। আর এরা সেসব নীতি-কানুন না শেখারই যোগ্য যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসুলের উপর নাযিল করেছেন।(২) **স্বয়ং আল্লাহ যাদেরকে কুফরি আর মুনাফেকিতে সিদ্ধহস্ত বলছেন, সেই**

---

১. আল কোর'আন: সুরা সাবা ৪৪

২. আল কোর'আন: সুরা তওবা ৯৭

আরবদের এত অহংকার আসে কোথা থেকে? নবীজী তাদের দেশে জন্ম নিয়েছেন সেই কারণেই কি? তাহলে তাদের জেনে রাখা উচিত জাপান সূর্যোদয়ের দেশ হতে পারে, তবে তার মানে এই না যে, সূর্য জাপানের। আল্লাহর রসুল মানবজাতির ভাগ্যাকাশে উদিত সূর্যের মতোই এমন এক নক্ষত্র যাঁর উপর সবার অধিকার আছে, সবার জন্যই তিনি আল্লাহর প্রেরিত রসুল, রহমাতাল্লিল আলামিন। সেই রহমাতাল্লিল আলামিনের আনীত আদর্শ থেকে লক্ষ কোটি মাইল দূরে সরে যাওয়া আরব দেশ ও আমীরাতগুলো সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে তাদেরকে বলে দিতে হবে না তাদের বাদশাহ ও আমীরদের ইলাহ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের যার যার সিংহাসন ও আমীরত্ব। সিংহাসন ও আমিরত্বের নিরাপত্তার জন্য তারা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি নতজানু থাকেন, তাদের কথায় ও আদেশে উঠেন বসেন, ঐ রাষ্ট্রগুলোর সাথে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা সহায়তা চুক্তি করেন, জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং অন্য মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন। তারা ভালো করেই জানেন তাদের সাথে আল্লাহ নেই, তারা যেমন আল্লাহকে ত্যাগ করে পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোকে প্রভু ও অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে আল্লাহও তেমনি তাদেরকে ত্যাগ করেছেন। **এই অবস্থায় তারা যদি বিধর্মী কোনো রাষ্ট্রশক্তির আক্রমণে কিংবা নিজেরা নিজেরাই যুদ্ধ করে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্নও হয়, তবু আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন না, তাদের ধ্বংস হতে দিবেন।** কেননা আল্লাহর সাহায্য কেবল মো'মেনদের জন্য এবং এই আমীর ও বাদশাহরা ভালো করেই জানেন বাকি পৃথিবীর মুসলিম নামধারীদের মতো তারাও আল্লাহর সাহায্য পাবার উপযুক্ত নয়। সুতরাং তারা এমন কিছু করেন না যাতে পশ্চিমা প্রভুরা বিরক্ত হয়, ফলে সিংহাসন ও আমীরত্ব হারাতে হয়। বরং পশ্চিমা প্রভুদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে যে কোনো কিছু করতে প্রস্তুত থাকেন। **যদি আজ বাদে কাল এমন কোনো পরিস্থিতি হয় যে তাদের সিংহাসন বা আমীরত্ব রক্ষা এবং কাবা ধ্বংস করা এ দু'টোর মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে, তবে হয়ত তারা সিংহাসন রক্ষা করতে কাবা ধ্বংসকেই বেছে নেবেন।**

আল্লাহ তাঁর রসুলকে প্রেরণ করেছেন মানবজাতির মধ্য থেকে সমস্তরকম ভেদাভেদ দূর করে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য। সেই রসুলকে নিয়ে ও তাঁর সারা জিন্দেগির সংগ্রামের ফসল ইসলামকে নিয়ে আরবদের এই তামাশা আল্লাহ নিশ্চয়ই কেয়ামত পর্যন্ত চলতে দেবেন না। তাদেরকে ও তাদের দ্বারা পুনর্জীবিত হওয়া জাহেলিয়াতের জঞ্জালকে পরিষ্কার করার জন্য এমন জাতির আবির্ভাব অবশ্যই হবে যাদের মাধ্যমে আল্লাহ পুনরায় প্রকৃত ইসলামকে উদ্ভাসিত করবেন। একদিন রসুলাল্লাহ (সা.) আসরের নামাজের পর হঠাৎ পূর্ব দিকে চেয়ে খুশি হয়ে হাসলেন। সাহাবারা

জিজ্ঞাসা করলেন তিনি অমন করে হাসলেন কেন? জবাবে বিশ্বনবী (সা.) বললেন- ভবিষ্যতে ইসলাম বিকৃত হয়ে যাবার পর হিন্দের (ভারতের) পূর্বে একটি সবুজ দেশ থেকে প্রকৃত ইসলাম পুনর্জীবন লাভ করবে।(১)

প্রশ্ন হচ্ছে হিন্দের পূর্বের কোন সেই দেশ, যে দেশে আল্লাহ তাঁর হারিয়ে যাওয়া দীনের জ্ঞানকে পুনর্জীবিত করবেন এবং কোন সেই ব্যক্তি যিনি চরম নৈরাজ্য আর হানাহানিতে লিপ্ত আরব্য জাহেলিয়াতের হাত থেকে ইসলামকে মুক্ত করবেন? মহান রব্বুল আলামিনের কাছে আমাদের আকুল আবেদন সেই দেশ যেন আমাদের এই প্রিয় বাংলাদেশ হয় এবং যেই মানুষগুলোকে দিয়ে তিনি প্রকৃত ইসলামের বিজয়কেতন ওড়াবেন আমরা যেন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি।

---

১. হাদিস

ধর্মব্যবসায়ীদের ‘সুন্নতি লেবাস’ ও উপাধিসমূহ

ধর্ম আর ধর্মব্যবসাকে গুলিয়ে ফেলার কারণে অধিকাংশ মানুষ ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে ভাবে- ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলছি না তো? ধর্মব্যবসায়ীদেরকে ত্যাগ করতে গিয়ে ভাবে ধর্মকে ত্যাগ করছি না তো? ধার্মিক ও ধর্মব্যবসায়ীর মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা তাই আমাদের টানতে হবে। মনে রাখতে হবে, ধর্ম মানুষকে মুক্তি দেয়। এটা যেমন ব্যক্তিকে তেমনি সমাজকেও যাবতীয় অন্যায়-অনাচার থেকে মুক্তি দেয়; যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়, উন্নতি ঘটায়। অপরপক্ষে ধর্মব্যবসা ধর্মকেই ধ্বংস করে দেয়, ধর্মের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট করে দেয়।

ধর্ম এবং ধর্মব্যবসা আলাদা করার অন্যতম কষ্টিপাথর হলো- কর্মটিতে ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে কি না তা পরখ করে দেখা। ধর্মের কাজ হয় নিঃস্বার্থভাবে। ধর্মের কাজ করতে গেলে স্বার্থ ত্যাগ করতে হয় এবং বিনিময় কেবল আল্লাহর নিকট থেকে আশা করতে হয়। **যখনই দেখা যাবে কেউ ধর্মের নাম দিয়ে ব্যক্তিগত বৈষয়িক স্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধার করছে তখনই বুঝতে হবে - এটা ধর্মব্যবসা।**

ধর্মব্যবসায়ীরা হয় ভোগী আর ধার্মিকরা হয় ত্যাগী। ধর্মব্যবসায়ীরা দান গ্রহণ করে আর ধার্মিকেরা দান করে। ধর্মব্যবসায়ীরা ধর্মকে ব্যবহার করে আর ধার্মিকরা ধর্মকে ধারণ করে। ধর্মব্যবসায়ীরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে হয় নীরব, কাপুরুষ আর ধার্মিকরা হয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার, তারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। ধর্মব্যবসায়ীরা যেটুকু ধর্ম পালন করে তা কেবল মানুষকে দেখানোর জন্য আর ধার্মিকরা ধর্ম পালন করে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য।

অর্থাৎ **ধার্মিক আর ধর্মব্যবসায়ীর প্রভেদ তাদের বেশ-ভূষা, ভাবমূর্তির মধ্যে খুঁজলে হবে না। খুঁজতে হবে তাদের চরিত্রে এবং তাদের কাজে।** আল্লাহর রসুল বলেছেন, “কেয়ামতের দিন মিজানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারি বস্তু হবে মো’মেনের উত্তম চরিত্র।(১) প্রতারণা করার জন্য বেশভূষা গুরুত্বপূর্ণ ছদ্মবেশ। তাই যারা ধার্মিক সেজে ধর্মব্যবসা করে তারা বেশভূষায় একেবারে নিখুঁত থাকার চেষ্টা করে যেন কেউ তাদের বাহ্যিক অবয়বে, চালচলনে ভুল ধরতে না পারে। যারা ধর্মব্যবসা করে

---

১. হাদিস - তিরমিযি

তাদেরকে বেশভূষা আর লোক দেখানো আমল বিচার করে দীনের ধারক-বাহক মনে করা মস্ত বড় পথভ্রষ্টতা। কারণ এ বিষয়ে আল্লাহর রসুল (সা.) জাতিকে সাবধান করে গেছেন এই বলে যে, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, কোনো মানুষের ঈমান সঠিক হতে পারবে না যতক্ষণ না সে সৎ ও বিশ্বাসী হয়। আমি তোমাদেরকে হেদায়েত করছি যে তোমরা কোনো ব্যক্তির অধিক সালাহ্ আদায় ও অধিক সিয়াম পালন করা দেখে ভুল করো না, বরং লক্ষ্য করো সে যখন কথা বলে সত্য বলে কি না এবং তার কাছে রাখা আমানত বিশ্বস্ততার সাথে ফিরিয়ে দেয় কিনা। এবং নিজের পরিবার পরিজনের জন্য হালাল উপায়ে রোজগার করে কিনা। যদি সে আমানতদার ও সত্যবাদী হয় এবং হালাল উপায়ে রেযেক হাসিল করে তাহলে নিশ্চয়ই সে কামেল মো'মেন।(১)

বর্তমানে মুসলিম চেনার জন্য চারিত্রিক মাহাত্ম্য নয় বরং দাড়ি, টুপি, বেশভূষাকেই মানদণ্ড হিসাবে ধরা হয়। কারণ এটাই প্রচার করা হয়েছে, শেখানো হয়েছে। দাড়ি, টুপি নেই এমন কেউ যদি আজ প্রকৃত ইসলামের সত্যগুলো এবং প্রচলিত ইসলামের বিকৃতিগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরতে যান, এমন কি ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য শহীদ হতেও পণ করেন তখনও প্রথম যে প্রশ্নটির মোকাবেলা তাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে, "আপনি ইসলামের কথা বলছেন, কিন্তু আপনার সাড়ে তিন হাত শরীরেই তো ইসলাম নাই? আগে তো নিজেদের শরীরে ইসলাম কায়েম করতে হবে। ইসলামের আপনি কী বুঝেন, মাদ্রাসায় পড়েছেন?" খুব আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে সম্পূর্ণ যুক্তিহীন ও হাস্যকর এই প্রশ্নটি করা হয়। মুসলিম জাগরণের কবি, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'আমার কৈফিয়ৎ 'কবিতায় কম দুঃখে এ কথা বলেন নি,

ফতোয়া দিলাম কাফের কাজী ও,
যদিও শহীদ হইতে রাজি ও।

একজন ব্যক্তির শুধুমাত্র মাদ্রাসায় না পড়া অথবা দাড়ি-টুপি ধারণ না করার অপরাধে তার সকল সত্য ও ন্যায়সঙ্গত বক্তব্যকেই যারা তুড়ি দিয়ে বাতিল করে দিচ্ছেন, এখন যদি তাদেরকে পাল্টা প্রশ্ন করা হয় যে, দাড়ি, টুপি, পাগড়ি ধারণ না করলে ইসলামের কথা বলা যাবে না এমন কোনো কথা পবিত্র কোর'আন-বা হাদিসে উল্লেখ আছে কি? এমন কোনো শর্ত তো আল্লাহ বা রসুল (স.) দেন নি। তাহলে এমন প্রশ্ন কেন উঠল?

এই প্রশ্ন ওঠার কারণ ইসলামের বিষয়গুলোর মধ্যে গুরুত্বের ওলোট-পালোট। ইসলামের মূল বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখন যদি জিজ্ঞেস করা হয় ইসলামের উদ্দেশ্য কী? তাহলে ১৬০

---

১. রসুলাল্লাহর ভাষণ, সিরাত বিশ্বকোষ ১২ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

কোটি মুসলিমের কাছে অন্ততঃ ভিন্ন ধরনের কয়েক কোটি উত্তর পাওয়া যাবে। তাই পোশাক আশাকের বিষয়টি সম্যকভাবে বুঝতে হলে আগে আমাদেরকে ইসলামের উদ্দেশ্য কী সেটা উপলব্ধি করতে হবে।

মানবসৃষ্টির সূচনালগ্নে মহান আল্লাহর সঙ্গে ইবলিসের একটি চ্যালেঞ্জ হয়। সেই চ্যালেঞ্জটির বিষয়বস্তু ছিল মানবজাতি পৃথিবীতে শান্তিতে বসবাস করবে, নাকি মারামারি কাটাকাটি হানাহানি, যুদ্ধ, রক্তপাতে লিপ্ত থাকবে? মানুষ যদি শান্তিতে থাকে তাহলে চ্যালেঞ্জে আল্লাহ বিজয়ী হবেন, আর যদি অশান্তি অরাজকতার মধ্যে বাস করে তাহলে ইবলিস বিজয়ী হবে। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ নবী-রসুলদের মাধ্যমে জীবনবিধান পাঠালেন। সেটা মানুষের সামগ্রিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করলে সমাজে শান্তি আসবে। আর অন্য জীবনব্যবস্থা দিয়ে জীবন চালালে অশান্তি বিরাজ করবে। নবী-রসুলগণ এভাবে আল্লাহকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে গেছেন।

সত্যদীনের ফল হচ্ছে শান্তি, এ কারণে ইসলামের অন্যতম শাব্দিক অর্থই হচ্ছে শান্তি। আজ ধর্মের নামে বহু বাহ্যিক আড়ম্বর করা হয়, উপাসনা, আনুষ্ঠানিকতার কোনো শেষ নেই, অথচ আমরা আমাদের সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করছি আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে, তাঁর হুকুমের বিপরীত তথা সাংঘর্ষিক হুকুম দিয়ে। যেমন আল্লাহ সুদ হারাম করেছেন আর আমাদের জাতীয় অর্থনীতিটাই সুদভিত্তিক। এভাবে অন্য সমস্ত অঙ্গনেও একই অবস্থা। এর পরিণতি হিসাবে আজ পৃথিবীর সর্বত্র ঘোর অশান্তি, যার অর্থ আজ ইবলিস বিজয়ী হয়ে আছে। আর আল্লাহর দীন, জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে আর কোনো কিছু দিয়েই আল্লাহকে বিজয়ী করা সম্ভব না। ফলে যে কাজের দ্বারা আল্লাহ বিজয়ী হন না, সমাজে ন্যায়, শান্তি, সুবিচার প্রতিষ্ঠা হয় না, সে কাজের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। এখন চিন্তা করুন, ইসলামের সাথে দাড়ি, টুপি, পাগড়ি, জুব্বার সম্পর্ক কোথায়, কী বা কতটুকু?

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার, যুদ্ধনীতি, বাণিজ্যনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি সব কিছুই ইসলাম নামক জীবন-ব্যবস্থার এক একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুতরাং যারা আমাদের শরীরে ইসলাম নাই এই প্রশ্ন করেন তাদের কাছে এই প্রশ্নটি করা দরকার যে, একটি দেশের সব মানুষ যদি দাড়ি রাখে, টুপি পরে, জোব্বা গায়ে দেয় কিন্তু তাদের সামষ্টিক জীবনের ঐ বিষয়গুলো যদি ইসলামের না হয় তাহলে কি সেই দেশে শান্তি এসে যাবে? আসবে না। **কারণ রসুলের (স.) আগমনের পূর্বেও আরবের মানুষগুলো দাড়ি রাখত, টুপি, পাগড়ি, জোব্বা পরত। এটা প্রাচীন যুগ থেকেই আরবীয় সংস্কৃতি। কথিত আছে দাড়ি ছিল আরবদেশে নেতা নির্বাচনে যোগ্যতার অন্যতম মাপকাঠি এবং পৌত্তলিকদের প্রথা** (Tradition, Custom)। রসুলাল্লাহ এসে জাহেলিয়াতের

যুগের বহু রসুম-রেওয়াজকে কবর দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও যৌক্তিক সংস্কৃতি আচার প্রথা চালু করলেন। পরবর্তীকালে যখন উমাইয়া রাজতন্ত্র চালু হয় তখন দাড়িকে ইসলামের চিহ্ন বলে এবং রসুলের মহা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত বলে চালু করা হলো। দরবারী আলেমগণ এই আকিদার প্রসারে বেশ ভূমিকা রাখেন। খলিফার আসনে উপবিষ্ট ইয়াজিদের বেশ লম্বা দাড়ি ছিল এটা ঐতিহাসিক সত্য। লম্বা দাড়ি ছিল তার পিতা মুয়াবিয়া (রা.) এবং পিতামহ আবু সুফিয়ানেরও। সেই লম্বা দাড়ি নিয়েই আবু সুফিয়ান রসুলাল্লাহর বিরুদ্ধে হাজারো ষড়যন্ত্র করেছে, দীনের চূড়ান্ত বিরোধিতা করেছে, শুধু তা-ই নয়, একের পর যুদ্ধ করে শত শত সাহাবিকে হত্যা করেছে। কী লাভ হলো আবু সুফিয়ান, আবু জেহেল, আবু লাহাবদের দাড়ি রেখে? প্রকৃতপক্ষে দাড়ি ছিল আরবীয় ঐতিহ্য ও বিশেষত কোরায়েশ বংশীয় অভিজাত্যের প্রতীক। সুতরাং সে ঐতিহ্য যেন কায়েম থাকে সেটারই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়েছিল জাল হাদিসে দাড়ির গগনস্পর্শী গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে।

সে যাই হোক প্রকৃতপক্ষে এই শেষ দীনে কোনো নির্দিষ্ট পোষাক হতে পারে না, কারণ এটা এসেছে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের জন্য। পৃথিবীর মানুষ প্রচণ্ড গরমের দেশে, প্রচণ্ড শীতের দেশে, নাতিশীতোষ্ণ দেশে, অর্থাৎ সর্বরকম আবহাওয়ায় বাস করে, এদের সবার জন্য এক রকম পোষাক নির্দেশ করা অসম্ভব। বিশ্বনবীর (সা.) সময়ে তাঁর নিজের এবং সাহাবাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও তখনকার আরবের মোশরেক ও কাফেরদের পরিচ্ছদ যেমন একই ধরনের ছিল, বর্তমানেও মুসলিম আরব, খ্রিষ্টান আরব ও ইহুদি আরবরাও একই ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ পরে। নবী এসেছেন আরবে, তাই তিনি আরবীয় পোশাক পরেছেন। তিনি পুরুষ, শুধু পুরুষ নন - সুপুরুষ, বীরপুরুষ, মহাপুরুষ। তাঁরও দাড়ি ছিল তবে সে দাড়ি উসকো-খুসকো, উলুঝুলু, হাওয়ায় ওড়ানো অনিয়ন্ত্রিত দাড়ি ছিল না। তাঁর দাড়ি ছিল সুন্দরভাবে নির্দিষ্ট মাপে ছাঁটা যেন তাঁকে সুন্দর (Smart) দেখায়। আল্লাহ দাড়িকে পবিত্র কোর'আনে বাধ্যতামূলক (ফরদ) করেন নি, করলে গোটা মানবজাতির মধ্যে বিরাট একটি অংশই সেটা পালন করতে পারত না। **তেমনি আরবীয় পোশাককেও তিনি ইসলামে বাধ্যতামূলক করেন নি। করলে মেরু অঞ্চলের মানুষের সেই হুকুম মান্য করা সম্ভব হতো না। এমনকি আমাদের দেশের মতো কৃষিপ্রধান নদীমাতৃক দেশের ধানচাষী ও পাটচাষীদের সারাক্ষণ কাঁদা, হাঁটুপানি-কোমর পানিতে নেমে লুঙ্গি কাছা দিয়ে কাজ করতে হয়। আরবীয় জোব্বা পরে সেটা কি সম্ভব? না। আল্লাহ সেটা জানেন বলেই আরবের পোশাক তিনি সকল এলাকার মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক করেন নি বা উৎসাহিতও করেন নি।** কিন্তু ঘটনা হয়েছে কি, পূর্বের ফকীহ, ইমাম, মুফাসসিরগণ রসুলাল্লাহর সমস্ত আচরণকেই ইসলামের মাসলা মাসায়েলের মধ্যে, বিধি-বিধানের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। তাদের যুক্তি হলো আল্লাহ রসুলকে অনুসরণ করার হুকুম দিয়েছেন। আলেম ওলামারা

এই অনুসরণের মানে করেছেন যে রসুলের দাড়ি ছিল, তিনি খেজুর খেতেন, তিনি পাগড়ি, জোব্বা পরিধান করতেন - তাই এগুলোও করতে হবে। এগুলোকেও তারা শরিয়তের বিভিন্ন স্তরের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। সেখানেও আছে উপর্যুপরি মতভেদ। ফকীহ-মুফতিদের কেউ বলছেন এগুলো ওয়াজিব, কেউ বলছেন সুন্নত। সেই সুন্নতের মধ্যেও আছে প্রকারভেদ। কেউ বলছেন সুন্নতে মোয়াক্কাদা, কেউ সুন্নতে যায়েদা ইত্যাদি। *এখন আরবের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-আশাক ইত্যাদি ইসলামের এতই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে গেছে, ঐ লেবাস না থাকলে এখন কারো ইসলামের কথা বলার অধিকারই থাকে না। এই যে শরিয়ত বা প্রথা প্রচলন করা হলো, এটা কিন্তু কোর'আনের শিক্ষা নয়, ইসলামেরও শিক্ষা নয়, এটা আলেম-ওলামা, বিভিন্ন মাজহাবের ইমামদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তৈরি করা শরিয়ত।*

এমন আরো বহু উদাহরণ দেওয়া যাবে। এই জন্য জাতির ঐক্য গঠনের গুরুত্বের চেয়ে লেবাসের গুরুত্ব বেশি। তাদের অধিকাংশ সদস্য জানেই না যে দীন প্রতিষ্ঠা কী জিনিস, কিন্তু দাড়ির বিষয়ে তারা খুব সতর্ক। গুরুত্বের এরই সাংঘাতিক ওলট-পালট কী করে হলো সে আলোচনা অন্যত্র করেছি। বাস্তবতা হলো, এই অপ্রাকৃতিক বিধানগুলোকে আল্লাহ-রসুলের বিধান বলে প্রচার করছেন ইসলামের ধারক-বাহক এক শ্রেণির আলেমগণ। অথচ **ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট এলাকার পোশাক-আশাক বা সংস্কৃতিকে অন্য এলাকার মানুষের উপর জোর করে আরোপ করার পক্ষে নয়।** ইসলামে পোশাকের ব্যাপারে আল্লাহ এমন বিশ্বজনীন একটি নীতি দিয়েছেন যা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের মানুষের জন্যই অনুসরণযোগ্য, সেটা হচ্ছে তিনি পুরুষদের জন্য সতর নির্ধারণ করেছেন নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত (এ নিয়েও মতভেদ আছে)। তবে আল্লাহ বা রসুল কেউই বলে দেন নি যে দেহের এই স্থান কী পোশাক দিয়ে আবৃত করতে হবে।

টুপি ইহুদি, শিখ বা অন্যান্য ধর্মের ধর্মগুরুরাও পরেন, তাদেরও দাড়ি আছে, তারাও জুব্বা পরেন, তাদের অনেকেই পাগড়ি পরেন। আল্লাহর অস্তিত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী হিসাবে পরিচিত অনেকেরই দাড়ি ছিল যেমন কার্ল মার্কস, চার্লস ডারউইন, আব্রাহাম লিঙ্কন প্রমুখ। হয়ত বলতে পারেন তাদের টুপি, জুব্বা, পাগড়ি, দাড়ি মুসলিমদের মতো না। হ্যাঁ, তা হয়ত ঠিক, কিন্তু টুপির আকার-আকৃতি (কল্লি) ও রং নিয়ে, জুব্বার আকার-আকৃতি নিয়ে, পাগড়ির রং (সবুজ না সাদা), দাড়ির পরিমাণ ইত্যাদি নিয়ে আলেম ওলামাদের মধ্যেও মতভেদ কম নেই। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মতবিরোধে গিয়ে মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার চেয়ে বড় মূর্খতা আর কিছু নেই, হতে পারে না। গত কয়েক শতাব্দী ধরে এ জাতির দুর্ভাগ্যজনক পরাজয়ের কারণ এগুলোই। অথচ এটা ইতিহাস যে রসুলের একদল সর্বত্যাগী সাহাবী যাদেরকে আসহাবে সুফফা বলা হতো, তাঁরা বাড়ি-ঘরে যেতেন না, মসজিদে নববীতে থাকতেন আর অপেক্ষা করতেন রসুল

(সা.) কখন কী হুকুম দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সে হুকুম বাস্তবায়ন করতেন, সেই সাহাবীদের অনেকেরই গায়ে জোব্বা তো দূরের কথা ঠিকমত লজ্জাস্থান ঢাকার মতো কাপড় সংস্থান করতেও কষ্ট হত।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি ৭০ জন আসহাবে সুফফাকে দেখেছি, তাদের গায়ে কোনো চাদর ছিল না। তাদের পরনে থাকত একখানা লুঙ্গি কিংবা একখণ্ড কাপড়, যা তারা গলদেশের সঙ্গে বেঁধে রাখতেন। আর নামাজের সময় তা হাত দিয়ে চেপে ধরতেন যেন সতর খুলে না যায়।

আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) বলেন, আসহাবে সুফফা ছিলেন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। তাদের আর্থিক অবস্থা এতই শোচনীয় ছিল যে, শীত নিবারণ কিংবা পুরো শরীর আবৃত করার মতো কোনো কাপড় তাদের ছিল না। এ অবস্থায় অর্ধ আবৃত পোশাক নিয়ে তারা বাইরে আসতে লজ্জাবোধ করতেন। অন্যদিকে সুফফার (মসজিদে নববীর একটি অংশ) চারপাশ খোলা ছিল বলে অবাধে ধুলাবালি ঢুকত। ফলে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ময়লা হয়ে যেত।(১)

সুতরাং অতি উৎকৃষ্ট মো'মেন হওয়ার জন্য বড় বড় জোব্বা পরতে হবে এমন কোনো শর্ত ইসলামে থাকতে পারে না। **তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই, বিশ্বনবী (সা.) তার অনুসারীদের একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের দাড়ি রাখতে বলেছেন। কেন বলেছেন? এই জন্য বলেছেন যে, তিনি যে জাতিটি, উম্মাহ সৃষ্টি করলেন তা যেমন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি তেমনি বাইরে থেকে দেখতেও যেন এই উম্মাহর মানুষগুলো সুন্দর হয়।** আদিকাল থেকে দাড়ি মানুষের পৌরুষ ও সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে আছে। সিংহের যেমন কেশর, ময়ূরের যেমন লেজ, হাতির যেমন দাঁত, হরিণের যেমন শিং, তেমনি দাড়ি মানুষের প্রাকৃতিক পৌরুষ সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য নষ্ট না করার উদ্দেশ্যেই দাড়ি রাখার প্রসঙ্গ। দীন প্রতিষ্ঠা করে ইবলিশের চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে জয়ী করার উদ্দেশ্যে নয়।

দাড়ি, টুপি, পাগড়ি, জোব্বা ইত্যাদিকে আমরা অপ্রয়োজনীয় বিষয় বলছি না বা কোনো রকম অসম্মানও করছি না। আমরা শুধু বলছি এই দীনের প্রকৃত উদ্দেশ্য আজ যেমন উল্টো হয়ে গিয়েছে তেমনি এর বাহ্যিক দিকটিও বিকৃত দীনের আলেমরা অপরিসীম অজ্ঞতায় উল্টে ফেলেছেন। দাড়ি রাখা, বাহ্যিক পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি এই দীনের বুনিয়াদী কোনো ব্যাপার নয় অর্থাৎ ফরদ নয়, সুন্নত। তাও রসুলের একেবারে ব্যক্তিগত সুন্নত যে ব্যাপারে রসুলাল্লাহ তাঁর একটি অন্তিম অসিয়তে বলেছেন, "হে মানবজাতি! আগুনকে প্রজ্বলিত করা হয়েছে এবং অশান্তি অন্ধকার রাত্রির মতো ধেয়ে আসছে। আল্লাহর শপথ, আমি আমার থেকে কোনো কাজ তোমাদের উপর অর্পণ করি নি, আমি শুধু সেটাই বৈধ করেছি

---

১. সিরাতুন্নবী- আল্লামা শিবলি নোমানী, হেকায়েতে সাহাবা

যেটা কোরা'আন বৈধ করেছে, আর শুধু সেটাই নিষেধ করেছি যেটা কোর'আন নিষেধ করেছে।"(১) **রসুল যতই বলুন আমার ব্যক্তিগত কিছুই তোমাদেরকে মেনে চলতে হচ্ছে না, আমাদের আলেম-ওলামারা রসুলের সুন্নাহ অনুসরণের নামে সেই ব্যক্তিগত দাড়ি-মেসওয়াক, আরবীয় লেবাসকেই মুসলিম জাতির উপর চাপিয়ে দিতে শত শত বছর ধরে চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছেন এবং নিজেরা সেগুলোকে সর্বাগ্রে ধারণ করছেন। এগুলোকে পছন্দ করার কারণ এগুলো অনুকরণ করতে কোনো ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হয় না।** দাড়ি-টুপি (লেবাস) যদি এই দীনের কোনো ফরদ বা বুনিয়াদী বিষয় হতো, তবে কোর'আনে একবার হলেও এ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হতো। আল্লাহর রসুল এটা সুস্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে- আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক অবস্থা, পোশাক, চেহারা বা সম্পদ কোনো কিছুর দিকেই দৃষ্টিপাত করেন না, তিনি দেখেন তোমাদের হৃদয় এবং তোমাদের কাজ।(২)

তাই 'দাড়ি ইসলামের চিহ্ন', 'দাড়ি না রাখলে ইসলামের কথা বলা যাবে না' এ ধারণা সঠিক নয়। তবে কেউ যদি দাড়ি রাখতে আগ্রহী হয় তাকে এটা বলা যেতে পারে যে, যদি দাড়ি রাখতেই চান তবে, রসুল যেভাবে দাড়ি রাখতে বলেছেন সেভাবে রাখুন যেন সুন্দর, পরিপাটি (Smart) দেখায়। রসুলাল্লাহর যে কোনো সুন্নাহই কল্যাণকর, তাই ব্যক্তিগত জীবনেও রসুলাল্লাহর যা কিছু অনুসরণ করা হবে তাতে মানুষ কল্যাণ পাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আগে কোনটা? আজ সারা পৃথিবীতে কোথাও আল্লাহকে বিধানদাতা (ইলাহ) হিসাবে মানা হচ্ছে না। মুসলিম নামের এই জনসংখ্যাও পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতাকে বিধাতার আসনে বসিয়ে রেখেছে। এ কারণে আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা মো'মেন নেই, রসুলের কথা মতে উম্মতে মোহাম্মদীও নেই। কাজেই তারা আগে ফরজ- যা সরাসরি আল্লাহর হুকুম তা পালন করুক। তারা আগে কলেমার দাবি মোতাবেক এক আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কারো হুকুম-বিধান, দীন মানবো না, এই অঙ্গীকারে নিজেদের আবদ্ধ করুক, আগে মো'মেন হোক; তারপরে সামর্থ্য মোতাবেক সুন্নত, নফল, মুস্তাহাব পালন করুক কোনো আপত্তি নেই। আল্লাহর রসুল বলেছেন, এমন সময় আসবে যখন মানুষ তাহাজ্জুদ পড়বে কিন্তু ঘুম কামাই করা হবে, সওম রাখবে কিন্তু না খেয়ে থাকা হবে (হাদিস)। রসুলাল্লাহ বর্ণিত সেই সময়টি এখন। যেখানে তাহাজ্জুদ, সওমের মতো একনিষ্ঠ আমলও বৃথা যাবে, সেখানে দাড়ি, টুপি, পাগড়ি, জোব্বার মতো আমল গৃহীত হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

ইসলামের বিশেষজ্ঞরা কোর'আন হাদিস নিয়ে গবেষণা করে বের করেছেন যে **সালাতের বাইরে শর্তমূলক ৭ ফরদ, ভিতরে ৭ ফরদ (রোকন), ২১ টি ওয়াজিব, ২১ টি সুন্নাত, ৭ টি মুস্তাহাব। এর মধ্যে দাড়ি, টুপি, জোব্বা, পাগড়ি ইত্যাদি**

---

১. রসুলাল্লাহর প্রথম জীবনীগ্রন্থ সিরাত ইবনে ইসহাক ও সিরাত ইবনে হিশাম।

২. হাদিসঃ আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মুসলিম

কোনো একটি বিষয়ের কোনো উল্লেখ নেই। যে বিষয় নামাজের সময় প্রয়োজন হয় না, সে বিষয় কী করে ইসলামের মৌলিক বিষয় হতে পারে বা তাকওয়ার নির্দেশক হতে পারে? মাহবুবুর রহমান তার নামাজ প্রশিক্ষণ বইতে নামাজ ভঙ্গ হওয়ার মোট ১২৭টি ছোট বড় কারণ উল্লেখ করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি কোর'আন হাদিস, ইজমা, কিয়াস, ফেকাহ, মাসলা মাসায়েলের অগণিত বই ঘেঁটে এই কারণগুলো বের করেছেন।(১) সেই ১২৭টি কারণের মধ্যে এই বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেন নি যে আল্লাহ বলেছেন, তোমরা তাদের অনুসরণ (ইত্তেবা) করো যারা কোনো বিনিময় নেয় না এবং সঠিকপথে আছে।(২) যে কথাটি আল্লাহ স্বয়ং কোর'আনে বলে দিলেন যে বেতনভুক্ত বা পার্থিব বিনিময় গ্রহণকারী ব্যক্তির পেছনে ইত্তেবা করবে না, তার আনুগত্য করবে না সেটা মান্য করা কি ফরদ নয়? সেই ফরদ লঙ্ঘন করে ধর্মজীবী ইমামের পেছনে নামাজ পড়লে সেই নামাজ কি আল্লাহ গ্রহণ করবেন? নামাজ যেন আল্লাহর কাছে কবুল হয় সেজন্য আমাদের অতি পরহেজগার মুসুল্লিগণ শরীর পাক, জায়গা পাক, কেবলামুখী হওয়া ইত্যাদি ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব নিখুঁতভাবে অনুসরণ করেন, ওজু এমন নিখুঁতভাবে করেন যে, নাকের পশম ভিজল কিনা সেটাও খেয়াল করা হয়। ঘড়ি ধরে বসে থাকে ওয়াক্ত হওয়ার জন্য। কিন্তু নামাজ কবুল হওয়ার আল্লাহ প্রদত্ত শর্ত যে বিনিময় গ্রহণকারীর পেছনে না দাঁড়ানো, সেটার কথা তারা সবাই বেমালুম ভুলে গেলেন? একেই কি বলে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো?

আমাদের ইসলামের বিশেষজ্ঞরা মুস্তাহাব আর মাকরুহ নিয়ে গবেষণা করে নিজ নিজ পাণ্ডিত্য প্রকাশে এতই মহাব্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে, আল্লাহর নিষেধাজ্ঞাটি তাদের দৃষ্টির অগোচরে চলে গেছে। একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যখন হিমালয় দেখা হয় তখন আকাশছোঁয়া দিগন্তবিস্তারী পর্বতমালা আর দৃষ্টিগোচর হয় না, পথের একটি ধূলিকণা নিরীক্ষণ করতে করতেই বেলা পার হয়ে যায়।

আর একটি উদাহরণ দিয়ে এ আলোচনার সমাপ্তি টানছি। কার্লমার্কস কমিউনিজম বলে একটি জীবনব্যবস্থা সৃষ্টি করেছেন। এটাও একটা দীন এবং অবশ্যই এই আশা নিয়ে যে তার অনুসারীরা একে সমস্ত পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠা করবে এবং তা করতে সর্বরকম সংগ্রাম করবে। তার অনুসারীরা তা করেছেও। অর্থনৈতিক অবিচার, অন্যায়কে শেষ করে সুবিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তারা অতুলনীয় ত্যাগ, সাধনা, সংগ্রাম, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীর এক বিরাট অংশে তাদের আদর্শ (সমাজতন্ত্র) প্রতিষ্ঠা করেছে। আজ বা ভবিষ্যতে যদি কমিউনিস্টরা তাদের উদ্দেশ্য ভুলে যেয়ে কার্ল মার্কসের ব্যক্তিগত অভ্যাসগুলোকে অনুকরণ করতে থাকে তবে মার্কস কি তাদের অনুসারী কমিউনিস্ট স্বীকার করবেন? তিনি যদি কোনোভাবে

---

১. নামাজ প্রশিক্ষণ - মাহবুবুর রহমান

২. আল কোর'আন: সুরা ইয়াসীন ২১

কবর থেকে উঠে এসে দেখেন, যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য তিনি সংগ্রাম শুরু করেছিলেন সেই পুঁজিবাদকে তার অনুসারীরা গ্রহণ করে নিয়েছে, কম্যুনিস্ট সংবিধান বাদ দিয়ে জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে, কিন্তু ব্যক্তি জীবনে তারা আগের মতই কমিউনিজম বিশ্বাসী, তারা মার্কসের মতো চুল দাড়ি রাখে, তার মতো হ্যাট পরে, তার মতো কাপড় পরে, মার্কস যে কাতে ঘুমাতেন অনুসারীরাও সেই কাতে শোয়, যেভাবে দাঁত মাজতেন সেইভাবে মাজে, হাতে কাস্তে হাতুড়ী মার্কা ব্যাজ পরে, সুর করে দ্যাস ক্যাপিটাল পড়ে এবং কে কত সুন্দর সুর করে তা পড়তে পারে তার প্রতিযোগিতা করে পুরস্কার বিতরণ করে এবং এসব করে সত্যি বিশ্বাস করে যে তারা অতি উৎকৃষ্ট কমিউনিস্ট এবং মার্কসের বিশ্বস্ত অনুসারী- তবে মার্কস কী করবেন? নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি তার অনুসারী দাবিদারদেরকে 'কমিউনিস্ট' বলেই স্বীকার করবেন না, বরং তাদের গায়ে থুথু দেবেন। কম্যুনিস্টরা যদি পুঁজিবাদী গণতন্ত্রই গ্রহণ করে তবে তারা আর কম্যুনিস্ট রইল কী করে?

অনুরূপ অবস্থায় মহানবী (সা.) কী করবেন তা আমাদের কষ্ট করে অনুমান করতে হবে না। কারণ সে কথা তিনি আমাদের আগেই বলে দিয়েছেন। সহিহ হাদিসে উল্লিখিত বিবরণের শাব্দিক অনুবাদকে সহজ ভাষায় বললে ঘটনাটি এমন দাঁড়ায় যে, হাশরের দিন আল্লাহর রসুল (সা.) সবার আগে হাউসে কাওসারে পৌঁছে যাবেন, তারপর তাঁর উম্মতের মানুষ তাঁর সামনে দিয়ে যেতে থাকবে আর তিনি তাদের কাওসারের পানি পান করাতে থাকবেন, যে পানি পান করলে মানুষ আর কখনও তৃষ্ণার্ত হয় না। এর মধ্যে এমন একদল মানুষ আসবে যারা কাওসারের পানি পান করতে অগ্রসর হলেও রসুলাল্লাহ (সা.) ও তাদের মধ্যে এক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হবে। তখন তিনি বলবেন, এরাতো আমার লোক অর্থাৎ আমার উম্মত। তখন বলা হবে অর্থাৎ আল্লাহ বলবেন, আপনি জানেন না আপনার পর আপনার উম্মাহর ঐসব লোক আপনি যে দীন রেখে এসেছিলেন তার মধ্যে কী কী বেদাত করেছে। এই কথা শুনে ব্যাপারটা বুঝে বিশ্বনবী (সা.) ঐ সমস্ত লোকদের বলবেন, দূর হয়ে যাও! দূর হয়ে যাও! যারা আমার পর দীনে বেদাত করেছো।(১) অর্থাৎ মহানবী (সা.) তার উম্মাহর ঐ লোকদের ভাগিয়ে দেবেন, তাদের কাওসারের পানি পান করতে দিবেন না। আল্লাহ রসুলের (সা.) মাধ্যমে যে দীন, জীবনব্যবস্থা মানবজাতিকে দিয়েছেন তা পরিপূর্ণ, তাতে কোনো কিছু নতুন সংযোজন হলো বেদাত। এই বেদাতকে, সংযোজনকে মহানবী (সা.) শেরক বলেছেন, কারণ এটা করা মানে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা, এবং প্রকারান্তরে বলা যে আল্লাহর দীন পূর্ণ নয়। শুধু নতুন সংযোজনই যদি শেরক হয়, যে শেরক আল্লাহ প্রতিজ্ঞা করেছেন মাফ করবেন না বলে, তবে শুধু সংযোজন

---

১. হাদিসঃ আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বোখারি ও মুসলিম।

নয়, দীনের সর্বপ্রধান অর্থাৎ জাতীয় ভাগটিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি ইত্যাদি বর্জন করে সেখানে ইউরোপের ইসলামবিদ্বেষীদের তৈরি ব্যবস্থা জীবনে প্রয়োগ করে রসুলের (সা.) ব্যক্তিগত সুন্নাহগুলো পালন করে যারা নিজেদের উম্মতে মোহাম্মদী বলে মনে করে আত্মপ্রবঞ্চনায় ডুবে আছেন তাদের কী অবস্থা হবে?

প্রত্যেক নবীর একটি করে হাউজ থাকবে এবং তারা প্রত্যেকে যার যার উম্মাহকে কেয়ামতের দিনে তা থেকে পানি পান করাবেন। আমাদের প্রিয় নবীও (সা.) তার হাউজে কাওসার থেকে তার উম্মাহকে পানি পান করাবেন। আল্লাহ যখন নবীকে (সা.) বেদাতকারীদের পানি পান করাতে বাধা দেবেন তখন বোঝা গেল তারা আর নবীর উম্মত নয়। যদিও আপাতদৃষ্টিতে তারা অবশ্যই তার উম্মত ছিল, নইলে মহানবী (সা.) প্রথমে একথা কেন বলবেন যে, ওরাতো আমার লোক, অর্থাৎ আমার উম্মত। ঐ লোকগুলো আজকের 'উম্মতে মোহাম্মদী'। দৃশ্যতঃ এত উৎকৃষ্ট উম্মতে মোহাম্মদী যে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল পর্যন্ত প্রায় ধোঁকায় পতিত হবেন। আল্লাহ বাধা না দিলে তো কাওসারের পানি পান করিয়েই দিতেন। বিশ্বনবী (সা.) যখন তাদের 'দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা' বলে ভাগিয়ে দিবেন তখন অবশ্যই একথা পরিষ্কার যে তার উম্মাহ থেকেই ভাগিয়ে দেবেন। **কাপড়ে চোপড়ে, চলাফেরায়, কথাবার্তায়, খাওয়া দাওয়ায়, শোয়ায় তারা উৎকৃষ্ট সুন্নাহ পালনকারী কিন্তু আসলে বেদাত ও শেরকে নিমজ্জিত। এমন অন্তঃসারশূন্য ঠাঁটবাট বোঝাতে বাংলাদেশে প্রচলিত একটি প্রবচন হলো - উপরে ফিটফাট ভিতরে সদরঘাট।** আমরা দেখি, যাত্রাপালায় অনেকেই রাজা-বাদশাহদের মতো চটকদার পোশাক পরে রাজকার্য পরিচালনা করেন, সেই রকমের সংলাপ বলেন কিন্তু বাস্তবে অভিনয় শেষে সেই পোশাক তাদের খুলে রাখতে হয়। বাস্তবজীবনে তাদের কোনো হুকুম চলে না, কোনো একটি সামাজিক সংকটের সমাধান করারও এখতিয়ার তাদের নেই। আমাদের ধর্মের ধ্বজাধারী শ্রেণিটির অবস্থা এমনটাই, যেন যাত্রাদলের রাজা-বাদশাহ। যাত্রাদলের কাঠের বন্দুকও দেখতে একদম বন্দুক, কিন্তু তা থেকে গুলি বের হয় না। মানবজাতির শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী বিশ্বনবী মোহাম্মদকে (দ.) কাঠের বন্দুক তৈরি করার জন্য আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠান নি। এরা নিজেদের ফাঁকি দিচ্ছেন, অন্যকে ফাঁকি দিচ্ছেন এবং কেয়ামতে আর একটু হলেই একেবারে স্বয়ং নবী করীম (সা.) কেই ফাঁকি দিয়ে ফেলেছিলেন আর কি!

ধর্মব্যবসায়ী আলেম ও প্রকৃত আলেমের পার্থক্য

মক্কার কোরায়েশ বংশ ছিল পুরোহিত বংশ। তখন কাবা শরীফের ভিতরে ও বাইরে সব মিলিয়ে তিনশ' ষাটটি মূর্তি ছিল যেগুলোর পূজা অর্চনা করার সময় কোরায়েশরা পুরোহিতের কাজ করত। এই পুরোহিতরা পূজা ছাড়াও সমাজপতির দায়িত্ব পালন করত। রসুলাল্লাহর গোত্রীয় চাচা আমর ইবনুল হাশেম (যে আবু জাহেল হিসাবে পরবর্তীকালে পরিচিত হয়) ছিল সে সময়ে আরবের মধ্যে একজন খ্যাতিমান বড় আলেম, পুরোহিত ও গোত্রপতি। সবাই তাকে আবুল হাকাম অর্থাৎ জ্ঞানীদের পিতা বলে ডাকত, যেমন আলেমরা নিজেদের নামের আগে লিখে থাকেন আল্লামা (মহাজ্ঞানী, Very high scholar)। কিন্তু যখন আল্লাহর রসুল মানবজাতির উদ্দেশ্যে তওহীদের ডাক দিলেন তখন এই আবুল হাকাম তার জ্ঞানের পরিচয় দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হলো। সে হয়ে দাঁড়াল ইসলামের কট্টর শত্রু (Arch-enemy) এবং কুফরের পতাকাবাহী। তার বিরোধিতামূলক কর্মকাণ্ড ও শত্রুতা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে রসুলাল্লাহ তাকে “এই উম্মাহর ফেরাউন” বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি এও বলেছিলেন, ‘যে আবু জাহেলকে আবুল হাকাম বলে ডাকবে সে সাংঘাতিক ভুল করবে। তার উচিত হবে এই ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা’। কেবল আবু জাহেলই নয়, ইব্রাহিম (আ.) এর আনীত দীনে হানিফের বিকৃতরূপের ধ্বজাধারী মূর্তিপূজক পুরোহিত আলেম শ্রেণির সকলেই ছিল রসুলাল্লাহর ঘোর বিরোধী।

রসুলাল্লাহ যাদের মধ্যে আসেন তারা নিজেদেরকে ইব্রাহীম (আ.) এর উম্মাহ বা অনুসারী বলে দাবি করত।(১) তিনি যে দীনটি তাঁর জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলেন তার নাম আল্লাহ দিয়েছেন দীনে হানিফ অর্থাৎ একাগ্রভাবে শুধু আল্লাহর আনুগত্য করার দীন। এর অনুসারী আরববাসী আল্লাহ বিশ্বাস করত, নামাজ পড়ত, রোজা রাখত, হজ্ব করত, কোরবানি দিত, আল্লাহর নামে কসম খেত, যে কোনো কাজ শুরু করত আল্লাহর নামে। তথাপি তারা কাফের মোশরেক ছিল কারণ তারা তাদের জাতীয় সামষ্টিক জীবনে আল্লাহর হুকুম মানতো না, মানতো নিজেদের গোত্রপতি ও ধর্মনেতাদের হুকুম। তারা মূর্তিপূজা করত মূলত দুটো

---

১. সিরাত ইবনে ইসহাক

কারণে- আল্লাহর সান্নিধ্য এনে দেবে এবং তাদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান করে দেবে, অর্থাৎ আজকে ঠিক যে দু'টো কারণে মানুষ বিভিন্ন পীরের দরবারে যায়। ইব্রাহীম (আ.) এর আনীত সেই দীনে হানিফ কী করে বিকৃত হলো, কী করে সেখানে ধর্মব্যবসার অনুপ্রবেশ ঘটল সেই ইতিহাস একটু বলে নেওয়া প্রয়োজন, কারণ ধর্মব্যবসায়ী আলেম আর প্রকৃত আলেমের পার্থক্যটি বোঝার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি সহায়ক হবে। ইব্রাহীম (আ.) নমরুদ, হামান গংদের কায়েম করে রাখা অন্যায়-অবিচার ও জাহেলিয়াতপূর্ণ সমাজব্যবস্থাকে আল্লাহর সাহায্যে ধ্বংস করে দিয়ে আল্লাহর তওহীদের উপরে ভিত্তি করে নতুন এক সভ্যতা নির্মাণ করেন। তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ মুসলিম জাতির উন্মেষ ঘটান এবং তিনি নিজেও নিজেকে একজন মুসলিম বলেই সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাঁকে ঘিরে আল্লাহর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ছিল বলে তাঁকে আজীবন বহু কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে মুসলিম জাতির পিতা বলে আখ্যায়িত করেছেন।(১) আল্লাহর অভিপ্রায় হচ্ছে এক দম্পতি থেকে উদ্ভূত হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়া মানবজাতি যেন একটা সময়ে আবার আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক জাতিতে পরিণত হয়। এই মহাপরিকল্পনা পূরণের স্থপতি হলেন ইব্রাহীম (আ.)। তিনি সমগ্র মানবজাতির ঐক্যের সূত্ররূপে তাদের মিলিত হওয়ার জন্য পবিত্র কাবাগৃহকে পুনঃনির্মাণ করলেন।

ইব্রাহীম (আ.) এর প্রতিষ্ঠিত দীনের অধীনে শত শত বছর মানুষ শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বাস করেছে। তিনি জীবনভর ছুটে বেড়িয়েছেন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এক আল্লাহর হুকুমের ছায়াতলে সমবেত করতে। যিনি ছিলেন ঐক্যের প্রতীক সেই ইব্রাহীম (আ.) এর অনুসারীরা কয়েক শতাব্দী যেতে না যেতেই হাজারো গোত্রে উপগোত্রে ভাগ হয়ে গেল। তারা বহু অপসংস্কৃতি ধর্মের নামে চালু করে দিল আর আল্লাহর সান্নিধ্যলাভের উদ্দেশে সেই অপসংস্কৃতিগুলোর চর্চা হতে লাগল। উপসনাপদ্ধতি বিকৃত হয়ে গেল। তিনি তাঁর জাতির চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণস্বরূপ সালাহ (নামাজ) শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই সালাতকে হাততালি আর শিস বাজানোয় পর্যবসিত করল।(২) তিনি বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্বের প্রবর্তন করেন। কিন্তু সেই হজ্বের নামে তাঁরই বংশধরেরা শুরু করল ধর্মব্যবসা। তারা উলঙ্গ হয়ে কাবা তাওয়াফের প্রবর্তন করল। ইব্রাহীম (আ.) কি জাতিকে এহেন অসভ্যতা শিক্ষা দিয়েছিলেন? অসম্ভব। তিনি নমরুদের মন্দিরে রক্ষিত মূর্তি ভেঙে প্রমাণ করেছিলেন যে, এই কাঠ পাথরের মূর্তির সামনে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব আল্লাহর রূহধারী মানুষ প্রণত হতে পারে না, অথচ তাঁর বংশধর ও উম্মাহ দাবিদারেরা কাবা প্রাঙ্গণে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করে সেগুলোর পূজা আরাধনা

---

১. কোর'আন: সুরা হজ্ব ৭৮

২. কোর'আন: সুরা আনফাল ৩৫

প্রচলন করেছিল। এই ৩৬০ টি মূর্তির মধ্যে ইব্রাহীম (আ.) এর মূর্তিও ছিল। একেক গোত্র একেক দেবদেবীকে তাদের গোত্রীয় উপাস্য বলে মানতো। আর এদের সবার কাছ থেকেই কাবার পুরোহিত মোতোয়াল্লি হিসাবে পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিত কোরায়েশ বংশীয়রা। এই ধর্মব্যবসাই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। কাবা প্রাঙ্গণে চলতো জুয়া আর লটারির মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণের খেলা। পুরোহিতরা যা বলত তাই দীনে হানিফ অর্থাৎ ইব্রাহীমের (আ.) ধর্মমত হিসাবে মানুষ স্বীকার ও বিশ্বাস করে নিত। অল্প কিছু মানুষ কেবল বুঝত এগুলো ইব্রাহীমের (আ.) দীনের প্রথা নয়, কিন্তু সমাজকে ইব্রাহীমের (আ.) সঠিক দীনের উপর ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় বা পথ তাদের জানা ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর অন্ধত্ব আর ধর্মব্যবসায়ীদের প্রভাবের সামনে তারা ছিল নিরুপায়। এভাবে তাদের কাছে ধর্ম একটি বিরাট লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।

কিন্তু আল্লাহর শেষ রসুল এসে যখন তাদের এই ধর্মের নামে চালু করে দেওয়া অধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করলেন, তখন যেন তা ঐ সমাজের কায়েমী স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত করল। তিনি একটা কথাই বলেছিলেন, তোমাদের কারো কর্তৃত্ব আর চলবে না, শুধু আল্লাহর হুকুম চলবে। কলেমা, তওহীদের এই মর্মবাণী বুঝতে পেরে গোত্রপতি ও ধর্মব্যবসায়ীদের মাথা খারাপ হয়ে গেল। তারা বহুবিধ অপপ্রচার, প্রোপাগান্ডা চালিয়ে রসুলের বিরুদ্ধে জনগণকে উস্কে দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজ হয় নি, যদিও রসুলকেও ইব্রাহীমের (আ.) মতোই বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। রসুলাল্লাহ আরবের গোত্রপ্রথা ভেঙে এক আল্লাহর তওহীদের ভিত্তিতে আবার জাতিগঠন করতে শুরু করলেন। তিনি কাবাকেন্দ্রিক ধর্মব্যবসাকে দীনে হানিফ মোতাবেক অবৈধ বলে ঘোষণা করলেন। তারাই সম্মিলিতভাবে তাঁকে ও তাঁর সাহাবীদেরকে নির্মম নির্যাতন করে সত্যকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদূরিত করে দিতে সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করল। এভাবে আরবের ঐ সময়ের মানুষগুলো স্পষ্টত দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল আল্লাহর তওহীদ গ্রহণ করল। তারা হলো মো'মেন। অপর দল তওহীদ প্রত্যাখ্যান করে পূর্বের জাহেলিয়াতকেই ধারণ করে হলো কাফের। **যারা মো'মেন হলেন তারা প্রকৃত ইসলামের জ্ঞান লাভ করলেন এবং প্রকৃত ইসলামকে মানবজীবনে কার্যকর করার জন্য নিজেদের জীবন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি করলেন, আল্লাহর দৃষ্টিতে তারাই হলেন সত্যনিষ্ঠ আলেম বা হক্কানি আলেম**। কিন্তু সেই জাহেলি সমাজের চোখে জ্ঞানী বলে পরিচিত ব্যক্তিরা যারা তওহীদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং তাদের বিকৃত দীনকে আঁকড়ে ধরে রেখে তা দিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করে চলছিল তাদেরকে আমরা বলতে পারি ধর্মব্যবসায়ী আলেম। আবু জাহেল হলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ যার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এ কথা আমাদের নয়, স্বয়ং আল্লাহর কথা। তিনি বলেন, আল্লাহ সাক্ষ্য দেন এবং মালায়েকগণ ও জ্ঞানী (আলেম) ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন হুকুমদাতা (ইলাহ) নেই।(১) আল্লাহর এই কথা থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যারা আল্লাহর তওহীদের সাক্ষ্য দেয় তারা আলেম। কিন্তু যারা তওহীদের সাক্ষ্য দেবে না, তারা যত আরবি ভাষাই জানুক, ইসলামের এ মাথা থেকে ওই মাথা পর্যন্ত জানুক তারা আল্লাহর কথা মোতাবেক আলেম নয়। এর বাস্তব উদাহরণ পাশ্চাত্যের সেই খ্রিষ্টান প্রাচ্যবিদ বা ওরিয়েন্টালিস্টগণ যারা ইসলামের উপরে হাজার হাজার বই লিখেছেন, কোর'আন ও হাদিসের অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন, আরবি ও ফারসি ভাষায় লিখিত প্রাচীন কেতাবগুলোকে তারাই প্রথমে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। সেই ইংরেজি থেকে তাদের অধীন দাসজাতিগুলোকে তারা যার যার মাতৃভাষায় তাদের মনমত 'ইসলাম' শিক্ষা দিয়েছে। এর জন্য তারা ভারতবর্ষে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে তার সর্বোচ্চ পদ অর্থাৎ প্রিন্সিপাল পদটি অধিকার করেছিল প্রায় আশি বছর। আরবি ভাষা জানা, ইসলামের ইতিহাস, মাসলা-মাসায়েল জানাই যদি আলেমের সংজ্ঞা হয় তাহলে তাদের চেয়ে বড় আলেম মুসলমানদের মধ্যে কয়জন আছে সন্দেহ। কিন্তু তাদেরকে তো আলেম বলে কেউই স্বীকৃতি দেবে না, স্বভাবতই, কারণ তারা আল্লাহ ও রসুলের প্রতি ঈমান আনে নি। তাদের এলেম হাসিলের উদ্দেশ্য ছিল অন্য।

যাহোক, যে কথা বলছিলাম, রসুলাল্লাহর আহ্বানে সমাজের যে নিরক্ষর, সাধারণ শ্রেণির মানুষগুলো যাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ক্রীতদাস, কুলি-মজুর, চাষি, বেদুইন, মেষ আর উটের রাখাল, তারা যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং স্বয়ং আল্লাহর রসুলের কাছ থেকে ইসলামের আকিদা শিক্ষা করলেন, তারা হয়ে দাঁড়ালেন একেকজন নক্ষত্রসদৃশ অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব,(২) তারাই হলেন সত্যিকারের আলেম। ইসলাম সম্পর্কে তাদের থেকে কি কারও পক্ষে বেশি জানা সম্ভব? নিশ্চয় নয়। তাদের কাছ থেকেই পরবর্তীকালের যুগের মানুষ ইসলাম শিক্ষা করেছেন। প্রায় নিরক্ষর সেই সাহাবীদের পবিত্র জীবনী পড়েই আজকে বহু মানুষ আল্লামা, মুফতি, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, শায়েখ, বুজুর্গানে দীন হচ্ছেন, নামের আগে রেলগাড়ির মতো দীর্ঘ টাইটেল ব্যবহার করছেন কিন্তু সেই সাহাবীরা কেউই নামের আগে আলেম, আল্লামা, মাওলানা, মুফতি জাতীয় খেতাব ব্যবহার করেন নি। যে ব্যক্তি নিজেই নিজেকে 'আলেম বা জ্ঞানী' বলে পরিচয় দেয় তার চেয়ে মূর্খ, অজ্ঞ, নির্বোধ বোধহয় আর কেউ হতে পারে না।

ব্রিটিশ খ্রিষ্টানরা মাদ্রাসা বসিয়ে আমাদেরকে ১৪৬ বছর 'দীন' শিক্ষা দিয়েছে, আমরা শিখেছি। মনে করেছি, ব্রিটিশরা কত ভালো, তারা ইসলামের কত খেদমত

---

১. কোর'আন: সুরা ইমরান ১৮

২. হাদিস: ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বায়হাকী

করছে। তাদের তৈরি করা শিক্ষাব্যবস্থার ফসল যে ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী, আমরা শত শত বছর ধরে তাদের থেকে দীন শিক্ষা করছি। অথচ আল্লাহর রসুল বলেছেন, "তোমরা কীরূপ লোক থেকে তোমাদের দীন গ্রহণ করছো তা ভালোভাবে লক্ষ্য কোরো।"(১) **আলেম দুই প্রকার, সত্যনিষ্ঠ আলেম ও স্বার্থান্বেষী আলেম। তাই কারো কাছ থেকে দীনের জ্ঞান গ্রহণ করার আগে আমাদেরকে দুটো জিনিস বিবেচনা করতে হবে, প্রথমত সে এর দ্বারা কোনো বৈষয়িক স্বার্থ গ্রহণ করে কিনা। দ্বিতীয়ত, সে সত্যের উপর দৃঢ়পদ কিনা। স্বার্থ মিশ্রিত হলে যে কোনো জ্ঞানই বিষাক্ত হয়ে যায়, ঐ জ্ঞান আর মানুষের কল্যাণে আসে না, উল্টো মানুষের ক্ষতিসাধন করে।** এ বিষয়ে আমীরুল মু'মিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ও কা'ব ইবনুল আহবার (রা.) এর কথোপকথনটি খুবই শিক্ষণীয়।

ওমর (রা.) একদিন কা'ব (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, "আলেম বা ইলমের অধিকারী কে?" তিনি উত্তরে বললেন, "যারা ইলম অনুযায়ী আমল করে।" ওমর (রা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "কোন জিনিস আলেমদের অন্তর থেকে ইলমকে দূর করে দেয়?" তিনি উত্তরে বললেন, "লোভ অর্থাৎ দুনিয়ার সম্পদ, সম্মান ইত্যাদি হাসিলের আকাঙ্ক্ষা।"(২)

সুতরাং নিজেদের অর্জিত মাসলা-মাসায়েলের জ্ঞানকে পুঁজি করে যারা ধর্মব্যবসায় লিপ্ত হন তারা আর আলেম থাকেন না, দুনিয়ার সম্পদ, সম্মান ইত্যাদি হাসিলের আকাঙ্ক্ষা তাদের অন্তর থেকে জ্ঞানকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে, সেই জ্ঞান এখন কেবল পণ্য যা দিয়ে সে নিজেই উপকৃত হচ্ছে, যদিও সত্যিকার অর্থে সেটা উপকার নয় বরং এর দ্বারা সে নিজের পরকালকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তারা মানুষকে অন্ধভাবে ধর্মের বিধান মানতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে, তারা মানুষকে নির্বোধ বানিয়ে রাখতে চায়। এভাবে ধর্মবিশ্বাস যখন অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হয় তখন খোদ ধর্মই বিষে পরিণত হয়। যে-ই অন্ধের মতো সে ধর্ম পালন করবে সে-ই ধর্মের নামে গোড়ামিপূর্ণ আজগুবি ধ্যানধারণা আর চিন্তাহীন, বুদ্ধিহীন আচরণের চর্চাকারী হয়ে যাবে। **খাদ্য থেকে পুষ্টির উপাদান পরিপাকের মাধ্যমে নিংড়িয়ে নিলে সেই খাদ্য বর্জ্যে পরিণত হয়, তেমনি ধর্ম থেকে ধর্মব্যবসার মাধ্যমে এর প্রাণকে নিংড়িয়ে বের করে নেওয়া হয়েছে, ফলে বর্তমানে প্রতিটি ধর্মই বিষে পরিণত হয়েছে। খাদ্য হিসাবে মানুষকে সেই বিষাক্ত বর্জ্যই গেলানো হচ্ছে।** এ কারণেই ধর্ম থেকে

---

১. হাদিসঃ মুসলিম, তিরমিযী, মেশকাত, শরহে নববী, মায়ারেফুস সুনান, মেরকাত, লুমাত, আশয়াতুল লুমাত, শরহুত্ ত্বীবী, তা'লীকুছ ছবীহ, মোজাহেরে হক্ব।

২. হাদিসঃ দায়েমী, মেশকাত, মেরকাত, লুময়াত, আশায়াতুল লুময়াত, শরহুত্ত্বীবী, তা'লীকুছ ছবীহ, মোজাহেরে হক্ব, মিরআতুল মানাজীহ্

জন্ম নিচ্ছে জঙ্গিবাদ, ফতোয়াবাজি, সাম্প্রদায়িকতা, হুজুগে উন্মাদনা, ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতি ইত্যাদি বহুবিধ ক্ষতিকারক রোগজীবাণু, প্যারাসাইট।

যারা সত্যিকার আলেম তারা কখনই নিজেদেরকে 'আলেম' বা জ্ঞানী বলে মনে করবেন না। প্রকৃত আলেম হচ্ছেন মহান আল্লাহ। তাঁর একটি নামই হচ্ছে 'আলেম'। আল্লাহর সৃষ্টি এবং আল্লাহর দীন সম্পর্কে যারা জ্ঞান অর্জন করবেন তারাও এক প্রকার আলেম বা জ্ঞানী। যদিও **বর্তমানে কেবল ধর্মীয় মাসলা-মাসায়েলের জ্ঞানের অধিকারীদেরকেই আলেম বলা হয়, যে ধারণা নিতান্তই মূঢ়তাসুলভ।** আসুন দেখা যাক আল্লাহ স্বয়ং 'জ্ঞান' বলতে কি বুঝে থাকেন।

মুসা (আ.) একবার আল্লাহকে সাতটি প্রশ্ন করেছিলেন। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল- আল্লাহ! আপনার বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানী কে? আল্লাহ বললেন- যে জ্ঞানার্জনে কখনো তৃপ্ত হয় না এবং মানুষের অর্জিত জ্ঞানকেও যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞানের মধ্যে জমা করতে থাকে।(১)

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে আল্লাহ জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমটি তাঁর দেয়া জ্ঞান যা তিনি সৃষ্টির প্রথম থেকে তাঁর নবী-রসুলদের মাধ্যমে তাঁর কেতাবসমূহে মানবজাতিকে অর্পণ করে আসছেন, যার শেষ কেতাব বা বই হচ্ছে আল-কোর'আন। এটা হচ্ছে অর্পিত জ্ঞান। আর মানুষ পড়াশোনা, চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে জ্ঞান অর্জন করে তা হলো অর্জিত জ্ঞান। মুসার (আ.) প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ নির্দিষ্ট করে 'মানুষের অর্জিত জ্ঞান' বললেন, শব্দ ব্যবহার করলেন 'আন্-নাসু', মানুষ। অর্থাৎ **যে আল্লাহর অর্পিত জ্ঞান, অর্থাৎ দীন সম্বন্ধে জ্ঞান, এবং মানুষের অর্জিত জ্ঞান– এই উভয় প্রকার জ্ঞান অর্জন করতে থাকে এবং কখনোই তৃপ্ত হয় না অর্থাৎ মনে করে না যে তার জ্ঞানার্জন সম্পূর্ণ হয়েছে, আর প্রয়োজন নেই, সেই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানী, আলেম।** বর্তমানে যারা নিজেদের আলেম, অর্থাৎ জ্ঞানী মনে করেন, আল্লাহর দেয়া জ্ঞানীর সংজ্ঞায় তারা আলেম নন, কারণ শুধু দীনের জ্ঞানের বাইরে মানুষের অর্জিত জ্ঞানের সম্বন্ধে তাদের সামান্যতম জ্ঞানও নেই এবং সেই জ্ঞান সম্বন্ধে পিপাসাও নেই। জ্ঞান একটি প্রাকৃতিক সম্পদের মতো মানুষের জন্য আল্লাহর বিশেষ দান যা তিনি মানবজাতির কল্যাণার্থে দান করেন। এর কোনো ব্যক্তিমালিকানা থাকে না, যে কোনো জ্ঞানই গোটা মানবজাতির সম্পদ। তাই যারা জ্ঞানকে কুক্ষিগত করে রাখে তারা মানবতার শত্রু। যার জ্ঞান মানবতার কল্যাণে কাজে লাগে না, সেই জ্ঞান আখেরাতে তার কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহর রসুল বলেছেন, "পূর্ববর্তী কেতাবে লিপিবদ্ধ আছে, আল্লাহ বলেছেন, **"হে আদমের সন্তান! পারিতোষিক গ্রহণ**

---

১. হাদিসে কুদসি– আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বায়হাকী ও ইবনে আসাকির; আল্লামা মুহাম্মদ মাদানী (র.) এর 'হাদিসে কুদসী' গ্রন্থের ৩৪৪ নং হাদিস: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

ব্যতীত শিক্ষা দান কর, যেরূপভাবে তোমাদের পিতা পারিতোষিক দেওয়া ছাড়া শিক্ষালাভ করেছে।"(১)

যাই হোক, যারা সকল জ্ঞানের স্রষ্টা, উৎস আল্লাহ থেকে জ্ঞান বা এলেম অর্জন করবেন তাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকবে। এখানে আমরা প্রকৃত আলেম বলতে বুঝবো আল্লাহর রসুলের আসহাবগণকে যাদেরকে স্বয়ং রসুল নিজে ইসলাম শিখিয়ে গেছেন, ইসলামের জ্ঞান তাদের চেয়ে বেশি আর কারও থাকা সম্ভব নয়। রসুলের আসহাবগণের পরবর্তীতে যারা আলেম হতে চান তাদের চরিত্র ও কাজ আসহাবদের মতই হতে হবে। তা না হলে যত বড় টাইটেলধারীই হোন না কেন, যত বড় আলখেল্লাধারীই হোন না কেন তারা প্রকৃত আলেম নন। আল্লাহর ভাষায় তারা হলেন পুস্তক বহনকারী গাধা।(২)

রসুলাল্লাহর প্রসিদ্ধ সাহাবী ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, "যে ব্যক্তি অধিক হাদিস জানে সে ব্যক্তি আলেম নয়। বরং যার মধ্যে তাকওয়া অধিক সে ব্যক্তিই আলেম।"(৩)

এই তাকওয়ার বাস্তব রূপ হচ্ছে রসুলাল্লাহ ও তাঁর আসহাবদের পবিত্র জীবনী। আমাদেরকে তাই ধর্মব্যবসায়ী আলেম ও সত্যনিষ্ঠ আলেমদের মধ্যে তফাৎ করা জানতে হবে, নয়তো পথভ্রষ্ট আলেমের অনুসরণ দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই হারাতে হবে।

১) প্রকৃত যারা আলেম তারা কখনও অহঙ্কারী হবেন না, কারণ অহঙ্কার কেবলমাত্র আল্লাহরই সাজে। প্রকৃত আলেমরা তাদের সঞ্চিত জ্ঞানকে খুবই সামান্য মনে করবেন এবং সর্বদা অতৃপ্ত থাকবেন। তারা নিজেদেরকে কখনওই আলেম বলে মনে করবেন না, দাবি করা, প্রচার করা বা আলেম খেতাব ধারণ করা তো দূরের কথা।

২) তারা আল্লাহর দীন বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করবেন না। এই জ্ঞান অন্যকে দেওয়া তারা নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব বলে মনে করবেন। **আলী (রা.) কে রসুলাল্লাহ 'জ্ঞান-নগরীর দ্বার' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি কি আজকের আলেমদের মতো তাঁর জ্ঞান বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন?** জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি কুলির কাজ করতেন এবং যাঁতার চাক্কি পিষে যবের আটা প্রস্তুত করতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী জান্নাতের রানী মা ফাতেমার (রা.) পবিত্র হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল। এই জ্ঞানের দুয়ার আলীকেই (রা.) আমরা দেখি সিংহের বিক্রমে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

---

১. হাদিসে কুদসি- ইবনু লাল এই হাদিস ইবনে মাসউদ (রা.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

২. আল কোর'আন:সুরা জুম'আ ৫

৩. বর্ণনা ইবনে কাসীর।

করতে। তার অনন্য সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য রসুলাল্লাহ তাঁকে আরেকটি উপাধি দিয়েছিলেন- সেটা হলো আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ। সুতরাং যিনি দীনের যত বড় আলেম হবেন তিনি তত বড় যোদ্ধা হবেন অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামী হবেন।

৩) দীনের জ্ঞান যিনি যত বেশি অর্জন করবেন, তিনি তত বড় দানশীল হবেন। যেমন আম্মা খাদিজা (রা.), আবু বকর (রা.)। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁরা প্রত্যেকেই ঐ সমাজের প্রতিষ্ঠিত ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। **আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে করতে তারা এমন দরিদ্র হয়ে পড়েছিলেন যে, আবু বকরের (রা.) পরিবারের তিনবেলা ঠিকমত খাদ্যও জুটতো না।** আর আম্মা খাদিজার (রা.) সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন যে, শি'আবে আবু তালেবে তিন বছর নির্মম অনাহারের ফলে তিনি মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত হন এবং এটাই তাঁর মৃত্যুর কারণ।

৪) প্রকৃত আলেম বা জ্ঞানীরা হবেন লোহার মতো ঐক্যবদ্ধ। কোনো দুনিয়ার সম্পদের লোভ লালসা (তুচ্ছ মূল্য - সামানান কালীলা) তাদের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরাতে পারবে না। কারণ তারা জানেন ঐক্য নষ্ট করা কুফর। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাবেন না, গীবত করবেন না। কারও কোনো ভুল থাকলে তারা সেটা তাকে ব্যক্তিগতভাবে বলবেন। **পক্ষান্তরে আজকের সমাজে যারা আলেম বলে পরিচিত তাদের বিষয়ে একটি কথা বলা হয় যে, দু'জন আলেম এক জায়গায় বসতে পারেন না।** জাতির কোনো একটি সংকটেও তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন না। তারা নিজ জাতিরই ভিন্ন মতাবলম্বী আলেমদেরকে প্রতিপক্ষ হিসাবে সাব্যস্ত করে, তাদের বিরুদ্ধে বাহাস করে, তাদেরকে 'দাঁতভাঙ্গা জবাব' দিয়ে কুপোকাত করতে ব্যস্ত। দুনিয়ার সম্পদের দেনা-পাওনা, রাজনৈতিক স্বার্থ ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় তাদের মধ্যে অনতিক্রম্য দেওয়াল তৈরি করে রেখেছেন। তাদেরকে কেন্দ্র করে সাধারণ জনগণও হাজার হাজার তাবুতে বিভক্ত।

৫) প্রকৃত আলেমরা হবেন সুশৃঙ্খল। আল্লাহর রসুলের হুকুমের শিকলে তারা নিজেদেরকে বন্দী রাখবেন। তাদের জাতি হবে একটি, তাদের এমাম হবেন একজন, দীন (জীবনব্যবস্থা) হবে একটি। তাদের সকলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও হবে অভিন্ন; সেটা হচ্ছে- সংগ্রামের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করা। তারা কোনোভাবেই জাতির এমামের বা নিজ আমিরের হুকুম অমান্য করবে না, হুকুম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা সেটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বেন যেমনটা রসুলাল্লাহর সাহাবিরা করতেন। তাদের স্ত্রী, পুত্র, সহায় সম্পদ বাড়িঘর, ব্যবসা-বাণিজ্য, খেত-খামার ইত্যাদি বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা

করার জন্য দুনিয়ার বুকে বেড়িয়ে পড়বেন, পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখবেন না। কিভাবে জীবনটা আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করা যায়, শহীদ হওয়া যায় এটাই হবে তাদের জীবনের একমাত্র বাসনা (Utter Desire for death). যেমন রসুলাল্লাহর কাছ থেকে ইসলামের এলেম হাসিল করেছিলেন খালেদ (রা.)। যিনি জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে আল্লাহর রাস্তায় এমনভাবে বহির্গত হয়েছিলেন যেন এক প্রচণ্ড সাইমুম। ইসলামের শত্রুদের উপর আঘাত হানার জন্য তিনি যে তলোয়ার কোষমুক্ত করেছিলেন তা কখনও কোষবদ্ধ করেন নি। লাখ লাখ সুশিক্ষিত সৈন্যের রোমান পারস্য বাহিনী কখনও তাঁকে এতটুকুও বিচলিত করতে পারে নি। **আজকের ইসলামের যিনি যত বড় দরবেশ তিনি তত বড় ভীরু, কাপুরুষ। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া তো দূরের কথা সামান্য একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতেও তারা সাহস পান না, পাছে মসজিদ মাদ্রাসার চাকরিটা চলে যায়।** যে রসুল সারাটি নব্যুয়তি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে সংগ্রাম করে গেছে, তেমন ঝুঁকি থেকে সারাটা জিন্দেগি নিরাপদে গা বাঁচিয়ে হুজরা খানকায় বসে অন্যের সম্পত্তি ভোগ করে চলেছেন তারা কী করে নিজেদেরকে নায়েবে নবী, ওরাসাতুল আম্বিয়া বলে দাবি করেন ভাবতে অবাক লাগে।

৬) প্রকৃত আলেম বা জ্ঞানীরা যাবতীয় অন্যায় থেকে, গায়রুল্লাহর বিধান মেনে শেরক ও কুফর করা থেকে এমনভাবে হেজরত করবেন, এমন ঘৃণাভরে সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করবেন যে, প্রয়োজনে তার জীবন যাবে, না খেয়ে থাকবে, অবর্ণনীয় দারিদ্র্যে পতিত হবে তবুও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করবে না।

যারা মহানবীর (সা.) কাছ থেকে ইসলামের জ্ঞান লাভ করে ইসলামের 'আলেম' হয়েছিলেন তাঁদের চরিত্র এইসব বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ ও মহীয়ান ছিল। অথচ দুঃখের বিষয় হলো আজ আলেম বলতে আমাদের সামনে সেই আসহাবদের জীবন ও চরিত্র ভেসে ওঠে না, ভেসে ওঠে এমন একটি শ্রেণির অবয়ব যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা না করে ইসলামকে বিক্রি করেই জীবন কাটিয়ে দিবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আমরা চাই এ জাতির সত্যনিষ্ঠ আলেমদের কালঘুম ভাঙুক। যাদের উপর অন্যকে জাগানোর দায়িত্ব তারাই যদি ঘুমিয়ে থাকে তাহলে এর চেয়ে দুঃখজনক কী হতে পারে! আল্লাহর রসুল বলেছেন, 'আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ। নবীগণ দিনার বা দিরহামের উত্তরাধিকারী বানান না। তাঁরা কেবল ইলমের ওয়ারিশ বানান। অতএব যে তা গ্রহণ করে সে পূর্ণ অংশই পায়'।(১) তাই

---

১. হাদিসঃ তিরমিযীঃ ২৬৮২

প্রকৃত আলেমগণ তারা দিনার-দিরহামের বিনিময়ে দীন বিক্রি করতে পারেন না। তারা হয়ে থাকেন আল্লাহর রসুলের আসহাবদের মতো দুর্জয়, নির্লোভ, ইসলামের জন্য সর্বত্যাগী বিপ্লবী। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন।"(১) ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, 'সাধারণ মো'মেনের চেয়ে আলেমের মর্যাদা সাতশ' গুণ বেশি।' সেই সত্যনিষ্ঠ আলেমদের সম্মান করা আমাদের কর্তব্য। তাদের মধ্যে যারা নানাবিধ কারণে এখনও ধর্মব্যবসার সঙ্গে জড়িত আছেন কিন্তু তাদের হৃদয় আল্লাহর প্রতি অনুগত, যারা মুসলিম উম্মাহর করুণ দুর্দশা দেখে ব্যথিত, তাদের প্রতি কথা হচ্ছে:

আজ এই হতভাগ্য জাতিসহ সমস্ত মানবজাতি শেরক ও কুফরে ডুবে আছে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বাদ দিয়ে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী 'সভ্যতা' অর্থাৎ দাজ্জালের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছে। অথচ আল্লাহ এই উম্মাহকে শ্রেষ্ঠতম উম্মাহ বলেছেন।(২) আমাদের আলেম সাহেবরা সামান্য কিছু অর্থের প্রত্যাশায় অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে ছোট হয়ে থাকুক এটা আমরা চাই না। এই হতভাগ্য জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ছিল তাদের। **দুর্নীতিবাজ সমাজপতি আর রাজনৈতিক ধান্ধাবাজেরা মনে করে অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে দিয়ে পছন্দমত ফতোয়া দেওয়ানো যায়।** বস্তুত পরমুখাপেক্ষী যারা হয় তাদের আর মেরুদণ্ড বলতে কিছু থাকে না; সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা বেশিদূর এগুতে পারে না; বড় কোনো কোরবানি করার আত্মিক শক্তি তারা হারিয়ে ফেলে। তাই আমাদের কাম্য হচ্ছে, সত্যনিষ্ঠ আলেম সাহেবরা এ জাতির কল্যাণে, মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণার্থে ধর্মব্যবসা পরিত্যাগ করে ক্ষুদ্রস্বার্থ ভুলে, মতবিরোধ ত্যাগ করে তওহীদের উপরে ঐক্যবদ্ধ হোন, সত্য প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করুন। **এ কাজ করতে গিয়ে তাদেরকে হয়তো কিছু অর্থকষ্ট সহ্য করতে হতে পারে, তবু ভয় না করে, আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কাল রেখে হারাম উপার্জন বন্ধ করা তাদের অবশ্য কর্তব্য। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে উত্তম রেযেকের বন্দোবস্ত করে দেবেন এবং তাদের দুনিয়া ও আখেরাতকে সুন্দর করে দেবেন। তারা এক গৌরবময় জীবন আল্লাহর পক্ষ থেকে পাবেন।**

সারা দুনিয়ায় মুসলিম জাতি আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে আছে। বিভিন্ন কুসংস্কারে তারা নিমজ্জিত। অশিক্ষা-কুশিক্ষা তাদের অষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। এ জাতিটি সংখ্যায় ১৫০ কোটি হওয়া সত্ত্বেও, বিশ্বের বিরাট ধন সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্য জাতিগুলোর দ্বারা লাঞ্ছিত, অপমানিত,

---

১. আল কোর'আন: সুরা মুজাদালা ১১।

২. আল কোর'আন: সুরা ইমরান ১১০।

নির্যাতিত হচ্ছে। তারা জাতীয় জীবনে আল্লাহ এবং রসুলের হুকুম বাদ দিয়ে পশ্চিমা সভ্যতা তথা দাজ্জালের হুকুম মেনে নিয়ে জাতিগতভাবে শেরক ও কুফরে নিমজ্জিত হয়ে আছে। এতে করে একদিকে তারা যেমন ইসলাম থেকে বহির্গত হয়ে গেছে, অপরদিকে অন্য সকল জাতির ঘৃণার পাত্রেও পরিণত হয়েছে। তারা যে পরকালের জাহান্নামের দিকে ধাবিত হচ্ছে তাও অতি পরিষ্কার। জাতির নেতারা সাধারণ শ্রেণির মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে তাদেরকে দাবিয়ে রেখে আল্লাহ রসুলের হুকুম পরিপন্থী কাজ করে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে জাতির মধ্যে যারা সত্যনিষ্ঠ আলেম রয়েছেন তাদের জাতিরক্ষায় এগিয়ে আসা খুবই দরকার।

ধর্মব্যবসায়ীদের ফেতনা: হুজুগনির্ভর ধর্মোন্মাদনা

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তি, বুদ্ধি, প্রযুক্তির এই যুগে এসে যখন তথ্য যাচাই বাছাইয়ের অবাধ সুযোগ মানুষের হাতের মুঠোয়, এমন একটি পর্যায়ে মানবজাতি পৌঁছানোর পর মুসলিম দাবিদার জনগোষ্ঠীকে কতগুলো বিষয় অনুধাবন করতে হবে। যুক্তিশীল মানুষের কাছে ইসলামের আবেদন হারানোর অন্যতম কারণ এখনও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে গুজব শুনে হুজুগে মেতে ওঠার ব্যাপক প্রবণতা। এমন কি অধিকাংশ মুসলিম সেই সংবাদটির সত্য-মিথ্যা যাচাই করার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করে না। অথচ এটা সরল সত্য যে গুজব বা হুজুগ কখনওই কোনো শুভফল বয়ে আনতে পারে না। বরং এ দুটোকে ব্যবহার করে সর্বযুগে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিল করে কিছু মহল। ভাবতে অবাক লাগে মুসলমানেরা কী করে হুজুগ আর গুজবে অভ্যস্ত হয়ে উঠল! একটা গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয় আর মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ হৈ হৈ রৈ রৈ করে ধ্বংসাত্মক ও সহিংস কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। এতে বদনাম হয় ধর্মের, অবমাননা হয় আল্লাহর, রসুলের। রসুলাল্লাহ এক মহান রেনেসাঁ সংঘটন করে শত শত বছর দীর্ঘস্থায়ী একটি স্বর্ণোজ্জ্বল সভ্যতা নির্মাণ করেছিলেন, সেটা হুজুগের দ্বারা, গুজবের দ্বারা করা সম্ভব নয়। তিনি এমন লঘুস্বভাবের মানুষ ছিলেন না যে ক্ষণস্থায়ী একটি উত্তেজনা সৃষ্টি করে কার্যসিদ্ধি করে নিবেন। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের আরবজাতি অযৌক্তিক বিষয় নিয়ে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গোত্রীয় হানাহানি, রক্তপাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ চালিয়ে গেছে। এ রকম অর্থহীন কাজকে বন্ধ করে মানুষকে সভ্য বানানোর জন্যই ইসলাম এসেছিল। কিন্তু রসুলাল্লাহর বিদায়ের ১৪০০ বছর পর আমরা দেখি ফেসবুকে প্রচারিত একটি গুজবকে বা বানোয়াট ছবিকে কেন্দ্র করে আমাদের আলেম দাবিদার গোষ্ঠীটি ধর্মবিশ্বাসী মানুষদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের বিরুদ্ধে বিরাট দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিচ্ছেন যেখানে নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটছে, উপাসনালয় ভাঙচুর হচ্ছে, মানুষের বাড়িঘর পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেওয়া হচ্ছে। ইসলামের নাম করে জাহেলিয়াতের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে। কী দুর্ভাগ্য আমাদের!

শোনা কথায় কান দিয়ে আকস্মিক আবেগের বশে কোনো কাজ করা আল্লাহর সরাসরি নিষেধ, ইসলাম এর ন্যূনতম সম্ভাবনাকেও প্রশ্রয় দেয় না বরং নির্মূল করে দেয়। উড়ো কথা প্রচার করা বা কারো উপর অপবাদ আরোপ করা ইসলামের দৃষ্টিতে দণ্ডনীয় অপরাধ। কারো ব্যাপারে কোনো কথা শুনে সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে প্রচার করা সমাজে বিশৃঙ্খলা বিস্তারের অন্যতম কারণ।

১. আল্লাহ বলেছেন- মো'মেনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও।(১)

২. আল্লাহ এটাও বলেছেন যে, হে মো'মেনগণ! তোমরা অধিকাংশ বিষয়ে অনুমান করা থেকে বিরত থাক, কারণ কোনো কোনো অনুমান পাপ।(২)

৩. অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক, যারা অজ্ঞতা ও উদাসীনতার মধ্যে রয়েছে।(৩)

৪. আল্লাহর রসুল বলেছেন, তোমরা ধারণা-অনুমান থেকে বেঁচে থাক কারণ ধারণা-অনুমান সর্বাপেক্ষা মিথ্যা কথা।(৪)

৫. আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন, কোনো মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যাই শোনে তাই যাচাই না করেই অন্যের কাছে বর্ণনা করে দেয়।"(৫)

রসুলাল্লাহর জীবনে এমন একটি ঘটনাও নেই যেখানে সাহাবীরা গুজবে মেতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষতিসাধন করেছেন। এমন কি যুদ্ধের সময়ও তারা অত্যন্ত সতর্ক থেকেছেন যেন কোনো নির্দোষ বেসামরিক ব্যক্তি, নারী, শিশু, বৃদ্ধের উপর আঘাত না লাগে। কোনো ক্ষেত্রে যেমন মক্কা বিজয়ের সময় কিছু লোককে খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) ভুল করে হত্যা করে ফেলেন। খবর জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর রসুল (সা.) আল্লাহর দরবারে নিজেকে এই ঘটনার সাথে অসম্পৃক্ত বলে ঘোষণা করেন এবং খালেদের এই ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চান। তারপর নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন এবং তাদের কাছেও ক্ষমা চান। বিজয়ী সেনাপতি কখনো ক্ষমা চায় এমন ইতিহাস মানবজাতির জীবনে আর আছে? সেদিন মক্কাবাসী ছিল অসহায়। রসুলাল্লাহ যদি প্রতিশোধ চাইতেন কী অবস্থা হতো মক্কাবাসীর? একদম মাটির সাথে পিষে ফেলতে পারতেন, সবার বাড়িঘর ভস্মীভূত করে দিতে পারতেন। কিন্তু রসুল তা করেন নি। তিনি দাঙ্গাবাজ

---

১. আল কোর'আন: সুরা হুজরাত-৬।

২. আল কোর'আন: সুরা হুজরাত ১২।

৩. আল কোর'আন: সুরা যারিয়াত ১০।

৪. হাদিস: বোখারি ৬০৬৬, ৬৭২৪, মুসলিম: ৬৪৩০।

৫. হাদিস: মুসলিম।

ছিলেন না, তিনি ছিলেন যোদ্ধা। তিনি চিরকাল নিজের সেনাবাহিনীর চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন আর দুর্বল শত্রুকে ক্ষমা করেছেন, এটাই তাঁর জীবনে আমরা বার বার দেখতে পাই। এটাই হচ্ছে বীরত্বের নিদর্শন। বীর যুদ্ধ করে, কাপুরুষ দাঙ্গা করে।

মিথ্যার সুযোগ না নেওয়ার দৃষ্টান্তঃ

আল্লাহর রসুল (স.) যে একজন সত্যনিষ্ঠ মহামানব ছিলেন এবং তিনি তাঁর জীবনে মিথ্যার ভিত্তিতে, গুজবের ভিত্তিতে, মানুষকে ধোঁকা দিয়ে কোনো উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেন নি তার প্রমাণ হিসাবে আরেকটা ঘটনা এখানে তুলে ধরা হলো। মদিনায় তাঁর ৩ বছরের ছেলে ইব্রাহিম যেদিন ইন্তেকাল করলেন, সেদিন সূর্যগ্রহণ হলো। আরবের নিরক্ষর, অনেকটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের মনে এই ধারণা জন্মাল যে, যার ছেলে মারা যাওয়ায় সূর্যগ্রহণ হয়, তিনি তো নিশ্চয়ই আল্লাহর রসুল, না হলে তাঁর ছেলের মৃত্যুতে কেন সূর্যগ্রহণ হবে? কাজেই চলো, আমরা তাঁর হাতে বায়াত নেই, তাঁকে আল্লাহর রসুল হিসাবে মেনে নেই, তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করি।

তাদের এ মনোভাব মুখে মুখে প্রচার হতে থাকল। আল্লাহর রসুল (সা.) যখন একথা শুনতে পেলেন, তিনি নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে লোকজন ডাকলেন এবং বললেন, "আমি শুনতে পেলাম তোমরা অনেকেই বলছ, আমার ছেলে ইব্রাহিমের ইন্তেকালের জন্য নাকি সূর্যগ্রহণ হয়েছে। এ কথা ঠিক নয়। ইব্রাহিমকে আল্লাহ নিয়ে গিয়েছেন আর সূর্যগ্রহণ একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। এর সাথে ইব্রাহিমের মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই।"(১)

ঘটনাটি এমন এক সময়ের যখন মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড টানাপড়েন ও বিতর্ক চলছে যে তিনি আসলেই আল্লাহর রসুল কি রসুল নন। এমতাবস্থায় রসুলাল্লাহ কিছু না বলে যদি শুধু চুপ করে থাকতেন, কিছু নাও বলতেন, দেখা যেত অনেক লোক তাঁর উপর ঈমান এনে ইসলামে দাখিল হতো, তাঁর উম্মাহ বৃদ্ধি পেত - অর্থাৎ যে কাজের জন্য আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছেন সেই কাজে তিনি অনেকটা পথ অগ্রসর হয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এসেছিলেন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে, তাই মিথ্যার সাথে এতটুকুও আপস করলেন না। এতে তাঁর নিজের ক্ষতি হলো। কিন্তু যেহেতু এ কথা সত্য নয় গুজব, সত্যের উপর দৃঢ় অবস্থান থাকার কারণে তিনি সেটিকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দিলেন না। তিনি শক্তভাবে এর প্রতিবাদ করলেন, তিনি জনগণের ধারণাকে সঠিক করে দিলেন। নিজের স্বার্থে তাদের ঈমানকে ভুল খাতে প্রবাহিত করলেন না বা হতে দিলেন না।

এটাই ইসলাম। এটাই আল্লাহর রসুলের প্রকৃত আদর্শ। সে আদর্শ থেকে সরে গিয়ে অর্থাৎ হেকমতের দোহাই দিয়ে বা যে কোনো অজুহাতে মিথ্যার সাথে আপস

---

১. হাদিসঃ মুগীরা ইবনে শো'বা ও আবু মাসুদ (রা.) থেকে বোখারী।

করে যতই নিবেদিতপ্রাণ রাজনৈতিক দল, সংগঠন, আন্দোলন পরিচালনা করা হোক, লাখ লাখ কর্মীবাহিনী তৈরি করা হোক, সফলতা আসবে না, আখেরে মিথ্যাই বিজয়ী থাকবে।

আরবরা ছিল পৃথিবীর অন্যতম অজ্ঞ, শিক্ষাবঞ্চিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠী। একবার মদিনায় একটি প্রচণ্ড শব্দ হলো। সেটা কিসের শব্দ তা কেউ বুঝতে পারল না। মদিনার লোকেরা ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে বিভিন্ন ধরনের শঙ্কার উদয় হলো, কেউ ভাবল শত্রু আক্রমণ করেছে, কেউ বা একে আসমানি গজবের আলামত মনে করল। লোকেরা সেই আওয়াজের দিক লক্ষ্য করে অগ্রসর হতে লাগল। একটু এগিয়েই তারা দেখতে পেল যে নবী করিম (সা.) সেই দিক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসছেন। তিনি অভয় দিয়ে বললেন, "সবকিছু স্বাভাবিক আছে। তোমরা কোনো চিন্তা করো না।" আওয়াজটি রসুলাল্লাহর কানে যাওয়া মাত্রই কালবিলম্ব না করে তিনি একাই ঘোড়া ছুটিয়ে সেদিকে রওয়ানা দেন এবং নিজ জনগোষ্ঠীকে আশ্বস্ত করেন। ঘোড়ার পিঠে রেকাব বা জিন যুক্ত করার সময়টিও তিনি নষ্ট করেন নি।(১) **এভাবে তিনি তাঁর জনগণের মধ্যে কোনো প্রকার গুজবের বিস্তার ঘটার কোনো সুযোগ দিলেন না, ঘটনাটিকে রাজনৈতিক স্বার্থেও ব্যবহার করলেন না। এমন একজন মহান ব্যক্তির অনুসারী হয়ে কী করে উম্মতে মোহাম্মদী বর্তমানের ন্যায় এহেন অযৌক্তিক ও গুজবনির্ভর জনতা হয়ে গেল?** কে তাদের এমন অন্ধ আবেগে উন্মাদনাপ্রবণ করে তুললো?

এই ঘটনায় রসুলাল্লাহর সাহসিকতা ও ক্ষিপ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়, নিজেকে অজানা বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে জাতিকে নিরাপত্তা প্রদানের যে অঙ্গীকার তিনি করেছেন তাঁর প্রতি ঐকান্তিক দায়বদ্ধতার নিদর্শনও এ ঘটনায় ফুটে ওঠে। আতঙ্ক বিস্তার করে স্বার্থ আদায় করা ইসলামের বৈশিষ্ট্য নয় সেটা নবী স্বয়ং প্রমাণ দিলেন। অথচ বর্তমানে কেবল আতঙ্ক বিস্তারের জন্য জঙ্গিরা হোটেলে খেতে আসা নিরীহ সাধারণ মানুষকে রাতভর জবাই করছে, মধ্যপ্রাচ্যে অসংখ্য মানুষকে জবাই করার বীভৎস দৃশ্য ভিডিও করে তা অনলাইনে প্রচার করছে, যেন তাদের নৃশংসতা দেখে মানুষ শিউরে ওঠে। এসব ভয়াবহ বিকৃত চিন্তাভাবনাকে তারা আবার বিভিন্ন মাসলা মাসায়েল দেখিয়ে ইসলামসম্মত বলে প্রচারও করছে। তাদের এসব কাজের ফলে ইসলাম কেবল অমুসলিম নয়, মুসলিমদের কাছেও আবেদন হারাচ্ছে।

ধর্মোন্মাদনার জন্মকথা:

রসুলাল্লাহ ছিলেন মুসলিমদের অবিসংবাদিত নেতা। তিনি যখন রাষ্ট্রশক্তি অর্জন করেছেন তখন তিনি রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যায়ের ধারকদের

---

১. হাদিস: আনাস রা. থেকে বোখারী।

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, সামরিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। সামরিক পদক্ষেপ কোনো ব্যক্তিবিশেষ নিতে পারে না, এটা রাষ্ট্রের কাজ। ব্যক্তি বা সংগঠন পর্যায়ে সশস্ত্রপন্থা গ্রহণ সর্বযুগে সর্বকালে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে পরিগণিত হয়। রসুলাল্লাহর পরে যারা এ জাতির শাসক হয়েছেন তারা ধর্মীয় বিধি-বিধান কমবেশি মেনেই মুসলিম বিশ্বের নানা অংশে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। তারা যখন মানুষকে শত্রুর মোকাবেলা করণার্থে আহ্বান জানাতেন তখন জনগণ ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক নেতার আনুগত্য করত, সেই আহ্বানে সাড়া দিত। ধর্মব্যবসায়ী আলেম ওলামা শ্রেণির জন্ম হয়েছে রসুলাল্লাহর ইন্তেকালের কয়েকশ’ বছর পরে। তারাও রাষ্ট্রের শাসকদের পরামর্শক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেন, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণ থাকায় তাদের হাতে ক্ষমতাও ছিল যথেষ্ট, ধর্মনেতা হিসাবে জনগণের উপর যথেষ্ট প্রভাবও ছিল তাদের। **কিন্তু ইতিহাসের একটি বাঁকে এসে মুসলিম জনগোষ্ঠী যখন ব্রিটিশসহ ইউরোপের বিভিন্ন জাতির গোলামে পরিণত হলো তখনও এই আলেম ওলামারা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মের কর্তৃপক্ষই থেকে গেছেন আর আগে যেমন মানুষ যেভাবে তাদের ডাকে সাড়া দিত, অন্য জাতির গোলাম হয়ে যাওয়ার পরও সেই প্রবণতা রয়ে গেল।** জাতির মধ্যে এই বোধ জাগ্রত হলো না যে, এই আলেমরা এখন আর তাদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ নয়। সুতরাং তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে কোনো জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোনো ন্যায্যতা আর ইসলামের নীতি মোতাবেক নেই, করলে সেটা সন্ত্রাস হবে। আগে জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে। সেই মুরোদ বা সামর্থ্য না থাকায় তাদের মধ্যকার ফতোয়াবাজ কাঠমোল্লারা দুর্বল প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য তাদের এই ক্ষমতাকে কাজে লাগানো শুরু করল। আর আলেম শ্রেণি নিজেদের ক্ষমতাবান মনে করার যে সুখ সেই সুখ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তারা রাজত্ব হারালেও যাত্রাপালার রাজা সেজে নেতৃত্বের অভিনয় চালিয়ে যেতে লাগলেন। ভাবখানা হচ্ছে এমন যে, রাজদণ্ড নেই তো কী হয়েছে, ফতোয়া দিলে মানুষতো ঠিকই মানছে। সুতরাং ফতোয়াবাজি যতদিন পারা যায় করতে থাকি। তারা এই মহাসত্যটি জাতির সামনে সম্যকভাবে তুলে ধরলেন না। তারা আজ হিন্দুর বিরুদ্ধে, কাল কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে, পরশু অমুক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নাস্তিকতা বা কাফের-মুরতাদ ফতোয়া দিয়ে গলা ফাটিয়ে ওয়াজ করে একটি উত্তেজনা সৃষ্টি করে দেন। ফলে কোনো সংখ্যালঘু দুর্বল শ্রেণি ধর্মোন্মাদ তওহীদী জনতার রোষানলে ভস্মীভূত হয়ে যায়। বিগত সময়ে কত মানুষকে তারা হত্যা করেছে, কত মানুষের বাড়িঘর তারা জ্বালিয়ে দিয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এটাই হচ্ছে ফিতনা। আমাদের দেশে স্বাধীনতার ৪৭ বছরে না হলেও অর্ধশত ঘটনা ঘটেছে যেখানে মাইকে জনগণকে ডেকে মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং জনগণ মার মার কাট কাট করে ছুটে এসে জ্বালাও পোড়াও, হত্যাকাণ্ড, সম্প্রদায় বিশেষকে উচ্ছেদসহ নৃশংস কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে। প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে

এই ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এ কাজটি বার বার করেছেন এবং এর যেন কোনো বিরতি নেই। তারা যেটা করছেন এটা আল্লাহর রসুল কখনও করেন নি, তাঁর সাহাবিরাও কখনও করেন নি। কিন্তু জনগণ তো আর সেটা জানে না, জনগণ আলেম সাহেব যা বলেন সেটাই ইসলাম মনে করে অন্ধবিশ্বাস নিয়ে পালন করে। **বিশেষ করে ধর্মীয় নৃশংসতায় যখন কারো বাড়িঘরে হামলা করে লুটপাট করা, নিষ্ঠুরভাবে মানুষ মেরে বীরত্ব দেখানো, নারীদের ধর্ষণ করার মওকা পাওয়া যায় তখন তাতে অংশ নেওয়ার মতো বর্বর স্বার্থান্বেষী মানুষের কোনো অভাব এ জাতির মধ্যে হয় নি।** যখন এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে তখন তা চলে যায় স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর হাতে। তারা এটা নিয়ে নোংরা রাজনীতির খেলায় মেতে ওঠে। প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা তো বহু আগেই হারিয়ে গেছে। ধর্ম হয়ে গেছে স্বার্থান্বেষী শ্রেণির হাতিয়ার আর ধর্মবিশ্বাসী জনগণ হয়ে গেছে তাদের অন্ধ আনুগত্যকারী মাত্র যা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত।

এই ফেতনা সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কী হবে?

আল্লাহর রসুল এ কথাটিও সুস্পষ্টভাবে বলে গেছেন যে তাঁর উম্মাহর মধ্যে কারা ফেতনা সৃষ্টি করবে। তিনি বলেছেন, এমন সময় আসবে যখন- (১) ইসলাম শুধু নাম থাকবে, (২) কোর'আন শুধু অক্ষর থাকবে, (৩) মসজিদসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ ও লোকে লোকারণ্য হবে কিন্তু সেখানে হেদায়াহ থাকবে না, (৪) আমার উম্মাহর আলেমরা হবে আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব, (৫) তাদের তৈরি ফেতনা তাদের ওপর পতিত হবে।(১)

ধর্ম থেকে ফায়দা হাসিলকারী ও দাঙ্গা সৃষ্টিকারী ধর্মনেতাদের হৃদয় কেমন হবে সেটাও রসুলাল্লাহ সুস্পষ্টভাষায় বলে গেছেন। তিনি বলেন, শেষ যামানায় কিছু লোকের উদ্ভব হবে যারা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ধর্মকে প্রতারণার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবে। **তারা জনগণের সামনে ভেড়ার পশমের মতো কোমল পোশাক পরবে। তাদের মুখের ভাষা হবে চিনির চেয়ে মিষ্টি; কিন্তু তাদের হৃদয় হবে নেকড়ে বাঘের মতো হিংস্র।** আল্লাহ তা'আলা তাদের বলবেন: তোমরা কি আমার বিষয়ে ধোঁকায় পড়ে আছ, নাকি আমার প্রতি ধৃষ্টতা দেখাচ্ছ? আমার শপথ! আমি তাদের উপর তাদের মধ্য হতেই এমন বিপর্যয় আপতিত করব, যা তাদের খুবই সহনশীল ব্যক্তিদের পর্যন্ত হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ছাড়বে।(২)

ফেতনা অর্থাৎ দাঙ্গা হাঙ্গামা এমন একটি ভয়ঙ্কর বিষয় যা হাজার হাজার যুদ্ধের জন্ম দেয়। আমাদের মুক্ত মন নিয়ে চিন্তা করতে হবে যে কোন আলেমরা মানবসমাজে ফেতনা সৃষ্টি করছে। এরা হচ্ছে সেই আলেম দাবিদার গোষ্ঠী যারা ধর্মকে তাদের

---

১. হাদিস: আলী (রা.) থেকে বায়হাকী, মেশকাত।

২. হাদিস: আবু হোরায়রাহ (রা.) থেকে তিরমিজি।

ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করছে। **ধর্ম এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আর আল্লাহ্ হলেন সত্যের চূড়ান্ত রূপ। মানুষ যখন তাঁর থেকে আগত সত্যকে ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সামগ্রিক জীবনে ধারণ করে তখন সমাজ শান্তিময় হয়, ন্যায়বিচারে পূর্ণ হয়। তিনি স্বয়ং ধর্মের মাধ্যমে মানবসমাজে মূর্ত হন, প্রকাশিত হন**। যারা ধর্মের শিক্ষা দিয়ে, ধর্মের কাজ করে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করে, ধর্মকে জীবিকার হাতিয়ারে পরিণত করে তারা সমাজে প্রচলিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যভাষণের শক্তি ও যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। সে যখন একজন অসাধু ব্যক্তির থেকে সুবিধা গ্রহণ করে তখন তার মস্তক সেই টাকার কাছে বিকিয়ে যায়, সেই সাথে ধর্মও বিক্রি হয়ে যায়। সে ঐ অসাধু ব্যক্তির অপকর্মের প্রতিবাদ তো করতেই পারে না, উল্টো কীভাবে অসাধু ব্যক্তির স্বার্থরক্ষায় ধর্মের ফতোয়া ব্যবহার করা যায় সেই ফিকির করতে থাকে। **এভাবে ধর্মের নামে অধর্ম সমাজে প্রচলিত হয়ে যায়। যে ধর্ম এসেছিল মানুষের কল্যাণের জন্য, সেই ধর্মের নামেই মানুষের অকল্যাণ করা হয়। যে ধর্ম এসেছিল জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সেই ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক হানাহানি শুরু হয়।**

ইসলামকে পণ্য বানিয়ে আল্লাহ ও রসুলের যে অবমাননা এই জনগোষ্ঠীর ধর্মব্যবসায়ী একটি শ্রেণি করেছেন শত শত বছর ধরে, সেটা আর কেউ করতে পারে নি। তারা মানুষের ধর্মানুভূতিকে উত্তেজিত করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষিপ্ত করে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাতে খুব পটু। ইসলাম যেভাবে বর্বর আরবদের চরিত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল এই ওয়াজশিল্পিরা সেটা করতে পারছেন না, তারা সমাজের অন্যায় অবিচার দূর করতে পুরোপুরি অক্ষম। এখন তারা এটুকুই পারেন, একটু গুজব তুলে দিয়ে সাময়িক একটি হুজুগ সৃষ্টি করে, ধর্মবিশ্বাসী মানুষের ধর্মানুভূতিকে উসকে দিয়ে একটি উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে। সে উত্তেজনারও মেয়াদ খুব সীমিত। **এই জাহেলিয়াতের, মূর্খামির অবসান তখনই হবে যখন ধর্মবিশ্বাসী সাধারণ মানুষের সামনে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, আদর্শ সুস্পষ্ট হবে। তারা জানতে পারবে যে দাঙ্গা ও জেহাদ, যুদ্ধ কখনও এক নয়। যুদ্ধের নীতি থাকে দাঙ্গায় কোনো নীতি থাকে না**। আল্লাহর রসুল যতগুলো যুদ্ধ করেছেন সবগুলোতে তাঁর সৈন্যবাহিনী থেকে প্রতিপক্ষের সেনাবাহিনী ছিল কয়েকগুণ বড়। দাঙ্গায় হয় এর উল্টো। দুর্বল একটি গোষ্ঠীর উপর সংখ্যাধিক্যের শক্তিতে সংগঠিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়া হয়। মানুষের বাড়িঘরে আগুন দেওয়া হয়, হত্যাকাণ্ড হলে সেটাকে গণপিটুনি বলে চালিয়ে দেওয়া হয়, উসকানিদাতা ধর্মব্যবসায়ীরা লেবাসের আড়াল নিয়ে গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ সত্ত্বেও আইনের হাত থেকে পার পেয়ে যান। রাজনৈতিক নেতারাও এই ভণ্ড ধর্মনেতাদের সমীহ করে চলেন কেবলমাত্র ভোটের জন্য। এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধর্মের নামে এই অন্যায় আমাদের সমাজকে

কুরে কুরে খাচ্ছে। তথাপি চিন্তাহীনতা, যুক্তিহীনতা, কূপমণ্ডূকতা আজ মুসলিম জাতির ধর্মবোধ, ধর্মচিন্তাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে তারা তাদের পালিত ধর্ম আদতে তাদের কতটুকু কাজে আসছে, আখেরাতে তা তাদেরকে জান্নাতে নিতে পারবে কিনা সেটা নিয়ে চিন্তা করার, নিজের কাছে সেই প্রশ্ন উত্থাপনের সাহসিকতা ও মানসিকতাও হারিয়ে ফেলেছে।

তাদের এই চিন্তার জড়ত্ব থেকে মুক্তি দিতে প্রয়োজন হচ্ছে আরেকটি রেনেসাঁর (Renaissance)। তারা তো ১৩০০ বছর আগে পথ হারিয়েছে, গন্তব্য ভুলে গেছে। শরিয়ত, মারেফত, ফেরকা, মাজহাবের গভীর অরণ্যে হারিয়ে গিয়েছে। এখন বহু ধরনের মত-পথ সৃষ্টি হয়েছে। কেউ হয়েছে স্বার্থোদ্ধারকারী পীর, কেউ হয়েছে ভয়ানক জঙ্গি, কেউ হয়েছে রাজনৈতিক ইসলামপন্থী, কেউ আবার ব্যক্তিগত আমলের জোরে জান্নাতে যেতে চাচ্ছেন। এমতাবস্থায় মানুষ কোন ব্যবস্থার চর্চা করে দুনিয়াতেও শান্তি পাবে আখেরাতও জান্নাত পাবে, সে সঠিক পথ কোনটি? সেই পথের সন্ধান করা এখন মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

ধর্মব্যবসার একটি ধারা: রাজনৈতিক ইসলাম

ইসলাম শুধু ব্যক্তিজীবনের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকে কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালনের ধর্ম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বিচারিক, সামরিক ইত্যাদি সকল বিভাগের দিক নির্দেশনা প্রদান করে। আর রাষ্ট্রশক্তি তথা সার্বভৌমত্ব ছাড়া কখনওই একটি জীবনব্যবস্থা একটি জাতির জীবনে কার্যকর করা যায় না এটা সাধারণ জ্ঞান। এই সার্বভৌমত্ব আল্লাহর রসুল যে প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটাই হচ্ছে ইসলামের নীতি ও প্রক্রিয়া। তিনি কী করেছিলেন? **তিনি প্রথমে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পক্ষে, তওহীদের পক্ষে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। মানুষকে না বুঝিয়ে বা ভুল বুঝিয়ে বা মানুষকে অন্ধকারে রেখে শাসন ক্ষমতা দখল করে নিয়ে তিনি মদিনার নেতা হন নি।** মানুষকে সত্য বোঝানোর জন্য কী অকল্পনীয় ত্যাগ, কোরবানি, সবর তাঁকে করতে হয়েছে তা ইতিহাস। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যখন মদিনার জনগণ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব তথা আল্লাহ হুকুম স্বীকার করে নিল এবং রসুলাল্লাহকে তাদের পরিচালক হিসাবে তাদেরকে শাসন করার এখতিয়ার অর্পণ করল, তখনই রসুলাল্লাহ তাঁদের সর্বোচ্চ নেতা হলেন এবং সেখানে আল্লাহর বিধান দিয়ে তাদেরকে পরিচালিত করতে লাগলেন। ক্রমান্বয়ে পুরোনো সব ব্যবস্থা লুপ্ত হলো, এক নতুন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হলো। এই নব সভ্যতা কেবল তাদের জাতীয় রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে নয়, তাদের চিন্তাচেতনা, সংস্কৃতির উপরও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করল। ঐ নবগঠিত জাতির নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তদাতা ছিলেন রসুলাল্লাহ স্বয়ং। তিনি একাধারে বিচারক ছিলেন; বিচারক হিসাবে তাঁকে অপরাধীকে দণ্ড প্রদান করতে হয়েছে। তিনি সেনাপতি ছিলেন; সেনাপতি হিসাবে তাঁকে সামরিক কলাকৌশল নির্ধারণ থেকে শুরু করে সন্ধিচুক্তি, যুদ্ধাভিযান পর্যন্ত করতে হয়েছে। তিনি ঐ জাতির নেতা (এমাম) ছিলেন, তাই নামাজসহ জীবনের প্রতিটি অঙ্গনের নেতৃত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা তাকে প্রদান করতে হয়েছে। আল্লাহর রসুল হিসাবে রেসালাতের বাণী প্রচার করেছেন, আত্মিক, মানসিক, শারীরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে সত্যদীন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে উম্মাহ গঠন করেছেন।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা আর আজকের পৃথিবীতে যে ভৌগোলিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চলছে তার ভিত্তি এক নয়, কাঠামোও এক নয়। **ইসলামের 'নেতা নির্বাচন পদ্ধতি'**

আর প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারায় 'নেতা নির্বাচন পদ্ধতি' এক নয়। তবু উপায়ন্তর না পেয়ে অথবা হীনম্মন্যতাবশত পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক প্রভুদের শেখানো রাজনৈতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিগত শতাব্দীর অনেক চিন্তাবিদ কিছু রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেগুলোকে ইসলামিক মুভমেন্ট বা ইসলামি আন্দোলন বলা হয়ে থাকে। এগুলো আসলে কী? কয়েকশত বছর আগে বিশ্বের মুসলিম এলাকাগুলো ইউরোপীয় খ্রিষ্টান জাতিগুলোর পদানত হয়। এই দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বহুভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্মীয় চেতনার ভিত্তিতেও আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে, এগুলো তারই একটি ধারা, প্রভুদের উদ্ভাবিত রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় কয়েকশ বছরের গোলামি থেকে জাতিকে উদ্ধার করে ইসলামী শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ।

সেই রাজনৈতিক দলগুলো সবই ব্যর্থ হয়ে গেছে অথবা মৃত্যুর প্রহর গুনছে। অনেক দেশে এই দলগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভোট পেয়ে নির্বাচিত হলেও ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। হয় তাদেরকে ক্ষমতায় যেতে দেওয়া হয় নি, অথবা যেতে দিলেও কিছুদিন বাদেই সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বা গণবিক্ষোভের কারণে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছে। **এক কথায় তারা সবাই ব্যর্থ হয়েছেন এবং হবেন।** এর প্রধান কারণ পশ্চিমা প্রভুরা আসলে ইসলাম চায় না। তাই ইসলামপন্থীদের রাজনীতি করার সুবিধা দিলেও তাদের হাতে কর্তৃত্ব অর্পিত হোক এটা তারা মেনে নিতে পারে না। আর ইসলামিক রাজনৈতিক দলগুলো যেহেতু পশ্চিমাদের পদ্ধতি মেনেই রাষ্ট্র পরিচালনার জায়গায় যান, তাই তাদেরকে সেখান থেকে নামিয়ে দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা সেই পাশ্চাত্য প্রভুদের হাতেই রয়ে যায়। এটাকে আর যা-ই হোক সার্বভৌমত্ব বলা যায় না। সার্বভৌমত্বের মানে হচ্ছে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। বস্তুত **ইসলামিক রাজনৈতিক দলগুলো ব্যর্থ হবেই কারণ আল্লাহ মানুষকে একটি জীবনব্যবস্থা দান করবেন আর সেটা প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতি মানুষ চিন্তা করে আবিষ্কার করবে এটা হতে পারে না।** এই দলগুলোর প্রত্যেকটির কর্মসূচি তাদের নেতারা বসে তৈরি করেছেন, সেগুলো আল্লাহর দেওয়া কর্মসূচি নয়। আল্লাহর দেওয়া কর্মসূচি কোনটি তা আমরা **'ধর্মব্যবসার উৎপত্তি'** অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। সেই হাদিসটির শেষাংশে আল্লাহর রসুল বলেছেন যে, যারা (ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য, হেজরত ও জেহাদ) এই পাঁচটি কাজের ঐক্যবন্ধনী থেকে আধ হাতও বহির্গত হবে তাদের গলদেশ থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যারা জাহেলিয়াতের কোনো কিছুর দিকে আহ্বান করে তাদেরকে জাহান্নামের জ্বালানি পাথরে পরিণত করা হবে যদিও বা তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে বিশ্বাস করে, সালাহ কায়েম করে, সওম পালন করে।(১) **ব্রিটিশদের তৈরি করা রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি রসুলাল্লাহর ঘোষণা মোতাবেক জাহেলিয়াতের পদ্ধতি নয় কি?**

---

১. হাদিস: আল হারিস আল আশয়ারী (রা.) থেকে আহমদ, তিরমিযি, বাব উল এমারাত, মেশকাত।

সাধারণ মানুষ ব্রিটিশ যুগে দেখে এসেছে যে রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। পাশ্চাত্যে পাঁচশ বছর ধরে এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে। ব্রিটিশরাও ভারতবর্ষসহ মুসলিম অধ্যুষিত ভূমি দখল করে ইউরোপের সেই ব্যবস্থাই চাপিয়ে দিয়েছিল। এর আগে মুসলিম বিশ্বে ইসলামের নামেই শাসন চলত। খলিফা বা সুলতানদের নামে খোতবা দেওয়া হতো, মুদ্রার উপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' খচিত থাকত। দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, রাজস্ব, দেওয়ানী, ফৌজদারি ইত্যাদি বিষয়গুলো ইসলামের বিধি-ব্যবস্থা মোতাবেকই চালিত হতো। কাজিরা বিচার করতেন ইসলামের ফেকাহ আর ফতোয়ার কেতাব মোতাবেক। এভাবে সহস্রাধিক বছর ধরে চলেছে এবং মুসলিমরা এরই মধ্যে তাদের সোনালি যুগ অতিক্রম করেছে এবং আদর্শচ্যুত হয়ে পতনের কিনারায় পৌঁছেছে। **বাংলাদেশে যে গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, টাকায় আট মণ চাল ইত্যাদি প্রবাদগুলো চালু আছে তা ঐ মুসলিম শাসনামলেরই ইতিহাস।**

মুসলিম শাসকদের পদস্খলন তাদের গোটা সভ্যতার উপর **অভিশাপ হিসাবে** ব্রিটিশদের ডেকে আনল। তারা শাসক হয়েই পূর্বের মুসলিম শাসিত অঞ্চলগুলোর মানুষের জীবনব্যবস্থাটা আমূল পাল্টে দিল। তারা মুসলিম জনগোষ্ঠীকে শিক্ষাবঞ্চিত করে, কর্মবঞ্চিত করে একেবারে গণ্ডমূর্খ বানিয়ে ফেলল, শাসকের জাতিকে দাসের জাতিতে রূপান্তরিত করল, কৃষিকাজ হয়ে গেল তাদের প্রধান পেশা। দুইশ বছর গোলামির পর এই জাতির মনে মগজে গোলামি বেশ শক্তপোক্তভাবে আসন গেড়ে বসেছে। এরই মধ্যে মুসলমানেরা ভুলেও গেছে যে ইসলাম কেবল নামাজ-রোজা না, ইসলাম দিয়ে বিশ্ব চালানো যায়। জীবনের সর্বাঙ্গনের পূর্ণ ব্যবস্থা ইসলামে আছে। এই কথাগুলো মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করল রাজনৈতিক ইসলামি দলগুলো। তারা শাসনব্যবস্থায় ইসলামকে নিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজতে লাগল।

এখানে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, মুসলিম বিশ্বে শত শত বছর ধরে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকা রাজতন্ত্র চলেছে ধর্মের দোহাই দিয়ে। প্রমাণের চেষ্টা চলেছে যে, রাজতন্ত্রের সাথে ইসলামের তেমন কোনো বিরোধ নেই। আবার যখন বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের জোয়ার বইছিল, তখন কোর'আন-হাদিস-ইতিহাস ঘেটে নানা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে সমাজতন্ত্রকে 'ইসলামসম্মত' প্রমাণ করা হলো। এর ভিত্তিতে দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক ইসলামি (Islamic socialism) দল গঠন করা হলো। তারা বলতে লাগল, খলিফা ওমর (রা.) হলেন আদর্শ সাম্যবাদী শাসকের উদাহরণ। পরে যখন সমাজতন্ত্রের বাস্তবরূপ মানবজাতি প্রত্যক্ষ করল, স্বপ্নবিলাস টুটে গেল। পতন হলো সমাজতন্ত্রের। আজ যখন বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের জোয়ার বইছে তখন রাজনৈতিক ইসলামের চিন্তানায়কগণ কম্যুনিজমকে কুফরি মতবাদ ফতোয়া দিয়ে গণতন্ত্রের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। তারা এবার গণতন্ত্রের ঘাড়ে চেপে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। তারা কথিত বাতিলের বিরুদ্ধে জেহাদ করছেন, জাতিকে ইসলাম শিখাচ্ছেন, গবেষণামূলক ইসলামী বই লিখছেন- সেগুলোর নাম দিচ্ছেন ইসলামি সাহিত্য। **আর**

তাতে মোটাদাগে যে কথাটি উল্লেখ থাকছে তাহলো- ইসলাম হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে গণতান্ত্রিক ধর্ম! খলিফা আবু বকর (রা.) গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং গণতন্ত্র মেনেই খেলাফত করে গেছেন। তিনি মজলিশে শুরা বানিয়েছিলেন যা হচ্ছে বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ। আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি, কোনোভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যদি হিটলার-মুসোলিনি বিজয়ী হতেন তাহলে রাজনৈতিক ইসলামীরা ফ্যাসিবাদি ইসলাম আবিষ্কার করে ফেলতেন এবং স্বয়ং রসুল ও তাঁর খলিফাদেরকে সর্বকালের সেরা একনায়ক বলে প্রমাণ করে দিতেন। গরু আর বাঘ উভয়ই পশু। তাদের একটি করে মাথা, নাক ও লেজ, দুটো করে চোখ-কান, চারটা করে পা, লোমে আবৃত শরীরসহ অজস্র মিল রয়েছে, তাই বলে কি গরু আর বাঘ এক হয়ে গেল? তাদের উভয়ের মধ্যে অমিলও রয়েছে অসংখ্য। গরু শিংযুক্ত খুরবিশিষ্ট তৃণভোজী, নিরীহ পোষা প্রাণী আর বাঘ ঠিক উল্টো, সে মাংসভোজী, হিংস্র, ভয়ঙ্কর, বন্য, ধারালো দাঁত ও নখরবিশিষ্ট, দ্রুতগামী। এভাবেই প্রতিটি জীবনব্যবস্থার মধ্যে খুঁজলে অসংখ্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে বহু মৌলিক বিষয়ে বৈপরীত্য রয়েছে। দীনের মূল বিষয়ই হচ্ছে সার্বভৌমত্ব কার। এটাই হচ্ছে দীনের ভিত্তি। গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির, সমাজতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব একটি বিশেষ শ্রেণির যাদের পলিট ব্যুরো বলা হয়। রাজতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব রাজার। আর ইসলামের সার্বভৌমত্ব হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর। **যখন ভিত্তিই আলাদা তখন গৌণ বিষয়ের সাযুজ্য সন্ধান করে ইসলমকে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির সাথে তুলনা করা হাস্যকর। ইসলাম ইসলামই। অন্যান্য তন্ত্র-মন্ত্রের মধ্যে যারা ইসলাম খুঁজে বেড়ান তাদের অভিজ্ঞতা অন্ধের হাতি দেখার চেয়ে খুব ভালো হবে না।** তাদেরকে যারা অনুসরণ করবে তারাও সেভাবেই পুরো হাতিকে বুঝতে পারবে না, জানতে পারবে না, দেখতে পারবে না।

ব্রিটিশদের শেখানো রাজনৈতিক পদ্ধতি কী করে জাতির তরুণদেরকে বিভ্রান্ত, দিকভ্রষ্ট করল সে বিষয়ে কবি নজরুলের ‘শিখা’ কবিতাটির কয়েকটি চরণ এখানে উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। তিনি লিখেছেন,

যে হাতে পাইত শোভা খর তরবারি
সেই তরুণের হাতে ভোট-ভিক্ষা-ঝুলি
বাঁধিয়া দিয়াছে হায়! - রাজনীতি ইহা!
পলায়ে এসেছি আমি লজ্জায় দু-হাতে
নয়ন ঢাকিয়া! যৌবনের এ লাঞ্ছনা
দেখিবার আগে কেন মৃত্যু হইল না?
রে তরুণ, তোমারে হেরিয়া আমি কাঁদি!
অসম্ভবের পথে অভিযান যার

সুদূর ভবিষ্যতে দুর্মদ দুর্বার
সে আজি অতীতে পানে মেলিয়া নয়ন
কেবলই পিছনে চলে, নেতার আদেশে।
তলোয়ার হইয়াছে লাঙলের ফলা!
অতীতের অর্থ ভূত, সেই অদ-ভুত
অতীত কি বর্তমানে এখনও শাসিবে?
এই ভূতগ্রস্ত জাতি জানি না কেমনে
স্বাধীন হইবে কভু, পাইবে স্বরাজ!

যাহোক, উপনিবেশ যুগ সমাপ্ত হলে ইসলামিক রাজনৈতিক দলগুলোর পুরোধাগণ দেখলেন, এই সময়ে সরকার গঠন করতে হলে ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া ধাপ্পাবাজির রাজনীতি (যা ব্রিটিশরা নিজেদের দেশে কোনোদিন অনুসরণ করে নি, এদেশেও করে নি। তারা শেষ দিন পর্যন্ত গণতন্ত্র নয় বরং বন্দুকের জোরেই শাসন চালিয়ে গেছে) যাকে ব্রিটিশরা নাম দিয়েছে 'নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি' সেটা অনুসরণ করেই ক্ষমতায় যেতে হবে। তারা সেই পথেই পা বাড়ালেন। **আল্লাহর রসুল হেঁটেছেন আল্লাহর দেখানো পথে, আর রাজনৈতিক ইসলামিক দলগুলো হাঁটতে লাগলেন ব্রিটিশদের দেখানো পথে।** এরপর তাদের জন্য অনিবার্য হয়ে উঠল প্রচলিত গণতন্ত্রের সাথে, আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সাথে ইসলামের সমীকরণ মেলানো। তারা প্রথমেই ব্রিটিশদের গোলাম মুসলমান জাতিকে এটা বললেন যে, "শোনো, ব্যক্তিগত উপাসনায় ব্যস্ত মুসলিমরা। ইসলামে কিন্তু রাজনীতি আছে, আল্লাহর রসুল রাজনীতি করেছেন। সুতরাং মুসলিমরা, তোমরা আমাদেরকে ভোট দিলে তোমাদের সওয়াব হবে, তোমরা জান্নাতে যাবে। আর আমাদের বিপরীত অবস্থানে থাকা অনৈসলামিক দলগুলোকে ভোট দিলে তোমরা জাহান্নামে যাবে।"

এখানে আরেকটি জটিল প্রশ্ন প্রাসঙ্গিকভাবেই চলে আসে। নিবন্ধিত-অনিবন্ধিত ইসলামি দলও আবার শত শত। তাদের প্রত্যেকের আলাদা মার্কা, আলাদা কর্মসূচি, আলাদা ইশতেহার, আলাদা পতাকা। তারা একদল আরেকদলের এমন বৈরী যে রীতিমত সাপে নেউলে সম্পর্ক। তারা সবাই ধর্মবিশ্বাসী ভোটারদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। তাহলে এত এত ইসলামি দলের মধ্যে কোন দলের ভোটাররা জান্নাতে যাবেন?

প্রকৃত সত্য হচ্ছে, জান্নাতে যাবে কেবল মো'মেন,⁽¹⁾ আর মো'মেনরা তো হবে এক দলভুক্ত, একটি দেহের ন্যায়,⁽²⁾ তারা হবে ভাই ভাই⁽³⁾ তাদের কর্মসূচি থাকবে একটি,⁽⁴⁾

---

১. আল কোর'আন, সুরা মোহাম্মদ ১২, সুরা তওবা ৭২

২. আল হাদিস- মেশকাত

৩. কোর'আন, সুরা হুজরাত ১০

৪. আল হারিস আল আশয়ারী (রা.) থেকে আহমদ, তিরমিযি, বাব উল এমারাত, মেশকাত

তাদের নেতা হবে একজন, তাদের সবার লক্ষ্য হবে একদিকে। কোনো মসজিদে একই সাথে যেমন দুটো জামাত চলতে পারে না তেমনি একই সাথে পৃথিবীতে মুসলমানদের একাধিক ফেরকা, মাজহাব, তরিকা থাকতে পারে না। সালাতের সময় যেমন একজন মাত্র এমামের তাকবির সকল মুসল্লি মানতে বাধ্য থাকেন তেমনি মুসলিম জাতির মধ্যেও একজন মাত্র এমাম (নেতা) থাকবেন যার হুকুম সবাই মানতে বাধ্য থাকবে। সালাতের সময় যেমন প্রত্যেক মুসল্লির কেবলা (লক্ষ্য) থাকে একটি অর্থাৎ আল্লাহর ঘর ক্বাবার দিকে, তেমনি বাস্তব জীবনেও মুসলিম জাতির জীবনের লক্ষ্য হবে একটি, তা হলো মানবজীবনে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে শান্তি আনয়ন করা।

কাজেই সফল তারাই হবে, জান্নাতে তারাই যাবে যারা দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রসুলের তরিকা (পথ, কর্মসূচি) মোতাবেক চলবে। নিজেদের আবিষ্কৃত বা ব্রিটিশ খ্রিষ্টানদের প্রদর্শিত পথে চলে জান্নাতে যাওয়া যাবে এমন কোনো অঙ্গীকার আল্লাহ দেন নি। **"ইসলামে রাজনীতি আছে" এ কথাটি প্রতারণামূলক অর্ধসত্য।** ইসলাম যেহেতু সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা তাই তার একটি রাষ্ট্রনীতি তো থাকতেই হবে কিন্তু ব্রিটিশদের রচিত রাজনৈতিক পদ্ধতি কি আল্লাহর রসুলের পদ্ধতি? আল্লাহর রসুল কি এই ধান্ধাবাজি আর প্রতারণার রাজনীতি করেছেন? কক্ষণো নয়। তারা স্রেফ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভোট নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত রাজনীতিকে ইসলামের রূপ দিয়েছে। তাদের চিন্তাবিদ ও আলেমগণ নানা কূটকৌশল (তাদের ভাষায় হেকমত) অবলম্বন করে কোর'আন, হাদিসের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত উক্তি এবং রসুলের জীবনের নানা ঘটনার মতলবি ব্যাখ্যা দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে তাদের সকল রাজনৈতিক কর্মসূচি ও সিদ্ধান্তগুলো ইসলামসম্মত। এভাবে 'ইসলামে রাজনীতি আছে' এই শ্লোগানটি দিয়ে ব্রিটিশের রাজনৈতিক পদ্ধতিকে জায়েজ করে ফেলা হলো। রসুলাল্লাহ বলেছেন, 'যুদ্ধ মানেই হেকমত, কৌশল'। এই হাদিসকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করে তারা রাজনৈতিক স্বার্থে সর্বপ্রকার মিথ্যা, শেরক ও কুফরের সাথে আপসও করে চলেছেন এবং নিজেরাও সেসবে লিপ্ত হচ্ছেন।

তারা জনগণকে বুঝ দেওয়ার জন্য বললেন যে, মদিনা ছিল একটি 'ইসলামিক রাষ্ট্র' যদিও জাতিরাষ্ট্রের বর্তমান ধারণা ১৪শ' বছর আগে ছিলই না। ইসলামে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সীমানা বা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ধারণাই নেই। তারা আল কোর'আনকে আধুনিক যুগের ভাষায় শুধুমাত্র 'সংবিধান' বলতে চান, কারণ এখন সব দেশে সংবিধান আছে। কোর'আন আর বর্তমানের সংবিধানের মধ্যে যে আসমান জমিন ফারাক সেটা তারা নিজেরা জানলেও জনগণকে সে বিষয়ে বলেন না। কোর'আন কোনো বিজ্ঞানের বই নয়, যদিও এতে বহু বৈজ্ঞানিক সত্য ও তত্ত্ব উল্লেখ করা হয়েছে, কোর'আন দণ্ডবিধি বা শরিয়তের বই নয়, যদিও এতে বেশকিছু দণ্ডবিধি সন্নিবেশিত হয়েছে। কোর'আন কোনো ইতিহাসের বই নয়, যদিও এতে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। কোর'আন সত্য ও মিথ্যার ফারাককারী এক মহা অলৌকিক ও বিস্ময়কর গ্রন্থ, একে

আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন উপদেশগ্রন্থ। এতে মানুষের আধ্যাত্মিক শুদ্ধতা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামরিক, বিচারিক অর্থাৎ সামগ্রিক জীবনে শান্তিলাভের মূলনীতিগুলো রয়েছে। **সেই চিরন্তন মূলনীতিগুলো পাল্টে ফেললে সেটা আর ইসলাম থাকে না। যুগের সাথে পোশাক পাল্টাতে পারে, যানবাহন পাল্টাতে পারে, প্রযুক্তি পাল্টাতে পারে কিন্তু দীনের মূলনীতিগুলো পাল্টাতে পারে না।** তারা মদিনা সনদকে ‘গঠনতন্ত্র’ বলতে চান যেটা আসলে ছিল একটা নিরাপত্তা চুক্তি। এসব পরিভাষা তারা ব্যবহার করে ইসলামকে ঐ ব্রিটিশ রাজনীতির কাঠামোয় ফেলতে চান, জনগণের কাছে নিজেদেরকে ইসলামের খেদমতকারী হিসাবে প্রকাশ করতে চান। তারা যেহেতু মার্কা নিয়ে নির্বাচন করছেন, নির্বাচনকে বলেন জেহাদ আর ব্যালটকে বলেন সেই জেহাদের বুলেট। আল্লাহর রসুল (সা.) বা তাঁর সাহাবিরা কোনো মার্কা নিয়ে নির্বাচন করেন নি। ধর্মব্যবসা হারাম জেনেও এর বিরুদ্ধে তারা মুখ খোলেন না। ধর্মব্যবসায়ী ইমামদের পেছনেই নামাজ পড়েন, তাদেরকে হাতে রাখার চেষ্টা করেন। কারণ একটাই- তাদের ভোট দরকার আর ধর্মব্যবসায়ীরা জনগণের ধর্মানুভূতির উপর প্রভাবশালী। এখানে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় কোনো বিষয় না। আল্লাহ সুদ হারাম করেছেন। সুতরাং সুদমুক্ত কোনো ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করা গেলে ধর্মানুরাগীরা সেখানে টাকা গচ্ছিত রাখবেন। তাই তারা কায়দা করে এমন একটি ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করল যাকে জনগণের সামনে ইসলামসম্মত ও হালাল বলে প্রচার করা হলো। **ইসলামে যে পুঁজিবাদই হারাম আর ব্যাংক যে পুঁজিবাদেরই কার্যালয় সেটা আর কেউ জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিল না।** তারা নিজেরা বৈশ্বিক সুদব্যবস্থার সাথে লেনদেন বজায় রাখলেন (এটা ছাড়া উপায়ও নেই), আবার জনগণকেও ইসলামিক ‘পুঁজিবাদ’ ধরিয়ে দিলেন। মানুষের ঈমানকে, ধর্মপ্রিয় মানসিকতাকে ব্যবহার করে তারা এভাবেই স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি বহুপ্রকার ব্যবসা করেন। এগুলো তারা করতে পারবেন ঠিকই, আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবেন ঠিকই, কিন্তু মানুষ কোনোদিন ইসলাম পাবে না। কারণ এগুলোও ধর্মব্যবসার একটি রূপ যা দ্বারা মানবজাতি কেবল প্রতারিতই হয়, ক্ষতিগ্রস্তই হয়।

একটি উদাহরণ দিলে ইসলাম ও রাজনৈতিক ইসলামের পার্থক্যটা হয়তো সুস্পষ্ট হবে। ধরুন দুই ঠিকানায় অবস্থিত সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের দু’টো বাড়ি। এর একটি হচ্ছে ইসলাম আরেকটি হচ্ছে বর্তমানের জাতিরাষ্ট্র। যারা প্রচলিত রাজনৈতিক তরিকায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চান তারা কী করছেন? **তারা পশ্চিমাদের দেখানো পথ বেয়ে তাদের বাড়িতেই প্রবেশ করতে চাচ্ছেন। নিয়ত হচ্ছে, একবার ক্ষমতায় যাই। তারপর একটা একটা করে সেই বাড়ির ইট, কাঠ, জানালা, কামরা (বিধিবিধান, নীতিমালা) পাল্টে ফেলব।** তারা বুঝতেই পারছেন না যে নতুন বাড়ি নির্মাণ করতে হলে পূর্বের বাড়ির ভিত্তিসহ চূর্ণ করতে হয়।

আল্লাহর বাড়িও আলাদা, আল্লাহর বাড়ির পথও আলাদা। অন্যের বাড়ির পথ দিয়ে আল্লাহর বাড়িতে ঢোকা যাবে না। পরের জমিতে বাড়ি বানালে সেই বাড়ি রক্ষা করা যায় না। আল্লাহ সত্যদীন দিয়েছেন, সেই দীন প্রতিষ্ঠার পথ দিয়েছেন, আলাদা কর্মসূচিও দিয়েছেন। সেগুলো সব বাদ দিয়ে পশ্চিমাদের তৈরি করা পথে ও প্রক্রিয়ায় আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা হবে না। তারা দুই একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশে জনগণকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে, স্বপ্ন দেখিয়ে, তাদের ভোটব্যাংক ব্যবহার করে যদিও বা ক্ষমতায় বসতে পারেন, তাদেরকে তিউনিশিয়ার আন নাহ্‌দার মতো সংস্কারের মাধ্যমে নিজেদের মূল কাঠামোরই পরিবর্তন করতে হবে, প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক নীতিমালাই মেনে চলতে হবে। আজ যেমন বহু কট্টর বামপন্থী দল ভোল পাল্টে গণতান্ত্রিক হয়েছে, তেমনি বহু ইসলামিক দলকেও ভোল পাল্টে সেক্যুলার সাজতে হচ্ছে। একটা পর্যায়ে তারা ইসলামও মানতে পারবে না, আল্লাহর সার্বভৌমত্বও প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। আর যদি একটুও এদিক সেদিক করে তাহলে পাশ্চাত্য তরিকায় গড়ে ওঠা দেশীয় সেনাবাহিনী আছে, তারা যেভাবে মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে এক বছরের ব্যবধানে গদিচ্যুত করে নেতাদের গণহত্যা করেছে, ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে তেমনটাই করবে। **তারা কেউ ক্ষমতায় গিয়ে 'খলিফা' পদবি ধারণ করতে পারলেও গলার কাঁটা হয়ে থাকবে বিরোধীদলগুলো যারা নানা ইস্যুতে জ্বালাও পোড়াও করে 'খলিফা'র ঘুম হারাম করে দেবে, জনপ্রিয়তা নষ্ট করার চেষ্টা করবে। জনপ্রিয়তা নষ্ট হলে পাঁচ বছর পরে 'খেলাফত' শেষ।** আবার মার্কা নিয়ে নির্বাচনের জন্য রাজপথে বসে অপেক্ষা। এমন ভঙ্গুর ব্যবস্থা, বানরের মতো পিচ্ছিল বাঁশে আরোহণের ব্যবস্থা তো আল্লাহর 'ইসলাম' হতে পারে না।

আল্লাহর রসুল যেহেতু একজন রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন তিনি আমাদের জন্য আদর্শ হিসাবে রাষ্ট্রনীতিও রেখে গেছেন। তাঁর মূল নীতি ছিল সর্বদা সত্যের উপর সরল পথে অটল থাকা এবং পরিণতি যা-ই হোক সেটা আল্লাহর উপর সোপর্দ করে দেওয়া। তাতে সম্পত্তির ক্ষতি হয় হোক, জনপ্রিয়তা বাড়ুক বা কমুক সেটা নিয়ে তিনি কখনও চিন্তিত হন নি। কোনো প্রলোভনের কাছেই তিনি আত্মবিক্রয় করেন নি। যেনতেনভাবে রাষ্ট্রশক্তি অর্জনের চিন্তা যদি তাঁর থাকতো তাহলে মক্কায় থাকতে তো তাঁকে মক্কার শাসক, সুলতান হওয়ার প্রস্তাব করাই হয়েছিল। **তিনি তো এটা ভাবতে পারতেন যে, আগে ক্ষমতাটা হাসিল করি, পরে আমার মনের মধ্যে যা আছে সেটা সুযোগ বুঝে বাস্তবায়ন করব।** কিন্তু না, তিনি হেকমতের নামে ঐ বক্র পথে হাঁটেন নি। তিনি আল্লাহর হুকুমের পক্ষে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেছেন। সেখানে প্রতিটি নাগরিকই ছিল রাষ্ট্রের ও ধর্মের পাহারাদার। আলাদা কোনো সামরিক বাহিনী ছিল না, আলাদা পুলিশ বাহিনী ছিল না। তিনি ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কাউকে কোনোদিন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন নি। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিজের কসম (ওয়াদা) দ্বারা কোন মুসলমানদের সম্পদ কুক্ষিগত করতে চায়, সে নিজের জন্য জাহান্নাম অবধারিত ও জান্নাত হারাম করে

ফেলে। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসুল (স.) যদি তা খুব নগণ্য জিনিস হয় তবুও? তিনি বললেন, যদি একটা গাছের ডালও হয় তবুও।(১)

ইসলামের নামে চলমান রাজনীতিতে ইশতেহারের মধ্যে প্রদত্ত শত শত অঙ্গীকার ক্ষমতায় গেলে ভুলে যাওয়া হয়, মনে থাকলেও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। সিস্টেমের কারণে চাইলেও অনেক কিছু করা যায় না। **তাদের দলীয় নেতৃত্ব কর্মীদেরকে জেহাদের আয়াত, হাদিস ইত্যাদি বলে উদ্বুদ্ধ করেন কিন্তু নিজেরা কর্মীদের মতো কষ্ট করতে চান না। তারা আরাম-আয়েশের মধ্যে জৌলুসপূর্ণ জীবনযাপন করতে ভালোবাসেন। তারা নিজেদের ছেলে মেয়েদেরকে বিদেশে পড়ান।** আন্দোলনের চেয়ে আর্থিক সমৃদ্ধি, চাকুরি, ব্যবসা ইত্যাদিই তাদের ব্যস্ততা ও চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন, নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করে ও কসম খেয়ে (ওয়াদা) তার বিনিময়ে তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থ হাসিল করে, পরকালে তাদের কিছুই থাকবে না, আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে দৃষ্টি দেবেন না, এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।(২)

মনে রাখতে হবে, সবচেয়ে জঘন্য মিথ্যা হলো যে মিথ্যা ধর্মের নামে করা হয়, আল্লাহর নামে করা হয়। পলিটিক্যাল ইসলামের বড় বড় নেতারা এই জঘন্য মিথ্যাটিকেই তাদের রোজগারের হাতিয়ার বানিয়ে নিয়েছেন। আসলে এরকম ছলনা তারা করতে বাধ্য। আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে সোজা গাড়ি চালানো যায় না, আঁকাবাঁকাই চালাতে হয়। তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ যারা ধর্মের নামে রাজনীতি করে না, তারা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির কথা বলে রাজনীতি করে। সেই দলের নেতারা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যে পরিমাণ দুর্নীতির আশ্রয় নেন, তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামলে তাদের চেয়েও বেশি দুর্নীতি আর ভণ্ডামির আশ্রয় নিতেই হবে। ব্রিটিশদের শেখানো পথে যারা রাজনীতি করবে তাদেরকে ধান্ধাবাজি, গলাবাজি, মিথ্যাচার, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, জ্বালাও- পোড়াও, ভাঙচুর, হরতাল-অবরোধ করতেই হবে। **এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় না। তাই ইসলামের নামে যারা রাজনীতি করেন তারা একদিকে যেমন আল্লাহর সঙ্গে প্রতারণা করেন অপরদিকে জনগণের সঙ্গেও প্রতারণা করেন।**

তাদের সবচেয়ে বড় বোকামিটা এখানে। যারা সেক্যুলার রাজনীতি করেন তারা তাদের যাবতীয় অপকর্মকে শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন না। তাই জনগণও তাদের কাছে শরিয়তসম্মত, ইসলামের নীতিসঙ্গত আচরণ আশা করে না, দীনের মানদণ্ডে তাদেরকে যাচাই করে না। রাজনীতিতে ধান্ধাবাজি চলে, প্রতারণা চলে এটা সর্বজনবিদিত। কিন্তু যারা ইসলামের পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়েছে তাদেরকে মানুষ ইসলামের মানদণ্ডেই যাচাই করবে এটাই যুক্তিসঙ্গত, মানুষ দেখবে তারা কি অন্যদের মতো রাজনৈতিক মিথ্যাচারিতা করে, নাকি যা বলে তা কাজেও প্রমাণ করে। তাদের

---

১. হাদিস: মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাযাহ।

২. আল কোর'আন: সুরা আল ইমরান ৭৮।

বক্তব্যের মধ্যে কোর'আন হাদিসের কথা থাকে, তাই তাদের বক্তব্যকে ইসলামের কথা বলেই জনগণ বিবেচনা করে। কিন্তু প্রচলিত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জনগণের এই চাহিদা কোনোদিন তারা পূরণ করতে পারবে না। এখানেই ইসলামিক রাজনৈতিক দলগুলো হাজারবার ব্যর্থ হতে বাধ্য। ধর্মের নামে মিথ্যাচার, প্রতারণাকে মানুষ মেনে নিতে পারে না। এ কারণে আমাদের দেশেও রাজনৈতিক ইসলামি দলগুলো জাতীয় নির্বাচন তো দূরের কথা, গ্রামের মেম্বার চেয়ারম্যান পদেও জিততে পারে না। দু'চার জন জিতলেও সেটা সামগ্রিক বিচারে এতটাই নগণ্য যে জাতীয় পর্যায়ে তাদের কোনো প্রভাবই সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। আর যেসব দেশে অমুসলিমরা সংখ্যাগুরু সেখানে রাজনৈতিক ইসলামের সফলতার সম্ভাবনা শতকরা শূন্যভাগ, যেমন ভারত, চীন, জাপান, রাশিয়া বা ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোয়। কারণ মুসলমানদের ভোটের উপর ভরসা করেই ইসলামিক দলগুলো রাজনীতি করে থাকে। যেখানে মুসলমানদের বাঁধা ভোটব্যাঙ্ক নেই সেখানে তাদের ভোটাভুটি করে ক্ষমতায় যাওয়াই সম্ভব নয়, ইসলাম প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা। কিন্তু আল্লাহ তাঁর রসুলকে দায়িত্ব দিয়েছে অন্যান্য সমস্ত দীনের উপরে এই শেষ জীবনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তাঁর উপাধি দিয়েছেন রহমাতাল্লিল আলামিন বা বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ। এক কথায় সমগ্র মানবজীবনে এই সত্য প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব আল্লাহ তাঁকে দিয়েছেন। যে প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর নির্দিষ্ট কিছু ভূখণ্ডে দীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতে পারে, আর বাকি পৃথিবীতে অসম্ভব সেটা কোনোভাবেই সার্বজনীন নীতি-প্রক্রিয়া হতে পারে না। আল্লাহ দীনুল হক দিলেন সারা পৃথিবীর জন্য কিন্তু এমনই প্রতিষ্ঠার তরিকা দিলেন (রাজনৈতিক ইসলাম) যা কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশগুলোয় প্রয়োগ করা সম্ভব এটা কী করে হতে পারে? সুতরাং এটা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর দেওয়া পথ নয়, এটি মানুষের তৈরি পথ। ও পথে আল্লাহর ইসলাম প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব নয়। ধানচাষের প্রক্রিয়ায় আলু চাষ করা যায় না। এই দলগুলোতে বহু কর্মী আছেন যারা সত্যি সত্যিই ইসলামকে ভালোবাসেন, আল্লাহ-রসুলের বিজয় দেখতে চান। কিন্তু পথ ভুল হলে হাজার বছর চলেও গন্তব্যে পৌঁছা যায় না। এটা এসব দলের কর্মীরা যত দ্রুত বুঝতে পারবেন ততই তাদের পক্ষে বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মবিশ্বাসী মানুষের ভোট পাওয়ার জন্য ইসলাম নিয়ে কপটতার রাজনীতি করতে কিন্তু সেক্যুলার দলগুলোও কম যান না। প্রয়োজনে বাহ্যিক কিছু কাজ করে তারা দেখান যে নেতারাও অতি উৎকৃষ্ট মুসলিম। যেমন মসজিদ তৈরি ও মেরামত, টাকার নোটে মসজিদের ছবি ছাপান, শুক্রবারকে ছুটির দিন ঘোষণা করা, সংবিধানে বিসমিল্লাহ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, রাষ্ট্রধর্ম ইত্যাদি সংযোজন করা। **প্রতি বছর সরকারি খরচে বিরাট বহর নিয়ে হজ্ব করতে যাওয়া এবং সেখানে সৌদি বাদশা ও শাহী আলেমদের সঙ্গে ছবি তুলে নিজ নিজ দেশে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা, নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরুর আগে কোনো বিখ্যাত মাজারে গমন এবং লম্বা মোনাজাতের ব্যবস্থা**

করা, বড় কোন ইসলামের নামে সম্মেলনের শেষদিনে আখেরী মোনাজাতে উচু মঞ্চ বানিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে লম্বা দোয়া করা এবং সেটা সারাক্ষণ টেলিভিশনে দেখানো ইত্যাদি। ইংরেজিতে যাকে বলে Window dressing, **বাইরে রং লাগিয়ে চকচকে করে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া।** যেহেতু জনসাধারণ প্রকৃত ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ কাজেই তারাও খুব ইসলাম করা হচ্ছে মনে করে খুশি থাকেন। কিন্তু এসবকিছু করে ইসলামের কোনো উপকার হচ্ছে না, ইসলামের প্রতিশ্রুত ন্যায়, শান্তি, সাম্য, অর্থনৈতিক সামাজিক সুবিচার কিছুই মানুষ পাচ্ছে না। পাচ্ছে কেবল ধোঁকা। তাদেরকে সেক্যুলার দলগুলোও ধর্মের নামে ধোঁকা দিচ্ছে, ইসলামপন্থী দলগুলোও ধর্মের নামে ধোঁকা দিচ্ছে।

আজ গণতান্ত্রিক রাজনীতির মতো মিছিল, মিটিং, ঘেরাও, ভাঙচুর, জ্বালাও পোড়াও, সাধারণ মানুষের জীবন-সম্পদকে জিম্মি করে আন্দোলন ইত্যাদি কাজগুলোও অন্যান্য দলগুলোর মতো অনেক ইসলামি আন্দোলনও হরদম করে যাচ্ছে কিন্তু ইসলাম এগুলোর অনুমতি দেয় না, এগুলো ইসলামে নেই। আল্লাহর রসুল মক্কায় থাকতে অর্থাৎ রাষ্ট্র গঠনের আগে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি। **তিনি সাধারণ মানুষকে কষ্ট দিয়ে একবারও কোনো ভাঙচুর, জ্বালাও পোড়াওয়ের কর্মসূচি নিয়েছেন এমন প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবেন না। এগুলো হচ্ছে ইসলামের মৌলিক নীতিপরিপন্থী কাজ যা সুস্পষ্ট সন্ত্রাস।** ইসলামের নীতি হলো সত্য ও মিথ্যা মানুষের সামনে উপস্থাপন করা এবং সত্যের পথে যারা আসবে তাদেরকে নিয়ে দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করা। একটা পর্যায় আসবেই যখন সত্য বিজয়ী হবে আর সত্য বিজয়ী হতে গেলে মিথ্যার সঙ্গে চূড়ান্ত সংঘাত হবে, সেটা হলো যুদ্ধ, জেহাদ, কেতাল। সেটার জন্য ন্যায়ের পক্ষে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পক্ষে এক নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্তা লাগবে, মদিনার মতো একটা স্বাধীন ভূখণ্ড ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো লাগবে। এই শর্তগুলো পূরণ হওয়ার পরই রসুলাল্লাহ সামরিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

ইসলামের নীতিই হচ্ছে, কেউ যদি নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে তাহলে তাকে নেতৃত্ব লাভের অযোগ্য বলে গণ্য করতে হবে। অথচ প্রচলিত রাজনৈতিক পদ্ধতিই হচ্ছে, নিজের জন্য মনোনয়নপত্র কিনতে হবে, পোস্টার টানাতে হবে, আত্মপ্রচার করতে হবে এমন কি ঘুষ দিয়ে ভোট কিনতে হবে। অর্থাৎ ইসলামের নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। রসুলাল্লাহ বলেছেন, **তোমরা যখন কারো ভিতর নেতৃত্ব পাবার বাসনা, আকাঙ্ক্ষা দেখ সে যেন কখনও তোমাদের মধ্যে নেতা না হতে পারে।**(১) সুতরাং এটা হচ্ছে প্রথম নীতি। যারা রাজনৈতিক ইসলামের কথা বলেন তারা এই নীতিটা ভঙ্গ করতে বাধ্য হন।

আল্লাহর রসুল কোনোদিন প্রতিপক্ষের সঙ্গে কোয়ালিশন করে, ভাগাভাগি করে ক্ষমতায় যান নি। তিনি যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেছেন, সন্ধি করেছেন। এই সবই তিনি করেছেন কাফেরদের সঙ্গে। কিন্তু সত্য ও মিথ্যাকে, ঈমান ও কুফরকে, দীন ও তাগুতকে তিনি কোনোদিন মিশ্রিত হতে দেন নি। তার নীতি ছিল, মিথ্যার সাথে কোনো আপস

---

১. হাদিসঃ আবু বুরাদা (রা.) থেকে বোখারি।

হবে না। কিন্তু ইসলামিক রাজনৈতিক দলগুলো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে কোনো পন্থা গ্রহণ করতে পারে। মানুষের অজ্ঞতাকে ব্যবহার করে, মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে ভুল খাতে প্রবাহিত করে কখনও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, কখনও গুজব রটনা করে, কখনও মিথ্যানির্ভর হুজুগকে কাজে লাগিয়ে ধর্মোন্মাদনা সৃষ্টি করে অর্থাৎ ছলে বলে কৌশলে যেভাবে পারে উদ্দেশ্য হাসিল করার চেষ্টা করে। এতে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বাছবিচার থাকে না।

রসুলাল্লাহর সমস্ত সংগ্রামের প্রতিপক্ষ ছিল কাফেরগণ। আজকে যারা নির্বাচনকে ‘এ যুগের জেহাদ’ বলে জনগণকে বিশ্বাস করাতে চান তাদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে এই ভোটযুদ্ধ তারা কার বিরুদ্ধে করছেন তাদের ধর্মীয় পরিচয় কী? **তারা কি মো’মেন না কাফের এটা আগে সুস্পষ্ট করতে হবে।** ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মো’মেনদের সংগ্রাম নিশ্চয়ই হবে কাফেরের বিরুদ্ধে। সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক ইসলামী আন্দোলনগুলো এ ক্ষেত্রে বড় কপটতার আশ্রয় নিয়ে থাকে। তারা প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের ধর্মীয় পরিচয়টি স্পষ্ট করে না। প্রতিপক্ষ ধর্মীয় মানদণ্ডে হয় মো’মেন হবে নয় তো কাফের হবে, তৃতীয় কোনো পথ খোলা নেই। প্রতিপক্ষ যদি মো’মেন-মুসলিম হয় তাহলে লড়াই হতেই পারে না, তাহলে উভয়েই ভ্রাতৃবিরোধী সংঘাতের দরুন ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। আর যদি কাফের হয় তাহলে কাফেরদের মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে ইসলামের যে নীতিগুলো আছে সেগুলো প্রযুক্ত হবে। মনে মনে তারা সেই প্রতিপক্ষ সেক্যুলার রাজনৈতিক দলগুলোকে তাগুত আর কুফরি শক্তি বলেই বিশ্বাস করেন, কিন্তু এ কথা তারা প্রকাশ্যে বলেন না, কারণ ও কথা বললে তো রাজনীতিই করা যাবে না। ক্ষমতার ভাগ পেতে তাদেরকে বিভিন্ন সেক্যুলার দলের লেজুড়বৃত্তি করতে হয়। কাফের ফতোয়া দিলে সেটা সম্ভব হবে না। **এই লেজুড়বৃত্তিকে জায়েজ করার জন্য তারা মক্কার কাফেরদের সঙ্গে রসুলাল্লাহর করা হোদায়বিয়ার সন্ধির উদাহরণ টেনে আনেন। তারা ভুলে যান যে, সেই সন্ধিটি হয়েছিল কাফেরদের সঙ্গে মো’মেনদের।** এখানে হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির প্রসঙ্গ টানার অর্থই হচ্ছে অপর পক্ষকে কাফের বলে সাব্যস্ত করা। এই আখ্যাটি তারা জনসমক্ষে দিতে পারেন না। তারা অন্তরে বিভেদ পুষে রেখে একই মসজিদে, একই ইমামের পেছনে নামাজ পড়েন। নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হয়েই তারা একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হন। কিন্তু রসুলাল্লাহর সময় এই মো’মেন ও কাফেরের বিভাজনটা স্পষ্ট ছিল। যারা মোমেন তারা ছিলেন ভাই-ভাই, এক নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ। নামাজের সময় তারা যেমন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতেন তেমনি বাস্তব জীবনেও তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাদের কাছে কে মো’মেন কে কাফের এ বিভাজন প্রকাশ্য ও স্পষ্ট ছিল। মক্কার কাফেরদের সঙ্গে মো’মেনগণ কি এক জামাতে নামাজ পড়তেন, একসঙ্গে হজ্ব করতেন? প্রশ্নই আসে না।

আজকে ক্ষমতার মোহে পড়ে, ক্ষমতার চর্চা করতে গিয়ে সেক্যুলার দলগুলো যে সব দুষ্কর্ম করছে সেই দুষ্কর্মগুলোতে ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোও লিপ্ত হতে বাধ্য

হয়েছে। কারণ প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে এছাড়া উপায় নেই। কিন্তু এদেরকে এই দুষ্কর্মগুলো করতে হচ্ছে ইসলামের নাম দিয়ে, হেকমতের দোহাই দিয়ে। বিষয়টি একটু পরিষ্কার করছি। প্রকৃত ইসলাম তেরশ' বছর আগে হারিয়ে গেছে। আজ 'মুসলিম' অমুসলিম সব জাতিগুলোই পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, আইন-কানুন, দর্শনের প্রভাবাধীন। ইহুদি খ্রিষ্টান 'সভ্যতা'র প্রচণ্ড প্রভাব সমস্ত পৃথিবীকে এমন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে, পৃথিবীর সমস্ত জাতিগুলি ব্যক্তিজীবনে যাই বিশ্বাস করুক সমষ্টিগত জীবনে অন্ধভাবে ঐ সভ্যতার নকল করছে। শুধুমাত্র মুসলিম জাতির মধ্যে কতকগুলি সংগঠন ছাড়া অন্য কোনো জাতি ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতার সমষ্টি জীবনের ব্যবস্থা অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইন-কানুন ইত্যাদি প্রত্যাখ্যান করে নিজস্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছে না। এই মুসলিম জাতির ভেতর যে সংগঠনগুলো সে চেষ্টা করছে সেগুলোর কোনো কোনোটির অনুসারী কোটির উপরে, আবার কোনো কোনোটি খুবই ছোট। কিন্তু ছোট বড় কোনোটাই ঐ ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতার জীবন-দর্শনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সাম্যবাদ, অর্থাৎ কমিউনিজম যখন মহাপরাক্রমশালী, তখন ইসলামকে প্রতিষ্ঠার জন্য যে সব প্রচেষ্টা করা হয়েছিল তাতে সাম্যবাদও সমাজতন্ত্রের সাথে ইসলামের সাদৃশ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করা হতো। ঐ প্রচেষ্টায় কোর'আনের বিশেষ বিশেষ আয়াতগুলিকে প্রধান্য দেয়া হতো, যেগুলোতে আল্লাহ নিজেকে আসমান-জমীনের সব কিছুর মালিক বলে ঘোষণা করছেন। উদ্দেশ্য- সব কিছুর মালিকানা যখন আল্লাহর তখন সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের মত ইসলামেও ব্যক্তি মালিকানা নেই। বিশ্বনবীর (দ.) লক্ষ সাহাবাদের মধ্য থেকে বেছে নেয়া হলো আবু যরকে (রা.) একমাত্র আদর্শ বলে, কারণ, তার ব্যক্তিগত মতামতের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের দর্শনের কিছুটা মিল ছিল। সমাজতন্ত্রের সাথে ইসলামের এত যখন মিল তখন সৃষ্টি করা হলো ইসলামিক সমাজতন্ত্র। প্রায় তিনটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশেই এই ইসলামিক সমাজতন্ত্রের সংগঠন হয়েছিল এবং পাকিস্তানের যুলফিকার আলী ভুট্টোর ইসলামিক সমাজতান্ত্রিক (পি.পি.পি) দলসহ কয়েকটি দেশে কিছু দিনের জন্য সরকারও গঠন করেছিল। তারপর সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার কারণে যখন সেগুলো ম্লান হয়ে গেল তখন ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র জোরদার হয়ে উঠেছে। এখন চেষ্টা চলছে প্রমাণ করতে যে ইসলাম গণতান্ত্রিক, নাম দেয়া হচ্ছে ইসলামিক গণতন্ত্র। সেই আগের মতই কোর'আন থেকে বেছে বেছে আয়াত নেয়া হচ্ছে। ইহুদি-খ্রিষ্টান পদ্ধতির সঙ্গে আপসকে অর্থাৎ শেরক ও কুফরের সঙ্গে আপসকে যথার্থ প্রমাণের চেষ্টায় মহানবীর (দ.) মদিনায় ইহুদি ও মোশরেকদের সঙ্গে চুক্তির ঘটনা উপস্থিত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে প্রয়োজনে আল্লাহর রসুলও (দ.) মদিনার ইহুদি ও মোশরেকদের সঙ্গে আপস করেছিলেন। এর নাম এরা দিয়েছেন হেকমত। যে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্ব আল্লাহ নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠের, সেই ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে সেই পদ্ধতিতে রাজনীতি করে এবং সেই পদ্ধতির নির্বাচনে অংশ নিয়ে নিজেদের কাজকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টায় এরা এমন অন্ধ হয়েছেন যে, আপস ও চুক্তির মধ্যে বিরাট তফাৎ দেখতে পান না। আকিদা

বিকৃতির জন্য ইসলামের প্রকৃত রূপ, অগ্রাধিকার এ সব এরা বোঝেন না বলে বিশ্বনবীর (দ.) ইহুদি ও মোশরেকদের সঙ্গে চুক্তিকে তাদের নিজেদের শেরক ও কুফরের সাথে আপসের সঙ্গে একই পর্যায়ে ফেলেছেন। আপস হলো কিছু দেয়া কিছু নেয়া, বিরুদ্ধ পক্ষের কিছু দাবি মেনে নেয়া ও নিজেদের কিছু দাবি বিরুদ্ধ পক্ষকে মেনে নেয়ানো। মদিনার চুক্তিতে বিশ্বনবী (দ.) বিরুদ্ধ পক্ষের অর্থাৎ ইহুদি ও মোশরেকদের পদ্ধতির (System) একটি ক্ষুদ্রতম কিছুও মেনে নেন নি, ইসলামের জীবন-ব্যবস্থার, দীনের সামান্য কিছুও তাদের উপর চাপান নি। কারণ তিনি আপস করছিলেন না। তিনি মদিনা রক্ষার জন্য শুধু একটি নিরাপত্তা চুক্তি (Security Treaty) করছিলেন। সম্পূর্ণ চুক্তিটির উদ্ধৃতি এখানে দিতে গেলে বই বড় হয়ে যাবে, শুধু প্রধান প্রধান শর্তগুলো পেশ করছি -

(ক) মদিনা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে ইহুদি ও মোশরেকরা মুসলিমদের সঙ্গে একত্র হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

(খ) যুদ্ধে ইহুদি ও মোশরেকরা তাদের নিজেদের খরচ বহন করবে, মুসলিমরা নিজেদের খরচ বহন করবে, যত দিনই যুদ্ধ চলুক।

(গ) ইহুদি ও তাদের সমগোত্রের লোকজন রসুলাল্লাহর (দ.) অনুমতি ছাড়া কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না।

(ঘ) এই চুক্তির অধীন সমস্ত গোত্রগুলির মধ্যে যে কোন প্রকার বিরোধ বা গণ্ডগোল যাই হোক না কেন সমস্ত বিচার মহানবীর (দ.) কাছে হতে হবে।

এই কয়টিই হলো মহানবীর (দ.) ও মদিনার ইহুদি-মোশরেকদের মধ্যে চুক্তির প্রধান প্রধান (Salient) বিষয়, যে চুক্তিটাকে মদিনার সনদ বলা হয়। চুক্তির ঐ প্রধান প্রধান বিষয়গুলির দিকে মাত্র একবার নজর দিলেই এ কথায় কারো দ্বিমত থাকতে পারে না যে, বিন্দুমাত্র ত্যাগ স্বীকার না করেও মহানবী (দ.) এমন একটি চুক্তিতে ইহুদি ও মোশরেকদের আবদ্ধ করলেন- যে চুক্তির ফলে তিনি কার্যত (De Facto) মদিনার ইহুদি ও মোশরেকদের নেতায় পরিণত হলেন। তাদের নিজেদের যুদ্ধের খরচ নিজেরা বহন করে মহানবীর (দ.) অধীনে মুসলিমদের সঙ্গে একত্র হয়ে যুদ্ধ করার, মহানবীর (দ.) বিনা অনুমতিতে কারো সঙ্গে যুদ্ধ না করার ও নিজেদের মধ্যেকার সমস্ত রকম বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারের ভার মহানবীর (দ.) হাতে ন্যস্ত করার শর্তে আবদ্ধ করে তিনি যে চুক্তি করলেন তা নিঃসন্দেহে একাধারে একটি রাজনৈতিক, কুটনৈতিক ও সামরিক বিজয়। মদিনা রক্ষার ব্যবস্থা তো হলোই, তার উপর তিনি কার্যত মুসলিম-অমুসলিম সকলের নেতায় পরিণত হলেন। যারা ‘হেকমতের’ দোহাই দিয়ে রসুলাল্লাহ ও আসহাবগণের করে যাওয়া সর্বাত্মক সংগ্রামের পথ ‘জেহাদ’ ত্যাগ করে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক পদ্ধতি গ্রহণ করে মিটিং, মিছিল, শ্লোগান দিয়ে, মানুষের সার্বভৌমত্বের সংগঠনের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন, কিন্তু বিনিময়ে অপর পক্ষ থেকে বিন্দুমাত্র প্রতিদান

বা ত্যাগস্বীকার পান নি, তারা কেমন করে তাদের ঐ শেরক ও কুফরের কাজকে বিশ্বনবীর (দ.) ঐ মহা বিজয়ের সঙ্গে একই পর্যায়ে ফেলে তাকে ছোট করেন তা বোঝা সত্যিই মুশকিল।

রাজনৈতিক ইসলামের নেতৃবৃন্দের হেকমতের কোনো শেষ নেই। তারা মাঠে ময়দানে যাদের বিরুদ্ধে গলা ফাটান, ইসলমাবিরোধী, তাগুতশক্তি ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে থাকেন, ভিতরে ভিতরে সেই প্রতিপক্ষের নেতৃবৃন্দের সাথে গভীর আত্মীয়তা ও ব্যবসায়িক সম্পর্কও তৈরি করেন। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, যেন ক্ষমতার পালাবদলে তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন না হয়। বিশেষ বেকায়দায় পড়লে প্রতিপক্ষের দলে যোগদান করতে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। প্রয়োজনে দলে নামও পাল্টে ফেলেন, আদর্শের মধ্যেও রদবদল করেন। এহেন ধাপ্পাবাজির রাজনীতিকে 'ইসলাম' বলে চালিয়ে দেওয়া আল্লাহ ও রসুলের উপর ন্যাক্কারজনক অপবাদ আরোপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব কর্ম অন্যদের বেলায় খাটে, কিন্তু ইসলামের বেলায় খাটে না। এবং আল্লাহ বলেন, তার চেয়ে বড় জালেম কে যে আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করে?(১) তারা আজ যেটাকে 'পাক্কা হারাম' বলছেন কাল সেটাকেই রাজনৈতিক ফায়দা নিতে 'হালাল' বানিয়ে ফেলেন। আজকে তারা যাকে 'ফেরাউন' বলেন, কালই তার সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে আন্দোলন বা নির্বাচন করেন। **তাদের দলে অনেক জনপ্রিয় খ্যাতিমান মোফাসসিরে কোর'আন, মুহাদ্দিস, মুফতি ও ইসলামী বিশেষজ্ঞ থাকেন যারা দলের প্রয়োজনমাফিক শরিয়তের নবতর ব্যাখ্যা হাজির করতে খুব পারদর্শী। তাদের ব্যাখ্যা জনগণ কতটুকু গ্রহণ করে জানি না, তবে দলের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা সেগুলোকেই 'ইসলাম' বলে অন্ধভাবে মেনে নেন।**

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো রাজনৈতিক ইসলামকে এতদিন সহ্য করে এসেছে, সৌদি আরবের মতো ধর্মব্যবসায়ী রাষ্ট্র তাদের সালাফি/ওয়াহাবি মতবাদের বিস্তার ঘটানোর জন্য আধ্যাত্মিকতাহীন কেবল ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক চিন্তায় ব্যাপৃত একটি বিকৃত ইসলামকে মদদ দিয়ে এসেছে। অনেকে স্বপ্ন দেখেছে যে এই পথে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হতেও পারে। কিন্তু এক শতাব্দী হয়ে গেল প্রায়, কোথাও কোনো সফলতার দৃষ্টান্ত মিলল না, ফলে রাজনৈতিক ইসলাম তত্ত্ব বা থিয়োরি হিসাবে কেতাবের পাতায় রয়ে গেল। তাদের দরকার ফুরিয়েছে বলেই পশ্চিমারা নতুন করে জঙ্গিবাদের জন্ম দিয়েছে। ১৬০ কোটি মুসলমানকে কান ধরে উঠ বস করাতে এই জঙ্গিবাদ ইস্যুটিই যথেষ্ট। তাই সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহনকারী আরব দেশগুলো এখন জঙ্গিবাদ বিস্তারে অর্থ ঢালছে। ব্যর্থ হয়ে যাওয়া পলিটিক্যাল ইসলামের অনেক কর্মী সেইসব জঙ্গিদলগুলোয় যোগ দিচ্ছে। সরকারের দমনপীড়নে, মামলা- মোকাদ্দমার চাপে পড়ে অনেকে মরিয়া হয়ে জঙ্গিবাদী হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা আরো বড় পথভ্রষ্টতা এবং ইসলামের জন্য আরো বড়

---

১. আল কোর'আন: সুরা ইউনুস ১৭।

ক্ষতিকর পন্থা। ইসলামের সামগ্রিক রূপ সম্পর্কে যাদের সঠিক ও সম্যক ধারণা (Comprehensive Concept) রয়েছে তারা সহজেই এই ভ্রান্তপথগুলোকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন।

এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম, তার সারকথা হচ্ছে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে জঙ্গিবাদও একটি পথভ্রষ্টতা, প্রচলিত রাজনৈতিক ইসলামও একটি পথভ্রষ্টতা। ইসলামের বিজয়প্রত্যাশীরা কেউ এই ভুলপথে পা বাড়াচ্ছে, কেউ অন্য ভুল পথে পা বাড়াচ্ছে। **তাদের সবার ধর্মবিশ্বাসই লুটপাট হচ্ছে, অপব্যবহৃত হচ্ছে। তারা না পচ্ছেন দুনিয়া, না পাচ্ছেন আখেরাত।** তাদের ধর্মবিশ্বাস মানুষের অকল্যাণে ব্যবহৃত হওয়ার দরুন মানবতার কল্যাণার্থে আগত ইসলামের বদনাম হচ্ছে, আল্লাহ রসুলের বদনাম হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, মানবজীবনে চলমান বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র, বাদ-মতবাদের ব্যর্থতার পর ইসলামকে বিকল্প জীবনব্যবস্থারূপে গ্রহণ করার যে সম্ভাবনা ছিল সেটাও সুদূরপরাহত হয়ে যাচ্ছে ধর্মের নামে এসকল অপকর্মের ফলে। পৃথিবীর সর্বত্র একপ্রকার ইসলামভীতি (Islamophobia) চালু করে দেওয়া হচ্ছে।

এখন আমাদের কথা হচ্ছে, যারা ইসলামকে বিজয়ীরূপে দেখতে চান এবং বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামকে গ্রহণযোগ্য ও সার্বজনীন আদর্শরূপে উপস্থাপন করতে চান তাদের একটাই করণীয়, তাদের সবাইকে এই সত্যটি স্বীকার করে নিতে হবে যে, আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত ইসলাম ১৩ শ' বছরে বিকৃত হতে হতে একেবারে বিপরীতমুখী হয়ে গেছে। পুরো জাতি আল্লাহর তওহীদ থেকে, আল্লাহর হুকুম থেকে বিচ্যুত হয়ে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার দাসে পরিণত হয়েছে। এখন এ অবস্থা থেকে ফেরার জন্য একেক দল একেকটি পথ নির্মাণ করে নিচ্ছে এবং সেই সব পথের দিকে অন্যদেরকেও আহ্বান করছে। **কিন্তু যে মহাসড়ক, যে রাজপথটি রসুল নির্মাণ করে গেছেন সেই রাজপথটি ছিল তওহীদের উপর নির্মিত যার নাম সেরাতুল মোস্তাকীম- সহজ সরল পথ।** আজ কেউই সেই পথে উঠছেন না। তারা একেক দল একেকটি রজ্জুকে ধারণ করেছেন কিন্তু ধারণ করতে হবে আল্লাহর রজ্জু, আর সেটা হচ্ছে তওহীদ। তাদের সবাইকে এখন আল্লাহর তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যেনতেন ঐক্য নয়, নির্বাচনকালীন জোট নয় -- ইস্পাতকঠিন ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দল-মত-তরিকা-ফেরকা-মাজহাব নির্বিশেষে একটি মহাজাতি গড়ে তুলতে হবে। আর সাধারণ মানুষকেও সেই তওহীদের সঠিক অর্থ কী, দাবি কী, অঙ্গীকার কী সেটা তাদের মাতৃভাষায় বোধগম্য করে বোঝাতে হবে। পাশাপাশি রসুলাল্লাহর রেখে যাওয়া সেই পাঁচ দফা কর্মসূচিকে নিজেদের জীবনে ধারণ করে সত্যদীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করতে হবে। তাহলে তারা হবেন মো'মেন, আল্লাহর সাহায্যের অঙ্গীকার তখন তাদের জন্য সত্য হবে। আর যারা আল্লাহ সাহায্য প্রাপ্ত হয় তাদেরকে কেউ

পরাভূত করতে পারে না। জনগণ যদি আল্লাহর হুকুমের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে তাদের চাওয়ার প্রতিফলন হিসাবে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে তওহীদভিত্তিক একটি সভ্যতা। সেই সভ্যতার আলোয় মানবজীবনের প্রতিটি অঙ্গন আলোকিত ও সুখী হবে। সেই অনাবিল সুখ ও শান্তির নামই ইসলাম- আক্ষরিক অর্থেই শান্তি।

জাতীয় জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী দলগুলোর এমন অগণিত আন্তরিক কর্মী আছেন যাদের ত্যাগ সত্যিকার অর্থেই উদাহরণযোগ্য। ইসলামের জন্য তারা যে কোনো মুহূর্তে জীবন পর্যন্ত কোরবান করতে প্রস্তুত। তাদের উদ্দেশে আমরা সবিনয়ে দুটো কথা বলতে চাই।

প্রথম কথাটি হচ্ছে, ইসলাম হলো আল্লাহর দেওয়া দীন, এর নাম আল্লাহ দিয়েছেন সেরাতুল মোস্তাকীম বা সহজ-সরল পথ। সৃষ্টির সূচনালগ্নেই আল্লাহর সঙ্গে ইবলিসের যে চ্যালেঞ্জ হয়েছিল সেখানে ইবলিস বলেছিল যে, সে এই সেরাতুল মোস্তাকীমে মানুষকে থাকতে দেবে না, সে এই জীবনপদ্ধতিটি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে দেবে না। সে এই পথের ডানে-বামে, উপরে-নিচে ওঁৎ পেতে বসে থাকবে এবং মানুষকে আক্রমণ করে এই মহান পথ থেকে সরিয়ে দেবে। কাজেই সত্যদীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মানুষকে এমন এক প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করতে হবে যাকে সে দেখতেই পায় না, যে বিভিন্ন রূপে এসে মানুষকে প্রতারিত করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সুতরাং এই শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়ী হতে হলে আল্লাহর সাহায্য তার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি দিয়েই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ কাকে সাহায্য করবেন?

আল্লাহ সাহায্য করবেন কেবল তাকেই যে মো'মেন। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ যত ওয়াদা করেছেন সব মো'মেনদের জন্য, তাঁর সকল সাহায্যও মো'মেনদের জন্যই। তিনি বলেছেন, তোমরা নিরাশ হয়ো না, দুঃখ করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মো'মেন হও।(১) মো'মেন কে সেটাও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, "মো'মেন শুধুমাত্র তারাই যারা আল্লাহ ও রসুলের প্রতি ঈমান আনে, অতঃপর কোনো সন্দেহ করে না এবং সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ (সর্বাত্মক সংগ্রাম) করে। তারাই হচ্ছে সত্যনিষ্ঠ।(২) কাজেই যারা তওহীদের উপর অটল থেকে সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন-সম্পদ সব উজাড় করে দিয়ে সংগ্রাম করবে তারাই হলো মো'মেন। আল্লাহর সাহায্য শুধু তাদের জন্যই।

ইসলাম আজকে হাজারো রূপ নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। জাতি রসুলাল্লাহর ভাষায় তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে। এর যে কোনো একটি

---

১. কোর'আন: সুরা ইমরান ১৩৯

২. কোর'আন: সুরা হুজরাত ১৫

ফেরকা বা রূপকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম করলেই কি মানুষ আল্লাহর দৃষ্টিতে মো'মেন হয়ে যাবে আর আল্লাহও সাহায্য করতে শুরু করে দিবেন? অবশ্যই না। কোন ফেরকাকে তিনি সাহায্য করবেন? যারা আল্লাহর নাজেল করা সেই প্রকৃত ইসলামের অনাবিল রূপটিকে বিশ্বময় প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করবে তারাই আল্লাহর দৃষ্টিতে মো'মেন বলে পরিগণিত হবেন। আর আল্লাহর নাজেল করা সেই সত্য ইসলামটিকে প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ সাহায্য করবেন। এটাই হলো জান্নাতি ফেরকা। ইবলিসের প্ররোচনায় পড়ে মুসলমান জাতি এখন হাজারো ফেরকা মাজহাবে তরিকায় বিভক্ত হয়ে যার যার ইচ্ছামত ইসলাম পালন করছে। সেই পথগুলো ইবলিসের পথ, সেগুলো সেরাতুল মোস্তাকীম নয়। সেগুলো প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যতই সর্বস্ব কোরবান করি না কেন, যতই পাগলপারা হই না কেন সেখানে আল্লাহর কোনো সাহায্য আমরা পাবো না। কথা হলো, আজকে যারা ইসলামকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করছেন তারা যে ইসলামটিকে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন সেটা আল্লাহ-রসুলের সেই প্রকৃত ইসলাম নয়, সেটা তেরশ বছরের বিকৃতির ফসল। সেই বিকৃত কী করে হলো সেটা পেছনে বারবার বলে এসেছি। যে ইসলামটি ১৪শ' বছর আগে অর্ধেক দুনিয়ার মানুষের মন জয় করে নিয়েছিল, যে ন্যায়বিচার ও সাম্যের পরিচয় পেয়ে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অধিকারহারা, দলিত মানুষ দলে দলে বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে ইসলামকে আলিঙ্গন করে নিয়েছিল, আইয়্যামে জাহেলিয়াতের বর্বর মানুষগুলো যে পরশপাথরের ছোঁয়ায় রাতারাতি সোনার মানুষের পরিণত হয়েছিল সেই ইসলাম আজ এই সংগঠনগুলোর কাছে নেই। এগুলো হলো ফেকাহ-তাফসির নিয়ে কূটতর্কের ইসলাম, জটিল মাসলা-মাসায়েলের ইসলাম, ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা স্বার্থের প্রয়োজনে শতভাবে বিকৃত ইসলাম।

তৃতীয়ত, আল্লাহ তাঁর রসুলকে সমগ্র পৃথিবীতে সত্য প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে একটি নিখুঁত ও শ্বাশ্বত কর্মসূচি দান করেছেন। শাশ্বত বললাম এই জন্য যে, আল্লাহর রসুল এই কর্মসূচিটি বর্ণনা করার পূর্বেই বলে নিয়েছেন, "আল্লাহ আমাকে পাঁচটি কাজের আদেশ করেছেন। আমিও তোমাদেরকে সেই পাঁচটি কাজের জন্য আদেশ করছি।" তাহলে এই পাঁচটি কাজ কী? সেট হলো- আল্লাহর রসুল বললেন, "(১) তোমরা ঐক্যবদ্ধ থাকবে, (২) তোমরা সুশৃঙ্খল থাকবে, তোমাদের নেতার আদেশ শুনবে, (৩) তোমাদের নেতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে, (৪) সকল শেরক-কুফরকে পরিত্যাগ করবে অর্থাৎ হেজরত করবে, (৫) আল্লাহর রাস্তায় জীবন ও সম্পদ দিয়ে জেহাদ (সংগ্রাম) করবে।

এই কর্মসূচিটির বাইরে ইসলাম নেই। যে যত বড় সংগঠনই করুক না কেন, সংগঠন যতই প্রাচীন হোক না কেন, তাদের জনসমর্থন যত বেশিই হোক না কেন, এই কর্মসূচি হচ্ছে রসুলের কর্মসূচি যা তিনি উম্মাহর উপর অর্পণ করে গেছেন, এই

কর্মসূচিকে গ্রহণ না করে, নিজেদের মনগড়া কর্মসূচি বানিয়ে নিয়ে কোনোভাবেই আল্লাহর দৃষ্টিতে মো'মেন হওয়া সম্ভব নয়, সাহায্যের উপযুক্ত হওয়াও সম্ভব নয়। এটা আমাদের কথা নয়, স্বয়ং রসুল এই হাদিসটিতে পাঁচটি কাজের তালিকা বলার পর বলছেন, "যারা এই ঐক্যবন্ধনী থেকে আধহাত পরিমাণও বহির্গত হয়ে যাবে তাদের গলদেশ থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যারা জাহেলিয়াতের কোনো কিছুর দিকে আহ্বান করবে (অর্থাৎ ভিন্ন কর্মসূচির দিকে বা ভিন্ন মতবাদের দিকে) তারা জাহান্নামের জ্বালানি পাথর হবে, যদিও তারা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এমন কি নিজেদেরকে মুসলিম বলে বিশ্বাসও করে।(১)

যে কর্মসূচি আল্লাহ দেন নি সেই কর্মসূচির অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ বিজয় প্রদান করতে, সাহায্য প্রদান করতে দায়বদ্ধ নন, তিনি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে দায়বদ্ধ তাঁর প্রদত্ত কর্মসূচির অনুসারীদের প্রতি। আমাদের ভুললে চলবে না, রসুলাল্লাহর জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যবাহী দিন হচ্ছে মক্কাবিজয়ের দিন। সেই মহাবিজয়ের দিনে তিনি তাঁর সাহাবিদের উদ্দেশে যে ভাষণ দিয়েছেন সেখানে তিনি বলেছিলেন, "এই যে বিজয় তোমরা দেখছ, এটা আল্লাহ একা করেছেন। আল্লাহ একা করেছেন।" সেই বিজয়ের পেছনে রসুলাল্লাহর কত রক্ত গেছে, কত সাহাবীদের শহীদ হতে হয়েছে, কী পরিমাণ নির্যাতন নিপীড়ন তাঁরা সয়ে তিলে তিলে এই বিজয়ের দিনটি নির্মাণ করেছে সবই আমরা জানি। কিন্তু রসুলাল্লাহ তাঁর ও তাঁর সাহাবিদের কোনো ত্যাগের কথা, কোনো অবদানের কথাই স্বীকার করলেন না, বললেন "আল্লাহ একা করেছেন।" হ্যাঁ। এটাই সত্য। আল্লাহ যদি তাঁকে এই সংগ্রামে সাহায্য না করতেন, তাহলে উম্মাহর এই বিজয় স্বপ্নই থেকে যেত। কারণ নব্যুয়তের প্রথম দিন থেকে শুরু করে ঐ দিন পর্যন্ত এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যেখানে গোটা জাতিই ধ্বংসের উপক্রম হয়েছিল। হিজরতে আল্লাহর সাহায্য, বদরে আল্লাহর সাহায্য, আহযাবের দিন আল্লাহর সাহায্য, হোদায়বিয়ার সন্ধিতে আল্লাহর সাহায্য যদি না থাকতো তাহলে উম্মাহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কাজেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো ইসলামি আন্দোলন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, তাদের পাহাড়প্রমাণ ত্যাগ থাকলেও পারবে না।

তবে হ্যাঁ, কোনো কারণে কোনো ভূখণ্ডে যদি রাজনৈতিক, যুদ্ধাবস্থা বা আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে এমন পরিস্থিতি (Circumstence) হয় যে কোনো একটি ইসলামি দল বা জোট ক্ষমতায় যেতে পারল (They could to do it) (যেমনটা আফগানে হয়েছিল, ইরাক সিরিয়ার কিছু অংশে হয়েছিল, তিউনেশিয়া, মিশরে হয়েছিল), কিন্তু সেই ক্ষমতায় তারা টিকতে পারবে না। কারণ বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে এখন দাজ্জাল অর্থাৎ পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতা যার অন্যতম লক্ষ্যই হলো ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। তারা ইসলামি দল বা জোটকে ক্ষমতায় থাকতে দেবে না, নির্বাচনে জিতে আসলেও দেবে না,

---

১. হাদিস- আল হারিস আল আশয়ারি (রা.) থেকে আহমদ, তিরমিজি, বাব-উল-ইমারত, মেশকাত

সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় গেলেও দেবে না। এই দলগুলো যে কয়দিন ক্ষমতার চর্চা করতে পেরেছে, তাদের হাতে থাকা শরিয়তের শাসন কায়েম করেছে ততদিন কি মানুষ ইসলামের শান্তি লাভ করেছে? ইসলামি দলগুলোয় যোগ দেওয়ার জন্য ঐ সব এলাকার নর-নারীদের মধ্যে বাঁধভাঙা জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে? না। বরং উল্টো হয়েছে। মানুষ তাদের চাপিয়ে দেওয়া 'ইসলাম'কে প্রত্যাখ্যান করেছে। নিরাপত্তা ও শান্তির পরিবর্তে তারা ভীত ও আতঙ্কিত হয়েছে। এর কারণ কী এ প্রশ্ন করলে তার সোজা উত্তর হলো, ওটা আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত ইসলাম নয়। তাদের ঐ 'ইসলাম' দেখে ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিম তো বটেই মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেও একটি বিরাট অংশ বিদ্বেষপ্রবণ হয়ে উঠেছে যার পেছনে কেবল পাশ্চাত্যের প্রোপাগান্ডাই একচেটিয়াভাবে দায়ী নয়, এর দায় ঐ ইসলামী দলগুলোর ধর্মান্ধতা, বিকৃত আকিদা, অপ্রয়োজনীয় বা ছোটখাটো বিষয়কে মহা গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা, পক্ষান্তরে মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে একেবারে গুরুত্বহীন করে ফেলা, শরিয়তের বাড়াবাড়ি, জবরদস্তি, ফতোয়াবাজি, শিল্প-সংস্কৃতির বিরুদ্ধবাদিতা, নারীদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, বিধর্মী ও ভিন্নমতের সঙ্গে বর্বর নৃশংসতার প্রদর্শনী ইত্যাদিও সমধিক দায়ী।

অথচ হওয়া উচিত ছিল সম্পূর্ণ উল্টোটা অর্থাৎ মানুষ দলে দলে সত্যকে আলিঙ্গন করে নেবে এবং তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামের সৌন্দর্যকে পুষ্পিত করে তুলবে। সেটা হয় নি কারণ ১৪ শ' বছর আগের সেই ইসলাম তাদের কাছে নেই। তাই তারা পুরো পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে হত্যা করেও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, তাদের কোরবানি যতই বৃহৎ হোক, নিয়ত যতই সহীহ হোক, নিজেদেরকে তারা যতই শহীদ মনে করুক।

আমাদের এই কথা যদি তাদের বিশ্বাস না হয় তাহলে তারা কয়েক শত বছর ধরে যেমন চেষ্টা করে যাচ্ছেন তেমনিভাবে আরো হাজার বছর সবাই মিলে চেষ্টা করে দেখতে পারেন, কিন্তু কোনো লাভ হবে না। কারণ তারা যে ইসলামটিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছেন সেটাও আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত ইসলাম নয়, এমন কি তাদের অনুসৃত কর্মসূচিও আল্লাহর দেওয়া কর্মসূচি নয়। এই কারণে আল্লাহর সাহায্য তাদের সঙ্গে নেই। এখন আল্লাহর সাহায্য লাভ করতে হলে তাদেরকে মো'মেন হতে হবে, ইসলামের প্রকৃত আকিদাকে ধারণ করতে হবে, সমস্ত দুর্ভাগ্যজনক ফেরকা মাজহাব ভুলে তওহীদের উপর ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, তারপর বাকি মানবজাতিকে সেই তওহীদের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাতে হবে। অতঃপর আল্লাহর দেওয়া যে কর্মসূচি রসুলাল্লাহ নিজে অনুসরণ করে গেছেন এবং তাঁর নিজ হাতে গড়া উম্মাহকে দান করে গেছেন সেই কর্মসূচির মাধ্যমে সংগ্রাম পরিচালিত করতে হবে, নিজেদের জীবন ও সম্পদ সেই সঠিক পথে ব্যয় করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

ধর্মব্যবসা থেকে মুক্তির পথসন্ধান

বর্তমানে গোটা মুসলিম বলে পরিচিত জনগোষ্ঠীর বিরাট একটি অংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ধর্মব্যবসার মতো আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত একটি অনৈতিক কাজে লিপ্ত আছে। কেউ ধর্মব্যবসা করে খাচ্ছেন, কেউ তাকে দিচ্ছেন, কেউ মৌন থেকে সম্মতি দিয়ে যাচ্ছেন। এভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় সবাই এই অবৈধ কাজের সাথে জড়িয়ে আছেন। প্রশ্ন হচ্ছে কীভাবে আমরা এই অন্যায় থেকে আমাদের সমাজকে মুক্ত করতে পারব?

শত শত বছর থেকে যখন একটি সিস্টেম, ব্যবস্থা কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে দাঁড়িয়ে যায় তখন এর সাথে বহু প্রতিষ্ঠান, বহু মানুষের জীবন ও কর্মসংস্থান জড়িয়ে যায়। তখন হুট করেই সেই ব্যবস্থাটি থেকে বেরিয়ে আসা খুব সহজ বিষয় হয় না। তবু একটি জাতিবিধ্বংসী অন্যায় চিহ্নিত হওয়ার পরও চিরকাল চলতে পারে না। একে বন্ধ করার জন্য সর্বাত্মক সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। হাজার প্রকার ধর্মব্যবসা আজ এভাবেই দৃঢ়মূল বৃক্ষের ন্যায় আমাদের সমাজের সর্ব অঙ্গনে শিকড় গেড়ে ফেলেছে। এই বিষবৃক্ষকে মূল থেকে উপড়ে ফেলতে হবে। সেজন্য আমাদের দুটো বিষয় করণীয়।

প্রথম করণীয় হলো, এটা বোঝা যে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষার উদ্ভাসন ছাড়া ধর্মের এই অপব্যবহার বন্ধ হবে না। যেহেতু ধর্মব্যবসা ধর্মের নামে হয়, সেহেতু ধর্মীয় দলিল দিয়েই একে আদর্শিকভাবে প্রতিহত ও পরাভূত করতে হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ, নবী-রসুল, সাহাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি দলিল ও যুক্তি সহকারে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সেগুলোর পাল্টা আদর্শ (Counter Narrative) পত্র-পত্রিকা, পাঠ্যপুস্তক, টেলিভিশনসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা প্রচার ব্যতীত এই সঙ্কট থেকে জাতি মুক্তি পাবে না। তাই ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি দলিল প্রমাণ ও যুক্তি সহকারে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সেগুলো পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশনসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। শত শত বছর ধরে এই মহাসত্যকে আড়াল করে মানুষকে অজ্ঞ বানিয়ে ধর্মব্যবসা টিকিয়ে রাখা হয়েছে। এখন সেই লুকানো

সত্যকে সহস্রধারায় মানুষের দৃষ্টির সামনে মেলে ধরতে হবে। মানুষ সৃষ্টিগতভাবে যুক্তিশীল প্রাণী (Rational Being)। তাই কোনো যৌক্তিক সত্যকে সে গ্রহণ না করে পারবে না। সাধারণ মানুষ যখন ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে সচেতন হবে তখন তাদের এই মানসিক ঐক্যই তাদের সমাজে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করবে। যে সমাজের প্রতিটি মানুষ ধর্মব্যবসাকে ঘৃণা করে সেই সমাজে কখনওই ধর্মব্যবসা টিকে থাকতে পারবে না। অন্ধকার দূর করার একমাত্র পথ হচ্ছে আলোর আবির্ভাব ঘটানো। ধর্মব্যবসা সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষই জানে না। তাদের সামনে সত্যের আলোকবর্তিকা যখন প্রজ্বলিত করা হবে তখন তাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার কেটে যাবে। ধর্মব্যবসা নির্মূল হলেই ধর্মান্ধতা, ধর্মের অপব্যবহার, কুসংস্কার, জঙ্গিবাদ সমস্তকিছু নির্মূল হবে। কারণ এটাই ধর্মের নামে প্রচলিত যাবতীয় বিকৃতির উৎসমূল।

ইতোমধ্যে জাতি জঙ্গিবাদের মতো ভয়াবহ সঙ্কটে আক্রান্ত হয়ে গেছে যে সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসা এত সোজা নয়। একটি ঘটনা হাজারো ঘটনার জন্ম দেয়, একটি যুদ্ধ বহু যুদ্ধের পটভূমি তৈরি করে। প্রথম অন্যায়ের পরে পরবর্তী অন্যায়গুলো সংঘটনের ন্যায্যতা পেয়ে যায়। কাজেই জঙ্গিবাদ থেকে বেরিয়ে আসা এত সহজ নয়, কেননা জঙ্গিবাদের পক্ষে অনেক যুক্তি দাঁড়িয়ে গেছে যা আপাতঃদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এরই মধ্যে গুজব, হুজুগ, উন্মাদনা সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিভিন্ন দাবি আদায়ের নামে অসার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী। সাম্রাজ্যবাদীরা ওঁৎ পেতে আছে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য যেমনটা হয়েছিল সিরিয়া, ইরাক, মিশর ইত্যাদি দেশে। সুযোগ পেলেই তারা হামলে পড়বে। এই মুহূর্তে জাতিকে একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেটা হলো ধর্ম আর ধর্মের নামে প্রচলিত অধর্মকে আলাদা করে সেই অধর্মকে পরিত্যাগ করতে হবে। ধর্মবিশ্বাসী প্রতিটি মানুষকে একটি কথার মধ্যে দাঁড়াতে হবে যে কোন ফকিহ, কোন মুফতি, কোন মৌলভি, কোন পীর সাহেব, কোন বুজুর্গ কী বলল সেটা আমরা দেখব না। আমরা দেখব আল্লাহ কী বলেছেন আর তার প্রেক্ষিতে রসুলাল্লাহ কী করেছেন। এর বাইরে আর কিছু আমরা মানবো না। এটাই হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মর্মকথা। এতে ধর্মকে অপব্যবহার করে স্বার্থ হাসিলকারীরা কে বেকার হয়ে গেল, কে কোন স্বার্থ থেকে বঞ্চিত হলো এটা আমাদের দেখার বিষয় না। কারণ রোগী যখন জীবন-মৃত্যু সঙ্কটে পড়ে তখন অস্ত্রোপচার (Surgery) ছাড়া গতি থাকে না, করুণা দেখিয়ে লাভ হয় না। সেভাবে ধর্মব্যবসাকে আমাদের সমস্ত জাতি মিলে একত্রে বয়কট করতে হবে, তাদের থেকে হেজরত করতে হবে। যদি তা না করা হয়, যদি হারাম জেনেও ধর্মব্যবসায়ীদেরকে টাকা দিয়েই যাওয়া হয় তাহলে কোনোদিন ধর্মব্যবসা বন্ধ হবে না, ধর্মের নামে এই হারাম কাজ জারি থাকবে। ধর্মব্যবসায়ীরা খাবে কী

এই প্রশ্নের উত্তর পূর্বে একবার দিয়ে এসেছি। আবারও সংক্ষেপে বলছি, সমাজের মানুষ যদি চায় তাহলে অল্প কিছু লোকের উপার্জনের জন্য একটি বৈধ পন্থা বের করে দেওয়া কঠিন কাজ নয়।

দ্বিতীয় যে কাজটি করতে হবে তা হলো, ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা জাতিকে কোনোদিন রক্ষা করবে না, সঠিক পথ দেখাবে না। বরং জাতিকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিয়ে যাবে। পূর্বেই বলেছি সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় দীন সম্পর্কে প্রায় কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয় না। ওখান থেকে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দর্শন আর ইসলামবিদ্বেষ শিখে লক্ষ লক্ষ কথিত আধুনিক শিক্ষিত লোক বের হচ্ছেন যারা চরম আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। নিজেদের বৈষয়িক উন্নতি ছাড়া আর কিছুই তারা ভাবেন না। আবার মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাও আমাদেরকে সমান বস্তুবাদ শেখাচ্ছে। সেখান থেকে পাশ করে বেরিয়ে আসা লোকেরা অধিকাংশই জনগণকে পরকালের পেছনে ছুটিয়ে দেন কিন্তু নিজেরা ছুটতে থাকেন বস্তুর পেছনে, অর্থের পেছনে। এ ক্ষেত্রে হালাল-হারাম, নীতি-দুর্নীতির কোনো তোয়াক্কা তারা করেন না। উভয় শিক্ষাব্যবস্থাই স্বার্থপর পয়দা করে এবং বিভক্তির শিক্ষা দেয়। বছর বছর দেশের হাজার হাজার মাদ্রাসা থেকে লক্ষ লক্ষ ছাত্র শিক্ষিত হয়ে বের হচ্ছে। তাদের অধিকাংশের সামনে জীবিকা অর্জনের দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। এটা বাস্তবতা যে তাদেরকে বাধ্য হয়েই এই হারাম রোজগারের পথে পা বাড়াতে হচ্ছে। ধীরে ধীরে এটা আমাদের সামাজিক বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে এবং ব্রিটিশরা এটাই চেয়েছিল। এখন ধর্মব্যবসার উপর বহু লোকের জীবন জীবিকা নির্ভর করছে। কাজেই শিক্ষাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস।

সমাজের শিক্ষিত সচেতন শ্রেণিটি বলে থাকেন, মাদ্রাসা শিক্ষার মান অনেক নিম্ন। সেখান থেকে যারা বের হন তারা কূপমণ্ডূক, আধুনিক দুনিয়া সম্পর্কে হাস্যকর রকমের অজ্ঞ। কিন্তু এই অজ্ঞতার ও অযোগ্যতার পেছনে দায়ী যে শিক্ষাব্যবস্থা সেটাকে সচল রেখে এই অভিযোগ করা কতটুকু ন্যায়সঙ্গত? রাষ্ট্রের শিক্ষানীতিই কি এই অযোগ্য, কূপমণ্ডূক, জাতীয় স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর জনগোষ্ঠীকে তৈরি করছে না?

অথচ এই শিক্ষাব্যবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন কোনো সরকার করতে সাহস করে না। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে না যার একটি মাত্র কারণ, ভোট হারানোর শঙ্কা। সরকারে যারা থাকেন তারা মনে করেন, শিক্ষাব্যবস্থায় হাত দিলে তাদের উপর নাস্তিকতা, ধর্মবিদ্বেষের লেবেল লাগিয়ে দিয়ে মাদ্রাসাশিক্ষিতরা ধর্মপ্রাণ জনগণকে প্রভাবিত করে তাদের গদি উল্টিয়ে দিবে। এই ভয়ে তারা শিক্ষাব্যবস্থাকে কোনোরকম জোড়াতালি দিয়ে শাসনের মেয়াদ পার করে দেন। এভাবেই যুগ যুগ ধরে ধর্মব্যবসায়ীর সংখ্যা জ্যামিতিক

হারে বেড়ে চলেছে। এই বছর দুই লাখ তো সামনে বছর চার লাখ, পরের বছর আট লাখ। এদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য স্বভাবতই নতুন নতুন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। প্রতি বছর বাড়ছে মাদ্রাসার স্বার্থরক্ষায় মিছিলকারী ছাত্র-শিক্ষকদের সংখ্যা। জোরালো হচ্ছে তাদের নেতৃবৃন্দের হুঙ্কার। মাদ্রাসা শিক্ষা অর্থনীতির বিচারে একটি অনুৎপাদনশীল খাত। এই ধারায় শিক্ষিত মানুষগুলো সমাজের বোঝা হয়ে থাকেন বিধায় আজীবন হীনম্মন্যতায় ভোগেন। এই সুস্থ সবল মানুষগুলো যদি বিদেশে গিয়ে রোজগার করতেন তাহলে দেশেরও উপকার হতো। অবশ্য সংখ্যায় নিতান্ত কম হলেও মাদ্রাসাশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি অংশ ধর্মব্যবসার সঙ্গে জড়িত না হয়ে নিজ উদ্যোগে, প্রযুক্তিগত ও কারিগরি জ্ঞান অর্জন করে বা দুনিয়াবি অন্যান্য জ্ঞান হাসিল করে শ্রমলব্ধ অর্থে জীবিকা নির্বাহ করেন।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে ধর্মব্যবসায়ী সৃষ্টির শিক্ষাব্যবস্থা পরিহার করতে হবে কিন্তু ধর্মের শিক্ষা পরিহার করা চলবে না। বরং সবাইকে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রকৃত ইসলামের প্রভাবেই মুসলিম জাতি একদিন জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে পৃথিবীর সকল জাতির শিক্ষকে পরিণত হয়েছিল। তারা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাসলা-মাসায়েল শিক্ষা করে বসে থাকেন নি, অন্যের উপর নির্ভরশীল হন নি, তারা নিজেদের জীবনকে যেমন পাল্টে দিয়েছেন তেমনি পাল্টে দিয়েছেন মানবজাতির ভাগ্যকে। তাই আমাদেরকে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে যেখানে প্রতিটি ছাত্র যেমন পার্থিব প্রয়োজনের বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে, তেমনি তারা ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সম্পর্কে জানবে। তারা হবে মিথ্যার বিরুদ্ধে, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার, প্রতিবাদী সত্যের সৈনিক। তারা স্বার্থপর না হয়ে পরোপকারী হবে, দেশের জন্য, মানুষের জন্য নিজেদের জীবন-সম্পদকে উৎসর্গ করার প্রত্যয় নিয়ে তারা বড় হয়ে উঠবে। তারা নিজেরা বিশৃঙ্খলা করবে না, জাতির মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করবে না- কাউকে করতেও দেবে না। তখন জাতি একটি মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়াবে। ধর্মব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে ধর্মের আসল রূপের উদ্ভাসন হবে। আগাছাপূর্ণ জমিতে ফসল হয় না।

দলিল

পবিত্র কোর'আন থেকে

১. তাদের (নবী ও প্রকৃত মো'মেন) পরে আসলো অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ, তারা সালাহ বিকৃত ও নষ্ট করল ও লালসা পরবশ হলো। সুতরাং তারা অচিরেই তাদের কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। - সুরা মারইয়াম ৫৯

২. আন্তা মাওলানা ফানসুর না আলাল কাওমিল কাফেরীন। আপনিই আমাদের প্রভু (মাওলানা)! আপনি আমাদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করুন। - সুরা বাকারা ২৮৬

৩. তিনি তো হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি অনন্যোপায় হয়ে, লোভের বশবর্তী না হয়ে বা সীমালঙ্ঘন না করে তা ভক্ষণ করে তাহলে তার কোনো গোনাহ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। বস্তুত, যারা আল্লাহ কেতাবে যা অবতীর্ণ করেছেন তা গোপন করে এবং এর বিনিময়ে পার্থিব তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই ঢুকায় না। এবং আল্লাহ হাশরের দিন তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব। এরাই হচ্ছে সেই সমস্ত মানুষ যারা সঠিক পথের (হেদায়াহ) পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা (দালালাহ) এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করে নিয়েছে। আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল। যে কারণে এ শাস্তি তা হলো, আল্লাহ সত্যসহ কেতাব নাজিল করেছেন। এবং যারা এই কেতাবের বিষয়বস্তু নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করে তারা চূড়ান্ত পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। - সুরা বাকারা ১৭৩-১৭৬

৪. অধিকাংশ আলেম ও সুফিবাদীরা মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। তারা যে সোনা রূপা সঞ্চয় করে, হাশরের দিন সেগুলো উত্তপ্ত করে তাদের ললাটে ও পার্শ্বদেশে ছ্যাঁকা দেওয়া হবে। - সুরা তওবা ৩৪

৫. তাদের অনুসরণ করো যারা তোমাদের কাছে কোনোপ্রকার বিনিময় চায় না এবং যারা সঠিক পথে, হেদায়াতে আছে। - সুরা ইয়াসিন ২১

৬. এবং তুমি তাদের নিকট কোনো মজুরি দাবি করো না। এই বাণী তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র। - সুরা ইউসুফ ১০৪

৭. বল! আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাই না। এবং যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের দলভুক্ত নই। - সুরা সা'দ ৮৬

৮. ...বল! আমি এর (দীনের) বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে প্রেম-ভালোবাসা ও আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার ব্যতীত অন্য কোনো মজুরি চাই না। - সুরা শুরা ২৩

৯. (হে মোহাম্মদ!) তুমি কি তাদের নিকট কোনো মজুরি চাও? তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই তো শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রেযেকদাতা। - সুরা মো'মেনুন ৭২

১০. তবে কি তুমি তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাচ্ছো যা ওরা একটি দুর্বহ বোঝা মনে করে? - সুরা তুর ৪০

১১. তাঁদেরকেই (নবীদেরকেই) আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন। সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর; বল! এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না। - সুরা আনআম ৯০

১২. নূহ (আ.) এর ঘোষণা: হে আমার সম্প্রদায়! এর পরিবর্তে আমি তোমাদের নিকট ধন সম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিক আল্লাহর নিকট। - সুরা হুদ-২৯

১৩. হুদ (আ.) এর ঘোষণা: হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট কোনো মজুরি চাই না। আমার পারিশ্রমিক তাঁরই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি তবুও বুদ্ধি (আক্ল) খাটাবে না? - সুরা হুদ-৫১

১৪. নূহ (আ.) এর ঘোষণা: আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো কেবল বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। - সুরা শু'আরা ১০৯

১৫. সালেহ (আ.) এর ঘোষণা: আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমার মজুরি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। -সুরা শু'আরা ১৪৫

১৬. লুত (আ.) এর ঘোষণা: এর জন্য আমি কোনো মজুরি চাই না। আমার মজুরি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। - সুরা শু'আরা-১৬৪

১৭. নূহ (আ.) এর ঘোষণা: যদি তোমরা আমার কথা না শোনো তাহলে জেনে রাখ, আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই নি। আমার প্রতিদান কেবল আল্লাহর নিকট এবং আমাকে মুসলিম (সত্যের প্রতি সমর্পিত) হওয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে। - সুরা ইউনুস ৭২

১৮. হুদ (আ.) এর ঘোষণা: আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোনো মজুরি চাচ্ছি না। আমার পারিশ্রমিক তাঁরই নিকট যিনি এই বিশ্বজাহানের স্রষ্টা। -সুরা শু'আরা ১২৭

১৯. শোয়েব (আ.) এর ঘোষণা: আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো মূল্য চাই না। আমার মজুরি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে।- সুরা শু'আরা-১৮০

২০. আর তোমরা সে গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি সত্যবক্তা হিসেবে তোমাদের কাছে। তোমরা কেতাবের প্রাথমিক অস্বীকারকারী হয়ো না আর তুচ্ছমূল্যে আমার আয়াত বিক্রি করো না। এবং আমার (আযাব) থেকে বাঁচ। তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন করো না। - সুরা বাকারা ৪১, ৪২

২১. যাদের গ্রন্থ দেয়া হয়েছে, আল্লাহ যখন তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তোমরা নিশ্চয়ই এটা মানুষের মধ্যে প্রচার করবে এবং তা গোপন করবে না। কিন্তু তারা তা তাদের পেছনে নিক্ষেপ করল এবং খুব কম মূল্যে বিক্রয় করল, অতএব তারা যা কিনল তা নিকৃষ্টতর। - সুরা ইমরান ১৮৭

২২. সত্যগোপন ও দীনের বিনিময় গ্রহণ প্রসঙ্গে আল্লাহর কথা হলো, "কেয়ামতের দিন তিনি তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না, পবিত্রও করবেন না। পরকালে তাদের কোনো অংশ নেই। তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।" - সুরা ইমরান ৭৭

২৩. তাদের উদ্দেশ্যে সেই ব্যক্তির কাহিনী বর্ণনা করুন যাকে আমি আমার আয়াত শিক্ষা দিয়েছিলাম কিন্তু সে তা হতে সরে আসল এবং শয়তানের অনুসরণ করল ফলে পথভ্রষ্ট হলো। আমি চাইলে তাকে তার এলেমের কারণে সম্মানিত করতে পারতাম কিন্তু সে দুনিয়ার জীবনের দিকেই ঝুঁকে গেল আর তার মনের ইচ্ছাকে অনুসরণ করল। অতএব সে কুকুরের মতো, তুমি তার উপর বোঝা চাপাও বা ছেড়ে দাও সর্বদা সে হাঁপাতে থাকে। যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের উদাহরণ খুবই নিকৃষ্ট। অতএব আপনি এসব কাহিনী বর্ণনা করুন হয়ত তারা চিন্তা করবে। - সুরা আরাফ ১৭৫-১৭৬

২৪. তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তাঁরা কেতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা তেলাওয়াত করছে তা আদৌ কেতাব নয়। এবং তারা বলে যে, এসব

কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, এটি আল্লাহর কথা অথচ এসব আল্লাহর কথা নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহরই প্রতি মিথ্যারোপ করে। - সুরা ইমরান ৭৮

২৫. তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মধ্যে এমন সৎকর্মশীল কেন রইল না, যারা পৃথিবীতে অরাজক পরিস্থিতি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বাধা দিত; তবে মুষ্টিমেয় লোক ছিল যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছি। আর পাপিষ্ঠরা তো ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল যার সামগ্রী তাদেরকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছিল। আসলে তারা ছিল মহা অপরাধী। - সুরা হুদ ১১৬

২৬. তারপর (নেককারদের পর) কিছু লোক কেতাবের ওয়ারিস হলো (কেতাবের জ্ঞানপ্রাপ্ত হলো) কিন্তু তারা (বিনিময় বা ঘুষ হিসাবে) দুনিয়ার এই নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করত এবং বলত আমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। পরে যদি আবার অনুরূপ বস্তু পেশ করা হয় তারা আবার গ্রহণ করে। তাদের নিকট কি এই ওয়াদা নেওয়া হয় নি যে আল্লাহর ব্যাপারে তারা মিথ্যা কথা বলবে না? আর কিতাবে যা আছে তারা তো তাও পাঠ করেছে। নিশ্চয় মুত্তাকিদের জন্য আখেরাতই উত্তম, তোমরা কি বোঝো না? - সুরা আরাফ ১৬৯

২৭. হে মো'মেনগণ! সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (অর্থাৎ রেজেক) সন্ধান করবে। - সুরা জুমা ১০

২৮. যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তা বুঝতে চেষ্টা করে নি, তাদের উপমা পুস্তক বহনকারী গাধার মতো! - সুরা জুমা ৫

২৯. আল্লাহ সাক্ষ্য দেন এবং মালায়েকগণ ও জ্ঞানী (আলেম) ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন হুকুমদাতা (ইলাহ) নেই। - সুরা ইমরান ১৮।

৩০. যারা ঈমান আনে ও আমলে সালেহ করে তাদের আল্লাহ সেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বয়ে যায়। - সুরা মোহাম্মদ ১২।

৩১. আল্লাহ মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। - সুরা তওবা ৭২।

হাদিস ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে

৩২. রসুলাল্লাহ বলেছেন, এমন সময় আসবে যখন ১) ইসলাম শুধু নাম থাকবে, ২) কোর'আন শুধু অক্ষর থাকবে, ৩) মসজিদসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ ও লোকে লোকারণ্য হবে কিন্তু সেখানে সঠিক পথনির্দেশ (হেদায়াহ) থাকবে না, ৪) আসমানের নিচে নিকৃষ্টতম জীব হবে আমার উম্মাহর আলেম সমাজ, ৫) তাদের সৃষ্ট ফেতনা তাদের দিকেই ধাবিত হবে। - আলী (রা.) থেকে বায়হাকি, মেশকাত

৩৩. আবু যর (রা.) বলেন, একদিন আমি রসুলাল্লাহর (সা.) সাথে ছিলাম এবং তাঁকে বলতে শুনেছি: “আমি আমার উম্মতের জন্য দাজ্জালের থেকেও একটা জিনিসকে বেশি ভয় করি।” আমি ভয় পেয়ে তাঁকে জিজ্ঞাস করলাম, “ইয়া রসুলুল্লাহ (সা.) সেই জিনিস কী?” তিনি বললেন, “আয়াম্যায়ে দোয়াল্লিন বা পথভ্রষ্ট নেতা”। - মুসনাদে আহমাদ: ২১৩৩৪, তিরমিযী: ২২২৯

৩৪. বরং আমি তো আমার উম্মতের জন্য ভয় করি পথভ্রষ্ট নেতাদের; যদি তারা তার আনুগত্য করে তবে তো তারা পথভ্রষ্ট হবে আর যদি তার অবাধ্য হয় তবে তাদের হত্যা করবে।- ইমাম সুয়ুতীর জামেউল আহাদিস, তিবরানীর মু’জামে কাবীর, কানযুল উম্মাল

৩৫. রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞান দিয়ে আল্লাহর কেতাবের তাফসির করে, তার তাফসির যদি সঠিকও হয় তবু সে অপরাধী। - জুনদুব (রা.) থেকে আবু দাউদ

৩৬. আমার উম্মতের ইখতিলাফ (মতবিরোধ) রহমতস্বরূপ। - একটি প্রচলিত জাল হাদিস। আল্লামা সুবকী বলেছেন: “মুহাদ্দিসগণের কাছে এটি হাদিস বলে পরিচিত নয়। আমি এ হাদিসের কোনো সনদ-ই পাই নি, সহীহ, যয়ীফ বা বানোয়াট কোনো রকম সনদই এ হাদিসের নেই।” সূত্র: মোল্লা কারী, আল-আসরার, ৫১ পৃ, সুয়ূতী, আল-জামি আস সগীর ১/১৩, আলবানী, যায়ীফাহ ১/১৪১, নং ৫৭, যায়ীফুল জামিয় ৩৪ পৃ।

৩৭. রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, তারা অভিশপ্ত, যারা চুল ব্যবচ্ছেদে (অর্থাৎ ক্ষুদ্র বিষয়ে) লিপ্ত এবং রসুলাল্লাহ (সা.) তিনবার এই কথা উচ্চারণ করলেন। - মুসলিম, আহমাদ ও আবু দাউদ। ইমাম আন-নববী বলেন, এখানে ‘চুল চিরতে (ব্যবচ্ছেদ) লিপ্ত ব্যক্তিদের বলতে তাদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যারা কথায় ও কাজে আল্লাহ প্রদত্ত সীমার চেয়ে অগ্রবর্তী হয়ে যায় (বাড়াবাড়ি, অতিবিশ্লেষণ করে)। - রিয়াদুল সালেহীন

৩৮. রসুলাল্লাহ একদিন সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কি জান, ইসলামকে কিসে ধ্বংস করবে? এই প্রশ্ন করে তিনি নিজেই জবাব দিচ্ছেন- শিক্ষিতদের ভুল, মোনাফেকদের বিতর্ক এবং নেতাদের ভুল ফতোয়া। -মেশকাত

৩৯. রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন আল-মাহদী আবির্ভূত হবেন, তাঁর শত্রু হবে কেবল ঐ সমাজের আলেম সমাজ। তারা যদি তলোয়ার দ্বারা তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম নাও হয়, তাকে হত্যার জন্য ফতোয়া জারি করবে। - বায়ান আল আইমা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা ৯৯

৪০. রসুলাল্লাহ (সা.) বলেন, কেয়ামতের দিন এমন একজন ‘আলেমকে’ উপস্থিত করা হবে যে দীনের জ্ঞান অর্জন করেছে এবং মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছে

এবং কোর'আন পাঠ করেছে। অতঃপর তাকে আল্লাহর নেয়ামতসমূহ স্মরণ করানো হবে। সেও তা স্বীকার করবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন: আমার দেয়া নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করেছ? সে বলবে: আমি আপনার দেওয়া নেয়ামতের বিনিময়ে দীনের জ্ঞান অর্জন করেছি, অন্যকে তা শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার সন্তুষ্টির জন্যে কোর'আন পাঠ করেছি। আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছো; বরং তুমি এই জন্যে বিদ্যা শিক্ষা করেছিলে যাতে করে মানুষ তোমাকে আলেম বলে। আর এই জন্যে কোর'আন পাঠ করেছিলে যাতে লোকেরা তোমাকে কারী বলে। পৃথিবীতে তোমাকে এই সব বলা হয়ে গেছে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের আদেশ দেয়া হবে। অতঃপর নাক ও মুখের উপর উপুড় করে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

৪১. আল্লাহর রসুল (সা.) বলে গেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোনো জ্ঞান অর্জন করল, যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, কিন্তু তা সে কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে অর্জন করল, কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত পাবে না। - আবু হোরায়রাহ রা. থেকে আবু দাউদ

৪২. আল্লাহর রসুল বলেছেন, যদি কেউ হারামকে হালাল বলে অথবা হালালকে হারাম বলে তবে সে কাফির হবে। - শরহে আকাইদে নফসি, ফিকহে আকবার, আকাইদে হাক্কা।

৪৩. হানাফি মাজহাবের মুজতাহিদ আল্লামা ফকিহ্ আবুল লায়ছ সমরকন্দি (র.) (৩৭৩ হিজরি) লিখেছেন, "যখন আলেমগণ হারাম ভক্ষণকারীতে পরিণত হবে তখন সাধারণ মানুষেরা কাফেরে পরিণত হবে। - তাম্বিহুল গাফিলিন

৪৪. ভবিষ্যতে মুসলিম উম্মাহর কী অবস্থা হবে বলতে যেয়ে একদিন আল্লাহর রসুল (সা.) বললেন- "এমন সময় আসবে যে, এই জাতি পৃথিবীর সব জাতির দ্বারা অপমানিত, লাঞ্ছিত, পরাজিত হবে। উপস্থিত সাহাবাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ প্রশ্ন করলেন- হে আল্লাহর রসুল! তখন কি পৃথিবীতে তারা এত অল্প সংখ্যক হবে যে, অন্য জাতিগুলো তাদের পরাজিত ও লাঞ্ছিত করবে? মহানবী (স.) তার জবাব দিলেন- "না, সংখ্যায় তারা অসংখ্য হবে।"তারা আবার মহানবীকে (সা.) প্রশ্ন করলেন- "আমরা সংখ্যায় অসংখ্য হলে পরাজয় কী করে সম্ভব?"রসুল (সা.) জবাব দিলেন একটা উপমা দিয়ে, বললেন, "মনে করো শত শত উট, কিন্তু উটগুলো এমন যে যেটার উপরই চড়ে বসতে যাও ওটাই বসে পড়ে বা পড়ে যায়। ঐ অসংখ্যের মধ্যে খুব কম উটই পাওয়া যাবে যেগুলোর পিঠে চড়া যাবে।" আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বোখারী ও মুসলিম

৪৫. রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করবে, কোর'আন পাঠ করবে, তারপর তারা বলবে, আমরা নেতৃবর্গের নিকট যাব, তাদের নিকট হতে দুনিয়ার সম্পদ গ্রহণ করব কিন্তু দীনের ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করব না। এরূপ কখনো হতে পারে না। যেমন কাঁটাদার গাছ থেকে ফল আহরণের সময় হাতে কাঁটা ফুটবেই, তদ্রূপ তারা তাদের কাছে গিয়ে গুনাহ ব্যতীত তারা কিছুই লাভ করতে পারে না। - ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে ইবনে মাজাহ, মেশকাত, কানযুল উম্মাল, সুয়ুতী, তারগীব ওয়াত তারহীব।

৪৬. রসুলাল্লাহর খাদেম সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি রসুলাল্লাহ (সা.) কে বললেন, আমি কি আপনার পরিবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত? রসুলাল্লাহ (সা.) চুপ থাকলেন। এভাবে তিনবার প্রশ্ন করার পর তিনি বললেন, "হ্যাঁ, যদি তুমি কোনো নেতার দরজাতে ধর্ণা না দাও এবং কোনো নেতার নিকট যেয়ে কিছু না চাও। - তারগীব ওয়াত তারহীব।

৪৭. রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যারা মরু অঞ্চলে বসবাস করে তারা রুক্ষতা প্রাপ্ত হয়, যারা জীবজন্তু শিকার করে তারা বেপরোয়া হয় এবং যে ব্যক্তি শাসকের (সুলতান) দরবারে যাওয়া আসা করে সে ফিতনায় পড়ে যায়। যে কেউ শাসকের নিকটতর হয় সে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়।" - ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আবু দাউদ, তিরমিজি, মেশকাত, তারগীব ওয়াত তারহীব।

৪৮. রসুলাল্লাহ বলেছেন, "শাসকদের দরজা থেকে সতর্ক থেক কারণ সেগুলো ফেতনা, হয়রানি ও অবমাননার উৎস হয়ে দাঁড়ায়।" - আবু আল আওয়ার আস-সিলমি (রা.) থেকে শহীদ আদ-দায়লামি, ইবনে মুনদাহ, ইবনে আসাকি।

৪৯. রসুলাল্লাহ বলেছেন যে, "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্টি হলো আলিমুস সুলতান বা সরকারি আলেম।" - আবু হোরায়রা (রা.) থেকে জামিউল আহাদিস: কানযুল উম্মাল।

৫০. আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলাল্লাহ বলেছেন যে, "আল্লাহর কাছ থেকে দুর্দশার গহ্বর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো।" সাহাবিরা প্রশ্ন করলেন, "হে আল্লাহর রসুল! দুর্দশার গহ্বর কী?" তিনি উত্তর দিলেন, "এটি হচ্ছে জাহান্নামের একটি নদী যা থেকে খোদ জাহান্নাম প্রতিদিন শতবার আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে।" সাহাবিরা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রসুল! এতে কে প্রবেশ করবে?" তিনি বললেন, "এটি প্রস্তুত করা হয়েছে পবিত্র কোর'আনের সেই ক্বারীদের জন্য যারা নিজেদের আমলকে প্রদর্শন করতে আগ্রহী। আর আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ক্বারী হচ্ছে তারা যারা শাসকদের দরবারে যাতায়াত করে।" - ইবনে মাজাহ

৫১. রসুলাল্লাহ বলেছেন, “দু’টো ক্ষুধার্ত নেকড়েকে একপাল বকরির মধ্যে ছেড়ে দিলে যে ক্ষতি না হবে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে যদি কেউ সম্পদ আর মর্যাদা কামাইয়ের লালসায় দীনকে ব্যবহার করে।” - তিরমিযী, হাসান সহীহ/২৩৭৬।

৫২. রসুলাল্লাহ বলেছেন, “যদি তুমি কোনো আলেমকে দেখ যে শাসকদের (সুলতান, আমীর-ওমরাহ) সাথে খুব মেলামেশা করছে, তাহলে জেনে রেখ যে সেই লোক একটা চোর।” - দায়লামী, মুসনাদে ফেরদাউস।

৫৩. ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেছেন, “যদি তুমি কোনো আলেমকে নিয়মিতভাবে খলিফার দরবারে যাতায়াত করতে দেখ তাহলে তার দীন ত্রুটিযুক্ত বলে জানবে।” তাঁর সময়ে যিনি খলিফা ছিলেন তিনি তাঁকে প্রধান বিচারপতি বা কাজির দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার দরুন সাজাপ্রাপ্তও হয়েছিলেন।

৫৪. রসুলাল্লাহ বলেছেন, “ফকীহগণ (শরিয়াহ বিশেষজ্ঞ) হচ্ছেন নবীদের প্রতিনিধি (ন্যায়পাল) যতদিন না তারা দুনিয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ে অথবা শাসকদের অনুগামী হয়। যদি তারা সেটা করে তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকবে। - আলী (রা.) থেকে ইমাম আসকারী।

৫৫. রসুলাল্লাহ বলেছেন, “যখন কোনো আলেম স্বেচ্ছায় কোনো শাসকের কাছে গমন করেন তখন তিনি সেই শাসকের প্রত্যেক অন্যায় কাজের অংশীদার হবেন এবং ঐ শাসকের সাথেই জাহান্নামের আগুনে সাজাপ্রাপ্ত হবেন।” - মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) থেকে হাকিম, দায়লামি

৫৬. মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য কী ছিল তা আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ জনাব ইয়াকুব শরীফ “আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস” বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, “মুসলমানরা ছিল বীরের জাতি, ইংরেজ বেনিয়ারা ছলে-বলে-কৌশলে তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাদের প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা ও মর্যাদা হরণ করার জন্য পদে পদে যেসব ষড়যন্ত্র আরোপ করেছিল, আলিয়া মাদ্রাসা তারই একটি ফসল। বাহ্যত এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন করা হয়েছিল আলাদা জাতি হিসাবে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত, যাতে মুসলমানদের ধর্ম, কৃষ্টি ও আদর্শ রক্ষা পায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়াই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য। - আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৫৭. রসুলাল্লাহ বলেছেন, “হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, জীবিকা নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে চেষ্টা করো এবং তোমাদের প্রচেষ্টার পরিপূর্ণতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করো। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই

যে, কোনো মো’মেনের সত্তাকে দুনিয়ায় বেকার এবং অনর্থক সৃষ্টি করা হয় নি। বরং তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কর্ম ও কর্তব্যের সঙ্গে সংযুক্ত। কর্ম ও প্রচেষ্টার জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অল্পে সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার অর্থ এ নয় যে, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা এবং নিজের বোঝা অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া। নিশ্চয়ই আল্লাহর উপর ভরসা করা আমাদের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু রেযেক হাসিল করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা নিতান্তই জরুরি বিষয়। - মহানবীর স. ভাষণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৫৮. কা’ব ইবনে উজরাহ (রা.) বলেছেন, আমরা নয়জন ব্যক্তি এক জায়গায় অবস্থান করছিলাম। এ সময় রসুলাল্লাহ (সা.) সেখানে আগমন করলেন। তিনি আমাদেরকে বললেন, “নিশ্চয়ই আমার পরবর্তী যুগে অত্যাচারী শাসকদের আবির্ভাব ঘটবে। যারা তাদের মিথ্যাচারকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেবে এবং তাদের নিপীড়নকে, অন্যায় আচরণকে সমর্থন দেবে তারা আমার কেউ নয়, আমিও তাদের কেউ নই। কিন্তু যারা তাদের মিথ্যাচারকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেবে না এবং তাদের নিপীড়নকে, অন্যায় আচরণকে সমর্থন করবে না, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত। তারা জান্নাতে আমার সঙ্গে হাউজে কাউসার থেকে পান করবে।” - সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নম্বর ৪২০৭, ইমাম ইবনে হাজার কর্তৃক সহীহ বলে স্বীকৃত।

৫৯. আরাফার ময়দানে বিদায় হজ্বের ভাষণে সমবেত সাহাবীদের উদ্দেশে রসুলাল্লাহ (সা.) বলেন, “যাকে আমরা শাসনকার্যে নিযুক্ত করি, আমরা তার ভরণপোষণ করি। এরপরও যদি যে সে কিছু গ্রহণ করে, তা বিশ্বাসভঙ্গ বা ঘুষ হিসাবে গণ্য হবে। আর ঘুষ মহাপাপ।” - মহানবী (সা.)-এর বিদায় হজ্বের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৬০. আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে রসুল (সা.) যাকাত উত্তোলনকারী হিসাবে নিয়োগ দেন। তার নাম ছিল ইবনুল লুতবিয়্যাহ (রা.)। কাজ থেকে ফেরার পর বললেন, “এ হচ্ছে যাকাতের সম্পদ; আর এগুলো আমাকে হাদিয়া হিসাবে দেওয়া হয়েছে।” তখন রসুলাল্লাহ (সা.) মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর বললেন, আমার প্রেরিত কর্মচারীর কী হলো, সে বলে এটা যাকাতের সম্পদ, আর এটা আমি হাদিয়াস্বরূপ পেয়েছি। সে তার বাপ-মা’র ঘরে বসে দেখতে পারে না তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা? আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমাদের কেউ খেয়ানত করলে তা নিজের কাঁধে নিয়েই কেয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে। উট, গরু বা ছাগল যাই হোক সেগুলো আওয়াজ করতে থাকবে। এরপর রসুল (সা.) উভয় হাত উত্তোলন করে দুইবার বললেন, হে আল্লাহ! আমি পৌঁছে দিয়েছি? - সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৬৫৭৮, ৮৮৩

৬১. রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, “প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গ হাদিয়া কবুল করলে চুরি বলে গণ্য হবে।”- মুসনাদে আহমদঃ খ. ৫, পৃ. ৪২৪।

৬২. এক ব্যক্তি খলিফা ওমর বিন খাত্তাব (রা.) এর কাছে প্রতিবছর জবাইকৃত উটের পা হাদিয়া পাঠাত। একবার তার বিরুদ্ধে খলিফার দরবারে মামলা দায়ের করা হয়। তখন সে বলল, ‘হে আমীরুল মুমিনীন! এমন চূড়ান্ত ফয়সালা প্রদান করুন, ঠিক যেমনভাবে সমস্ত জবাইকৃত উট থেকে পা পৃথক করা হয়।’ তখন ওমর (রা.) নিয়মমাফিক বিচার করলেন এবং রায়টি ঐ লোকের বিরুদ্ধে গেল। এই ঘটনার পর তিনি মুসলিম বিশ্বের সমস্ত প্রশাসক ও কর্মকর্তাদের কাছে এই মর্মে ফরমান পাঠালেন যে, হাদিয়া-উপঢৌকনও ঘুষের অন্তর্ভুক্ত; তোমরা কারো কাছ থেকে উপঢৌকন গ্রহণ করবে না।’ - ইমাম শা’বী, আখবারুল কুজ্জাতঃ খ. ১, পৃ. ৫৫-৫৬।

৬৩. ইসলামের প্রাথমিক যুগের ফকীহ আল্লামা আবু বকর জাসসাস (মৃত্যু ৩৭০ হিজরী) তাঁর সুবিখ্যাত আহকামুল কোর’আন গ্রন্থের ঘুষ সংক্রান্ত অধ্যায়ে লিখেছেন, “এ থেকে প্রমাণিত হয়, যে কাজ ফরজ হিসেবে অথবা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, সে কাজে পারিশ্রমিক নেয়া জায়েজ নেই। যেমন হজ্ব এবং কোর’আন ও ইসলাম শিক্ষাদান ইত্যাদি।” - আহকামুল কোর’আনঃ ২য় খণ্ড, ৫২৬ পৃষ্ঠা - আল্লামা আবু বকর জাসসাস (রহ.)

৬৪. আসহাবে সুফফার অন্যতম সাহাবী উবাদা ইবন সামিত (রা.) বলেন, “আমি আহলে-সুফফার কিছু লোককে লেখা এবং কোর’আন পড়া শেখাতাম। তখন তাদের একজন আমার জন্য একটি ধনুক হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করে। তখন আমি ধারণা করি যে, এ তো কোনো মাল (সম্পদ) নয়, আমি এ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় তীরন্দাযী করব। এরপর রসুলাল্লাহর (সা.) নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিঃ ইয়া রসুলাল্লাহ (সা.)! আমি যাদের কোর’আন পড়া এবং লেখা শিখাই, তাদের একজন আমাকে হাদিয়া হিসেবে একটি ধনুক প্রদান করেছেন, যা কোনো সম্পদই নয়। আমি এ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় তীরন্দাযী করব। তিনি (সা.) বলেনঃ ‘তুমি যদি তোমার গলায় জাহান্নামের কোনো বেড়ি পরাতে চাও তবে তুমি তা গ্রহণ করো।’” - উবাদা ইবন সামিত (রা.) আবু দাউদ চতুর্থ খণ্ড, হাদিস নং- ৩৩৮১

৬৫. যজ্ঞার্থমথং ভিক্ষিত্বা যো ন সর্বং প্রযচ্ছতি/স যাতি ভাসতাং বিপ্রঃ কাকতাং বা শতং সমাঃ। অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞের জন্য অর্থ ভিক্ষা করে তার সমস্তটা ঐ কাজে ব্যয় করে না, সে শত বৎসর শকুনি অথবা কাক হয়ে থাকে। মনুসংহিতা, একাদশ অধ্যায়, শ্লোক ২৫

৬৬. আবদুর রহমান ইবনে শিবল (রা.) বলেন, আমি রসুলাল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা কোর'আন পড় তবে তাতে বাড়াবাড়ি করো না এবং তার প্রতি বিরূপ হয়ো না। কোর'আনের বিনিময় ভক্ষণ করো না এবং এর দ্বারা সম্পদ কামনা করো না।' - হাদিস: মুসনাদে আহমদ ৩/৪২৮; মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৫/২৪০; কিতাবুত তারাবীহ।

৬৭. রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে কেউ কোর'আন পড়ে সে যেন তা দিয়ে আল্লাহর কাছে চায়। এরপর এমন কিছু মানুষ আসবে যারা কুরান পড়ে তার বিনিময়ে মানুষের কাছে চাইবে। - হাদিস: তিরমিযি/২৯১৭

৬৮. আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, একদিন আমরা একদল লোক এক স্থানে সমবেত ছিলাম। আমাদের মধ্যে আরব, অনারব, কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ সকল শ্রেণির লোকই ছিল। এ অবস্থায় নবী করিম (সা.) আমাদের মধ্যে আগমন করে বললেন, "তোমরা সৌভাগ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছ। তোমরা আল্লাহর কেতাব তেলাওয়াত করে থাক। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসুল বর্তমান রয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে মানুষের নিকট এইরূপ এক যুগ আসবে যখন তীরের ফলক বা দণ্ড যেরূপ সরল ও সোজা করা হয়, লোকেরা কোর'আন তেলাওয়াতকে ঠিক সেইরূপ সরল ও সোজা করবে। তারা দ্রুত তেলাওয়াত করে নিজেদের পারিশ্রমিক আদায় করবে এবং এর জন্য তাদের বিলম্ব সহ্য হবে না। - মুসনাদে আহমদ, তাফসির ইবনে কাসীর।

৬৯. আব্দুল্লাহ ইবনে মা'কাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এক রমজানে লোকদের নিয়ে তারাবি পড়ালেন। এরপর ঈদের দিন উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তাঁর কাছে এক জোড়া কাপড় এবং ৫০০ দিরহাম পাঠালেন। তখন তিনি কাপড় জোড়া এবং দিরহামগুলো এই বলে ফেরত দিলেন, আমরা কোর'আনের বিনিময় গ্রহণ করি না। - মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৫/২৩৭, হাদিস: ৭৮২১

৭০. তাবেয়ী যাযান (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি কোর'আন পড়ে মানুষ থেকে এর বিনিময় গ্রহণ করে, সে যখন হাশরের মাঠে উঠবে তখন তার চেহারায় কোনো গোশত থাকবে না, শুধু হাড্ডি থাকবে। - মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদিস: ৭৮২৪

৭১. হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, বিনিময় লেনদেন হয় এমন খতম তারাবি শরিয়তপরিপন্থী। এরূপ খতমের দ্বারা সাওয়াবের অংশীদার হওয়া যাবে না বরং গোনাহের কারণ হবে। - এমদাদুল ফতোয়া ১/৪৮।

৭২. দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠানটি উপমহাদেশে কোর'আন হেফজ করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। তাদের ফতোয়ার একটি গ্রহণযোগ্যতা

আলেম সমাজে রয়েছে। এই দারুল উলুম কর্তৃক প্রদত্ত ফতোয়াতেও আমরা দেখি খতম তারাবির বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ না-জায়েজ। হজরত মুফতি আজিজুর রহমান (রহ.) বলেন, বিনিময় গ্রহণ করে কোর'আন শরিফ তেলাওয়াত করা জায়েজ নেই। যাদের নিয়তে দেওয়া-নেওয়া আছে, তাও বিনিময়ের হুকুমে হবে। এমতাবস্থায় শুধু তারাবি আদায় করাই ভালো। বিনিময়ের কোর'আন তেলাওয়াত না শোনা উত্তম। কিয়ামুল লাইলের সাওয়াব শুধু তারাবি পড়লেই অর্জন হয়ে যাবে। - ফতোওয়া দারুল উলুম ৪/২৪৬

৭৩. তারাবিতে কোর'আন পড়ার বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ নেই। দানকারী এবং গ্রহণকারী উভয়েই গোনাহগার হবে। যদি বিনিময়বিহীন কোর'আন শোনানোর মতো হাফেজ পাওয়া না যায়, তবে ছোট ছোট সুরা দিয়ে তারাবি পড়ে নেওয়াই উত্তম। - ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া ৭/১৭১

৭৪. দেওবন্দি আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারি হজরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.) স্বয়ং বলেছেন, তারাবিতে যে পবিত্র কোর'আন পড়ে এবং যে শোনে তাদের মধ্যে অর্থের বিনিময় হারাম। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া- ৩৯২) আমাদের দেশের অধিকাংশ কোর'আনে হাফেজগণই এই দারুল উলুম দেওবন্দের ভাবধারায় পরিচালিত কওমী মাদ্রাসার ছাত্র। তারা এই ফতোয়াগুলোর কতটুকু মূল্যায়ন করছেন?

৭৫. আহলে হাদিস মতাদর্শের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব মাওলানা আব্দুল্লাহ অমৃতসরী লিখেছেন, বিনিময়ের মাধ্যমে তারাবিতে পবিত্র কোর'আন তিলাওয়াত করা বা বিনিময় নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ হারাম। বরং এরূপ লোকের পেছনে তারাবিও হয় না। - ফতোয়ায়ে আহলে হাদিস ২/৩০২

৭৬. দারুল ইফতাহ ও দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া রয়েছে - যে হাফেজ সাহেব টাকার লোভে কোর'আন মজিদ শোনান তা শোনার চেয়ে যে সুরা তারাবি আদায় করে তার মুক্তাদি হওয়া ভাল। যদি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোর'আন শোনানো হয় তাহলে ইমামের সওয়াব হবে না, মুক্তাদিরও সওয়াব হবে না। - দারুল ইফতাহ ও দারুল উলুম দেওবন্দ

৭৭. বিনিময় দিয়ে কোর'আন খতম শুনে তারাবি আদায় না করার চেয়ে সুরা তারাবি আদায় করাকেই অনেক আলেম আমলের দিক থেকে উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। শায়েখ মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.) বলেছেন, "ছোট ছোট সুরা দিয়ে তারাবি পড়ে নিন। বিনিময় দিয়ে কোর'আন শুনবেন না। কারণ কোর'আন শোনানোর মাধ্যমে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ নেই। - জাওয়াহেরুল ফিকহ ১/৩৮২

৭৮. বিনিময় নিয়ে তারাবি নামাজে ইমামতকারী ইমামের ব্যাপারে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী (র.) বলেন, আমি বিনিময়

নিয়ে নামাজ পড়ানোকে মাকরূহ মনে করি এবং আমার ভয় হয়, ওই সব লোকের নামাজ আবার পড়তে হবে কি না, যারা এমন ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করেন। এরপর তিনি বলেন, আমার মত হলো, বিনিময় গ্রহণ করা যাবে না। - ফতোয়ায়ে নজিরিয়া ১/৬৪২

৭৯. হজরত খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) বলেন, বিনিময় দিয়ে পবিত্র কোর'আন শোনা জায়েজ নয়। দানকারী এবং গ্রহণকারী উভয় গোনাহগার হবে। - ফতোয়ায়ে খলিলিয়া ১/৪৮

৮০. মুফতি কেফায়াতুল্লাহ (রহ.) বলেন, তারাবিতে পবিত্র কোর'আন শোনানোর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ নেই। - কেফায়াতুল মুফতি ৩/২৬৫

৮১. খেদমতের নামে নগদ টাকা বা কাপড়চোপড় ইত্যাদি দেওয়াও বিনিময়ের মধ্যে শামিল। বরং তা বিনিময় ধার্য করা থেকেও জঘন্য। কারণ তাতে দুটি গোনাহ একত্রিত হয়। একটি কোর'আনের বিনিময় গ্রহণের গোনাহ। দ্বিতীয়টি হলো, যে বিনিময় হচ্ছে তা না জানার গোনাহ। - আহসানুল ফতোওয়া ৩/৫১৪

৮২. বিশিষ্ট বেরলভি মুফতি আমজাদ আলী কাদেরী আজমী এক ফতোয়ায় লেখেন, বর্তমানে অধিক প্রচলন দেখা যায়, হাফেজ সাহেবকে বিনিময় দিয়ে তারাবি পড়া হয়- যা জায়েজ নেই। দানকারী ও গ্রহণকারী উভয়ই গোনাহগার হয়। এটুকু নেব বা এটুকু দেবে- এটিই শুধু বিনিময় নয়। বরং যদি জানা থাকে যে এখানে কিছু পাওয়া যায়, যদিও তা নির্দিষ্ট নয়, তা নাজায়েজ। কারণ জানা থাকাও শর্তকৃতের মতো। - বেরলভি সম্প্রদায়ের ফতোয়াগ্রন্থ বাহারে শরিয়ত ৪/৬৯২

৮৩. লা-মাজহাবিদের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী লেখেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর কাছে বিনিময় নিয়ে তারাবি নামাজে ইমামতকারী ইমামের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, সেরূপ ইমামের পেছনে কে বা কারা নামাজ আদায় করবে? - লা-মাজহাবি সম্প্রদায়ের ফতোয়া

৮৪. বিশেষ ধরনের পোশাক যেমন- টাখনু পর্যন্ত লম্বা জামা, পায়জামা বা লুঙ্গীর উপর পরিহিত আরবীয় জোব্বা জাতীয় জামাকে সুন্নতি লেবাস বলে চালিয়ে দেয়া একটি বড় বেদাত। - "ইবাদতের নামে প্রচলিত বিদ'আতসমূহ" - হাফেজ মাহমুদুল হাসান

৮৫. রসুলাল্লাহ বলেছেন, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, কোনো মানুষের ঈমান সঠিক হতে পারবে না যতক্ষণ না সে সৎ ও বিশ্বাসী হয়। আমি তোমাদেরকে হেদায়েত করছি যে তোমরা কোনো ব্যক্তির অধিক সালাহ আদায় ও অধিক সিয়াম পালন করা দেখে ভুল করো না, বরং লক্ষ্য করো সে

যখন কথা বলে সত্য বলে কি না, এবং তার কাছে রাখা আমানত বিশ্বস্ততার সাথে ফিরিয়ে দেয় কিনা। এবং নিজের পরিবার পরিজনের জন্য হালাল উপায়ে রোজগার করে কিনা। যদি সে আমানতদার ও সত্যবাদী হয় এবং হালাল উপায়ে রেযেক হাসিল করে তাহলে নিশ্চয়ই সে কামেল মো'মেন। - রসুলাল্লাহর ভাষণ, সিরাত বিশ্বকোষ ১২ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

৮৬. আমি তোমাদের পূর্বেই হাওযে কাওসারের নিকটে পৌঁছে যাব। যে ব্যক্তি সেখানে নামবে এবং তার পানি পান করবে সে আর কখনও পিপাসিত হবে না। কতিপয় লোক আমার নিকট আসতে চাইবে, আমি তাদেরকে চিনি আর তারাও আমাকে চেনে। অতঃপর আমার ও তাদের মধ্যে পর্দা পড়ে যাবে। আমি বলব: তারা তো আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। তাকে বলা হবে আপনি জানেন না আপনার পরে তারা কী আমল করেছে। তখন যে ব্যক্তি আমার পরে (দীনকে) পরিবর্তন করেছে তাকে আমি বলবো: দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা"। - হাদিসঃ আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বোখারি ও মুসলিম, হা/৪২৪৩)।

৮৭. আল্লাহর রসুল বলেছেন, "তোমরা কীরূপ লোক থেকে তোমাদের দীন গ্রহণ করছ তা ভালোভাবে লক্ষ্য করো।" - হাদিসঃ মুসলিম, তিরমিযী, মেশকাত, শরহে নববী, মায়ারেফুস সুনান, মেরকাত, লুমাত, আশয়াতুল লুমাত, শরহুত্ ত্বীবী, তা'লীকুছ ছবীহ, মোজাহেরে হক্ব।

৮৮. ওমর (রা.) একদিন কা'ব (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, "আলেম বা ইলমের অধিকারী কে?" তিনি উত্তরে বললেন, "যারা ইলম অনুযায়ী আমল করে।" ওমর (রা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "কোন জিনিস আলেমদের অন্তর থেকে ইলমকে দূর করে দেয়?" তিনি উত্তরে বললেন, "লোভ অর্থাৎ দুনিয়ার সম্পদ, সম্মান ইত্যাদি হাসিলের আকাঙ্ক্ষা।" - হাদিসঃ দায়েমী, মেশকাত, মেরকাত, লুময়াত, আশায়াতুল লুময়াত, শরহুত্ত্বীবী, তা'লীকুছ ছবীহ, মোজাহেরে হক্ব, মিরআতুল মানাজীহ্

৮৯. মুসা (আ.) একবার আল্লাহকে সাতটি প্রশ্ন করেছিলেন। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল- আল্লাহ! আপনার বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানী কে? আল্লাহ বললেন- যে জ্ঞানার্জনে কখনো তৃপ্ত হয় না এবং মানুষের অর্জিত জ্ঞানকেও যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞানের মধ্যে জমা করতে থাকে। - হাদিসে কুদসি– আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বায়হাকী ও ইবনে আসাকির; আল্লামা মুহাম্মদ মাদানী (র.) এর 'হাদিসে কুদসী' গ্রন্থের ৩৪৪ নং হাদিসঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

৯০. আল্লাহর রসুল বলেছেন, "পূর্ববর্তী কেতাবে লিপিবদ্ধ আছে, আল্লাহ বলেছেন, "হে আদমের সন্তান! পারিতোষিক গ্রহণ ব্যতীত শিক্ষা দান করো, যেরূপভাবে

তোমাদের পিতা পারিতোষিক দেওয়া ছাড়া শিক্ষালাভ করেছে।” - হাদিসে কুদসি- ইবনু লাল এই হাদিস ইবনে মাসউদ (রা.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

৯১. ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, “যে ব্যক্তি অধিক হাদিস জানে সে ব্যক্তি আলেম নয়। বরং যার মধ্যে তাকওয়া অধিক সে ব্যক্তিই আলেম।” - বর্ণনা ইবনে কাসীর।

৯২. আল্লাহর রসুল বলেছেন, ‘আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ। নবীগণ দিনার বা দিরহামের উত্তরাধিকারী বানান না। তাঁরা কেবল ইলমের ওয়ারিশ বানান। অতএব যে তা গ্রহণ করে সে পূর্ণ অংশই পায়’। - হাদিসঃ তিরমিযীঃ ২৬৮২

৯৩. রসুলাল্লাহ বলেন, শেষ যামানায় কিছু লোকের উদ্ভব হবে যারা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ধর্মকে প্রতারণার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবে। তারা জনগণের সামনে ভেড়ার পশমের মতো কোমল পোশাক পরবে। তাদের মুখের ভাষা হবে চিনির চেয়ে মিষ্টি; কিন্তু তাদের হৃদয় হবে নেকড়ে বাঘের মতো হিংস্র। আল্লাহ তা’আলা তাদের বলবেন: তোমরা কি আমার বিষয়ে ধোঁকায় পড়ে আছ, নাকি আমার প্রতি ধৃষ্টতা দেখাচ্ছ? আমার শপথ! আমি তাদের উপর তাদের মধ্য হতেই এমন বিপর্যয় আপতিত করব, যা তাদের খুবই সহনশীল ব্যক্তিদের পর্যন্ত হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ছাড়বে। - হাদিসঃ আবু হোরায়রাহ (রা.) থেকে তিরমিজি।

৯৪. রসুলাল্লাহ বলেছেন, তোমরা যখন কারো ভিতর নেতৃত্ব পাবার বাসনা, আকাঙ্ক্ষা দেখ সে যেন কখনও তোমাদের মধ্যে নেতা না হতে পারে। - হাদিসঃ আবু বুরাদা (রা.) থেকে বোখারি।

৯৫. রসুলাল্লাহ তাঁর অন্তিম অসিয়তে বলেছেন, “হে মানবজাতি! আগুনকে প্রজ্বলিত করা হয়েছে এবং অশান্তি অন্ধকার রাত্রির মতো ধেয়ে আসছে। আল্লাহর শপথ, আমি আমার থেকে কোনো কাজ তোমাদের উপর অর্পণ করি নি, আমি শুধু সেটাই বৈধ করেছি যেটা কোর’আন বৈধ করেছে, আর শুধু সেটাই নিষেধ করেছি যেটা কোর’আন নিষেধ করেছে।” - রসুলাল্লাহর প্রথম জীবনীগ্রন্থ সিরাত ইবনে ইসহাক ও সিরাত ইবনে হিশাম।

৯৬. রসুলাল্লাহ (সা.) বলেন: তিন শ্রেণির লোকের সালাত তাদের মাথার উপর থেকে এক বিঘতও উঠানো হয় না (অর্থাৎ কবুল হয় না) - (১) যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের ইমামতি করে অথচ তাকে তারা অপছন্দ করে; (২) সেই মহিলা যে রাত্রি যাপন করে অথচ তার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট; (৩) পলাতক কর্মচারী”। [সহীহ সুনান ইবনু মাজাহ, হাদিস নং-৭৯২]

৯৭. ঈসা (আ.) আলেমদের লক্ষ্য করে বায়তুল মোকাদ্দসে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, “শরিয়ত শিক্ষা দেবার ব্যাপারে আলেমেরা ও ফরিসিরা মুসা (আ.) এর

জায়াগায় আছেন। সুতরাং এরা যা কিছু করতে আদেশ করেন তোমরা তা পালন করো। কিন্তু তাঁরা যা করেন সেটা তোমরা অনুসরণ করো না, কারণ তাঁরা মুখে যা বলেন কাজে তা করেন না।

তারা ভারি ভারি বোঝা বেঁধে মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দেন, কিন্তু সেগুলো সরাবার জন্য নিজেরা একটা আঙ্গুলও নাড়াতে চান না। সব কাজই তারা করে থাকেন কেবল লোক দেখানোর জন্য। দাওয়াত খাওয়ার সময় তারা সম্মানের জায়গায় এবং সিনাগগেও প্রধান প্রধান আসনে তাঁরা বসতে ভালোবাসেন।

তাঁরা হাটে-বাজারে সম্মান খুঁজে বেড়ান আর চান যেন লোকেরা 'আমাদের প্রভু' বা রাব্বাই বলে ডাকে। কিন্তু কেউ তোমাদেরকে প্রভু বলে ডাকুক তা তোমরা চেয়ো না, কারণ তোমাদের প্রভু বলতে কেবল একজনই আছেন। আর তোমরা সবাই ভাই ভাই।

ভণ্ড আলেম ও ফরিসিরা, কী নিকৃষ্ট আপনারা! আপনারা মানুষের সামনে জান্নাতে প্রবেশের দরজা বন্ধ করে রাখেন। তাতে নিজেরাও ঢোকেন না আর যারা ঢুকতে চেষ্টা করছে তাদেরও ঢুকতে দেন না। একদিকে আপনারা লোকদের দেখাবার জন্য লম্বা লম্বা মোনাজাত করেন, অন্য দিকে বিধবাদের সম্পত্তি দখল করেন।

ভণ্ড আলেম ও ফরিসিরা, কী ঘৃণ্য আপনারা! আপনারা পুদিনা, মৌরি আর জিরার দশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহকে ঠিকঠাক দিয়ে থাকেন; কিন্তু আপনারা মুসা (আ.) এর শরীয়তের অনেক বেশি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে বাদ দিয়েছেন। যেমন সুবিচার, দয়া এবং সততা। আপনাদের উচিত আগে এইগুলো পালন করা এবং অন্য বিধানগুলোকেও বাদ না দেওয়া। আপনারা নিজেরা অন্ধ অথচ অন্যদের পথ দেখান। একটা ছোট মাছিও আপনার ছাঁকেন অথচ উট গিলে ফেলেন।

ভণ্ড আলেম ও ফরিসিরা, ঘৃণ্য আপনারা। আপনারা খাওয়ার পাত্রের বাইরের দিকটা পরিষ্কার করে থাকেন, কিন্তু পাত্রের ভিতরে আছে কেবল সেই নোংরা জিনিস যা মানুষের উপর জুলুম আর স্বার্থপরতা দ্বারা আপনারা লাভ করেছেন। অন্ধ ফরিসিরা, আগে পাত্রের ভিতরের ময়লাগুলো পরিষ্কার করুন, তাহলে বাইরের দিকটাও পরিষ্কার হবে।

ভণ্ড আলেম ও ফরিসিরা, কী ভয়াবহ আপনারা! আপনারা সাদা ঝকঝকে রং করা কবরের মতো, যার বাইরে থেকে দেখতে খুবই সুন্দর কিন্তু তার ভেতরে আছে মরা মানুষের হাড়-গোড় ও পঁচা গলা লাশ। ঠিক সেইভাবে, বাইরে আপনারা লোকদের চোখে ধার্মিক কিন্তু ভিতরে মোনফেকী আর পাপে পরিপূর্ণ।

হে সাপের দল আর সাপের বংশধরেরা! কিভাবে আপনারা জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবেন? - বাইবেল, নিউ টেস্টামেন্ট: ম্যাথু ২৩ : ১-৩৪